শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

রচনাবলী-১

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা স্মৃতি সংসদ

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা রচনাবলী-১

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা স্মৃতি সংসদ
www.abdulquadermolla.info

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

রচনাবলী-১

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা স্মৃতি সংসদ
www.abdulquadermolla.info

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

রচনাবলী-১

প্রকাশক ও সর্বস্বত্ব :
শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা স্মৃতি সংসদ

১ম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৬
২য় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৬

শুভেচ্ছা মূল্য : ২০০ টাকা

সূচিপত্র

- ভূমিকা ৫
- শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা-এক আলোকিত জীবনের প্রতিচ্ছবি ৭
- আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার : সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি ৩৪
- আমাদের শিক্ষানীতি প্রণয়নে জাতীয় মূল্যবোধ ও আদর্শিক ভিত্তি ৫৯
- দক্ষ জাতি গঠনে প্রয়োজন কর্মমুখী শিক্ষা ৬৬
- সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের নব্য কৌশল: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ৭৪
- যে মরণের জন্য আমার লোভ হয় ৭৯
- বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি: রাসূলে পাকের (সা.) কর্মকৌশল অনুসরণ ৮৩
- হৃদয়ে অব্যাহত রক্তক্ষরণে মনে জাগে নতুন নতুন প্রশ্ন ৮৯
- 'দলে গণতন্ত্র চর্চা : জামায়াতের কি হবে'- অন্যদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই ৯৫
- ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ (একটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ) ১০২
- ঝুলিও কুড়ি ১২২
- "ইয়ে ভি বাংলাদেশ তরীকা হায়" ১২৫
- আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্মেলন একটি পর্যালোচনা ১২৯
- ব্যাপারটাকে মানবীয় দৃষ্টিতে বিচার করুন ১৩৩
- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন ঢাকায় চাই ১৩৮
- সময় থাকতেই চিকিৎসা করুন ১৪২
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আমাদের রাজনীতি-১ ১৪৬
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আমাদের রাজনীতি-২ ১৪৯
- একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে ১৫৩
- শিক্ষিতের অযৌক্তিক সংলাপ ১৫৭
- সাহস করে সত্য কথা বলতে হবে ১৬২
- অথ: সাংবাদিক সদাচার সমাচার ১৬৭
- মি'রাজ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য ১৭১
- আধুনিক ছিলাম না কিন্তু মানুষ ছিলাম ১৭৬
- এটা বিড়াল হলে গোশত কই, আর এটা গোশত হলে বিড়াল কই? ১৮০
- দুর্নীতির প্রকৃত উৎস ১৮৩
- শোক করিয়া লাভ নাই শহীদি খুনের নজরানা চাই ১৮৮
- কাকের বাসায় কোকিলের ছানা ১৯৩
- কুশিক্ষার চেয়ে অশিক্ষা ভাল ১৯৬
- টিপ কি আমাদের? ১৯৯
- কাজীর গরু কেতাবে গোয়ালে নেই ২০৩
- কালচার নিয়ে আমাদের কান্ডকারখানা ২০৬
- আকাশের দিকে থুথু ফেললে নিজের মুখেই এসে পড়ে ২০৯
- অপরকে ছোট করলে নিজেই ছোট হই ২১৩

ভূমিকা

এই মহাবিশ্বের পৃথিবীর প্রতিপালক মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে শুকরিয়া যিনি শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার নির্বাচিত কিছু প্রবন্ধ নিয়ে এই রচনাবলী বের করার তাওফিক দিয়েছেন। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ইসলামী আন্দোলনের একজন শীর্ষ নেতাই শুধু ছিলেন না, তিনি একাধারে একজন শিক্ষাবিদ, গবেষক, লেখক, সাংবাদিক, সমাজসেবক, ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এতো সব গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি একজন প্রচারবিমুখ মানুষ ছিলেন। অন্যান্য অনেক পরিচয় থাকলেও তিনি প্রধানত: নিজেকে একজন শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশী পছন্দ করতেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহ নিয়ে শাহাদাতের পরে এটাই প্রকাশিত প্রথম বই। তাই বইটিতে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার একটি সচিত্র ও প্রামাণ্য তথ্যসংবলিত জীবনচিত্র দেয়া হয়েছে।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা জীবদ্দশায় অসংখ্য সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, গোলটেবিল, আলোচনা সভা, শিক্ষাশিবিরসহ বহু অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ, তথ্যভিত্তিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা শুনে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে প্রচলিত নেতিবাচক যে ধারণা আছে, অনেক শ্রোতারই সেই ধারণা পাল্টে গিয়েছে। তাঁর আলোচনা ছিল প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরে কিছু সাহসী উচ্চারণ, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-উপাত্তের সহজ উপস্থাপনা। সমাজে প্রচলিত নানা প্রবাদ-প্রবচন ও গল্পের মাধ্যমে শ্রোতার মাঝে হাস্য-রসের সৃষ্টি তাঁর উপস্থাপনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি যে কোন আলোচনাকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারতেন। এটা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান গুণ।

তার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল একজন শিক্ষক হিসেবে। শিক্ষার উপরে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা থাকার ফলে শিক্ষার প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিলো। একজন রাজনীতিবিদ হয়েও তিনি একজন সফল শিক্ষাবিদ হতে পেরেছিলেন। এই বইয়ে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলো প্রথমে দেয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলো অধ্যয়ন করলে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার নানা ত্রুটি সমূহ পাঠক সহজেই চিহ্নিত করতে পারবেন। কেন আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা পশুত্বের মূলোৎপাটন করে মনুষত্ব বিকাশে ব্যর্থ, সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে শিক্ষার সার্টিফিকেট গ্রহণের পরও কিভাবে শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতির চরম ক্ষতি সাধন করে চলেছে সে সম্পর্কে পাঠকেরা ধারণা পাবেন। এই ঘুণে ধরা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার কিভাবে সম্ভব সে ব্যাপারে কিছু প্রস্তাবনাও শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা রেখেছেন তার বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে।

একজন সাংবাদিক হিসেবে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় পার করেছেন। প্রেসক্লাবের সদস্য ও অবিভক্ত ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের পর পর দুইবার নির্বাচিত সহ-সভাপতি হিসেবে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন যা তার রাজনৈতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। দৈনিক সংগ্রামে চাকরি করাকালীন সময়ে তিনি সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা, দেশী ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ, সাংবাদিকতা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইসলামের নানা মৌলিক বিষয় সম্পর্কে যে কলামগুলো লিখেছেন তা আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এতগুলো বিষয়ের উপরে এত গভীর চিন্তা-চেতনার জ্ঞানগর্ভ কলাম লেখা সত্যিই দুরূহ কাজ। অথচ শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা অত্যন্ত সাবলীল ভাবে তাঁর স্বভাবজাত হাস্য-রসাত্মক নানা গল্প ও ঘটনার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অনিয়ম, অবিচার, অনাচার, দুর্নীতি সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন যা যেকোন পাঠককেই মুগ্ধ করবে। বর্তমানে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা চরম বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত। সামাজিক মূল্যবোধের যে চরম অবক্ষয়, নীতি-নৈতিকতার যে চরম অধোগতি, সে ব্যাপারে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার সেই আশির দশকের কলামগুলোতে আভাস পাওয়া যায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় তিনি কত দূরদর্শী ও সূক্ষদর্শী ব্যক্তি ছিলেন।

এছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে তাঁর লেখা কলামগুলোতে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশের উপর সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসী ও চানক্য নীতি কিভাবে বাস্তবায়ন করেছে সে বিষয়ে পাঠকেরা বিশদভাবে জানার ও বুঝার সুযোগ পাবেন।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার কলাম ও প্রবন্ধগুলোতে আধুনিক ও পুরনো বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে যদি ক্ষয়িষ্ণু এই সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার ব্যাপারে আমরা উদ্যোগী হতে পারি, কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিজ নিজ জায়গা থেকে ভূমিকা রাখতে পারি তবেই এই বই প্রকাশ সার্থক হবে যে কালজয়ী আদর্শের জন্য শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা জীবন উৎসর্গ করেছেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সেই আদর্শের পতাকা এ দেশের আকাশে একদিন পতপত করে উড়বেই ইনশাআল্লাহ। প্রতিকূল পরিবেশে এ বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। এই বই সম্পর্কিত যেকোন গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

মহান আল্লাহ শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে নিয়ে প্রকাশিত এ পুস্তকে থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমাদের চেতনাকে আরো শানিত করার তাওফিক দিন এবং তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করুন।

এ পুস্তিকা আমাদের পরকালীন মুক্তির জন্য সহায়ক হোক। আমীন।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা স্মৃতি সংসদ
aqmolla1948@gmail.com
www.abdulquadermolla.info

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা এক আলোকিত জীবনের প্রতিচ্ছবি

মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে ঢের সময় লেগে যায়। প্রকৃত আদর্শবান মানুষের পরিচয় এই ঘূর্ণায়মান মানব সভ্যতার ইতিহাসে বেশ বিরল। এই প্রকৃত আদর্শবান মানুষেরা তাদের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেন, হয়ে যান মানবসভ্যতার ইতিহাসের অমোচনীয় অংশ। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা প্রকৃতপক্ষে মানবসত্তাবান অসংখ্য মানবিক গুণাবলির সমন্বয়ে গঠিত এই রকম একজন রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা, একটি নাম, একটি বিস্ময়কর প্রতিভা, একটি ইতিহাস, একজন কিংবদন্তি।

এই মহান মানুষটি ১৯৪৮ সালের ২ ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার চরবিষ্ণুপুর ইউনিয়নের জরিপের ডাঙ্গী গ্রামে নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। দাদা আবু মোল্লা, বাবা সানাউল্লাহ মোল্লা, মা বাহেরুন্নেসা বেগম, নয় ভাইবোনের মধ্যে চতুর্থ। তার জন্মের কিছুকাল পরে তার পিতা-মাতা সদরপুরেরই আমিরাবাদ গ্রামে এসে বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

কে জানতো সময়ের ব্যবধানে এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবেন আব্দুল কাদের মোল্লা! কে জানতো এই আব্দুল কাদের মোল্লা হবেন বিপন্ন মানবতার মুক্তির কান্ডারি, তিনি হবেন অন্ধকার পৃথিবীতে এক উজ্জ্বল নীল নক্ষত্র, কে জানতো নিজ মাতৃভূমির শাসক কর্তৃক নির্মম রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের শিকার হয়ে তিনি হবেন ইতিহাসের এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি! কে জানতো তাঁর আদর্শ থেকে উদগিরিত লাভা ধ্বংস করে দেবে মিথ্যাবাদীদের ক্ষমতার রাজপ্রাসাদ!

শৈশব এবং যৌবন

শিশুকাল থেকে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা অসাধারণ মেধাবী ছাত্র হিসেবে গ্রামে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি ১৯৫৯ সালে প্রাথমিক বৃত্তি এবং ১৯৬১ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাবৃত্তি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে আমিরাবাদ ফজলুল হক ইনস্টিটিউট থেকে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৬ সালে ফরিদপুর সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৬৮ সালে একই বিদ্যাপীঠ থেকে বিএসসি পাস করেন। এসময় যৌবনের প্রথম ধাপে তাঁর চরিত্র-মাধুর্য সহপাঠীদের আকৃষ্ট করে। সমবয়সী হওয়ার পরও অনেকে আব্দুল কাদের মোল্লাকে আপনি বলে সম্বোধন করতো। তার নির্মোহ জীবন সম্পর্কে আঁচ করা গিয়েছিলো অতি শৈশবকালীন আচরণ থেকে।

আমিরাবাদ ফজলুল হক ইনিস্টিটিউট

প্রবল আর্থিক সঙ্কট এবং কর্মজীবনের সূত্রপাত

জীবনের উষালগ্ন থেকেই শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা আর্থিক সঙ্কট মোকাবেলা করে জীবনসংগ্রামে এগিয়ে যান। বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ের পড়ালেখা শেষ করে

বাইশরশি শিব সুন্দরী একাডেমি

প্রবল আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়েন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা। চরম অর্থ সঙ্কট তাঁকে থামিয়ে দিতে উদ্যত হলেও তিনি বাধা ভেঙে এগিয়ে চলার দৃঢ়প্রত্যয়ে সদরপুরেরেই বাইশরশি শিব সুন্দরী (এস এস) একাডেমি নামক একটি স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। একজন আদর্শ, জ্ঞানী, চরিত্রবান শিক্ষক হিসাবে তার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

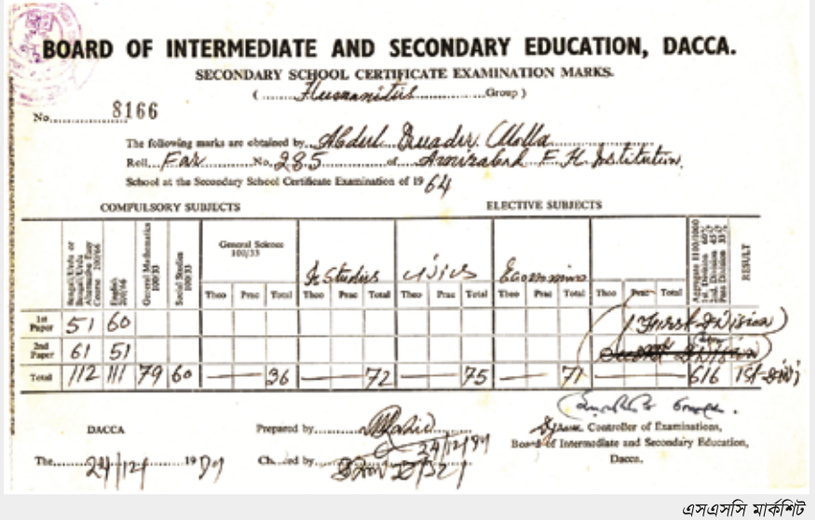

উচ্চশিক্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফরিদপুর, ১৯৭১ এবং

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DACCA.

SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MARKS.

(Humanities Group)

No. 8166

The following marks are obtained by Abdul Quader Molla

Roll Far No. 285 of Amirabad F.H. Institution

School at the Secondary School Certificate Examination of 1964

	Bengali	English	General Mathematics	Social Studies	General Science	Is. Studies	Civics	Economics		Aggregate	Result
1st Paper	51	60									First Division
2nd Paper	61	51									
Total	112	111	79	60	—	36	72	75	71	616	1st div

DACCA

The 24/12/1970

Prepared by Mohid

Asstt. Controller of Examinations, Board of Intermediate and Secondary Education, Dacca.

এসএসসি মার্কশিট

অসাধারণ মেধার অধিকারী আব্দুল কাদের মোল্লা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ফরিদপুরের গন্ডি থেকে বেরিয়ে ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে এমএসসিতে ভর্তি হন। তখন গণ-অভ্যুত্থানের সংগ্রামী চেতনা মানুষের প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হচ্ছে। প্রথমে ঢাকা হল ও পরে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা তাঁর আকর্ষণীয় চরিত্র দিয়ে আকৃষ্ট করলেন শিক্ষক-

221

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DACCA
BANGLADESH

DUPLICATE

I certify that Abdul Quader Molla Son/daughter of Md. Sonaulla Molla of Amirabad F.H. Institution School/College, bearing Roll Far No. 285 whose date of birth/age as recorded in his/her application was Second December Nineteen hundred and Forty eight duly passed the Matriculation/High School/High Madrasah/School Final (Senior Side)/Secondary School Certificate/Higher Secondary Certificate Examination held in the month of March 1964.

He/She was placed in the First Division.

Controller of Examinations.

221

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DACCA
BANGLADESH

TRIPLICATE

I certify that Abdul Quader Molla Son/daughter of Md. Sonaullah Molla of Rajendra College, bearing Roll Far No. 19259 duly passed the Higher Secondary Certificate Examination held in the month of May 1966.

He/She was placed in the Second Division.

DACCA

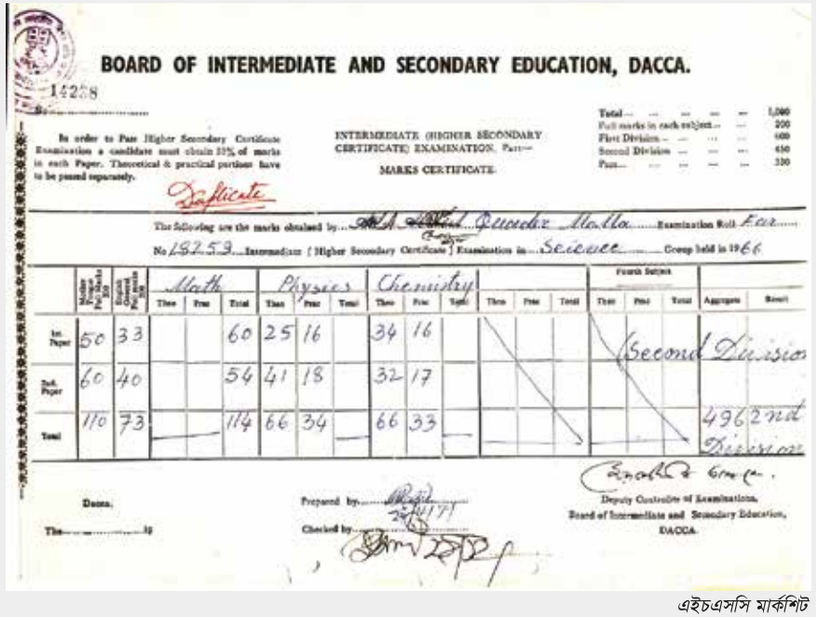

Controller of Examinations

এসএসসি সার্টিফিকেট

এইচএসসি সার্টিফিকেট

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DACCA.

14258

In order to Pass Higher Secondary Certificate Examination a candidate must obtain 33% of marks in each Paper. Theoretical & practical portions have to be passed separately.

INTERMEDIATE (HIGHER SECONDARY CERTIFICATE) EXAMINATION, Part—
MARKS CERTIFICATE

Duplicate

The following are the marks obtained by Abdul Quader Molla Examination Roll Far No. 19259 Intermediate (Higher Secondary Certificate) Examination in Science Group held in 1966

			Math			Physics			Chemistry				Result
1st Paper	50	33			60	25	16		34	16			Second Division
2nd Paper	60	40			54	41	18		32	17			
Total	110	73			114	66	34		66	33		496	2nd Division

Deputy Controller of Examinations, Board of Intermediate and Secondary Education, DACCA.

এইচএসসি মার্কশিট

ছাত্র-কর্মচারীদের, হয়ে উঠলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয়মুখ। ১৯৭১ সাল। উত্তাল হয়ে উঠলো সমগ্র বাংলা, আব্দুল কাদের মোল্লা বসে থাকলেন না। ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের পর থেকে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলে তিনি বন্ধুদের সাথে প্রায় বসতেন, এমন পরিস্থিতিতে বাঙালিরা কিভাবে তাদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত

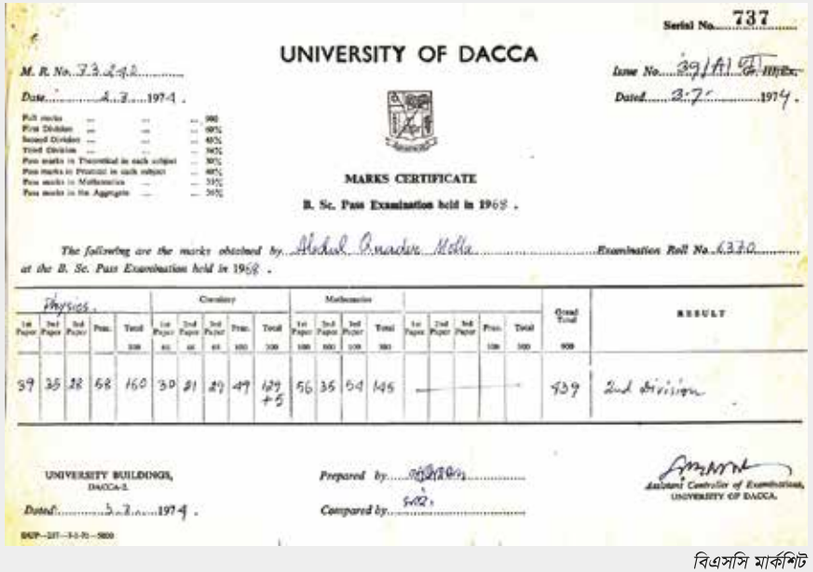

Serial No. 737

UNIVERSITY OF DACCA

M. R. No. 73242

Date 2.7.1974.

Issue No. 39/A1

Dated 3.7.1974.

MARKS CERTIFICATE

B. Sc. Pass Examination held in 1968.

The following are the marks obtained by Abdul Quader Molla Examination Roll No. 6370 at the B. Sc. Pass Examination held in 1968.

Physics					Chemistry					Mathematics									Grand Total	Result
1st Paper	2nd Paper	3rd Paper	Prac.	Total	1st Paper	2nd Paper	3rd Paper	Prac.	Total	1st Paper	2nd Paper	3rd Paper	Total	1st Paper	2nd Paper	3rd Paper	Prac.	Total		
59	35	28	68	160	30	21	29	49	129 +5	56	35	54	145	—					439	2nd Division

UNIVERSITY BUILDINGS, DACCA-2.

Dated 2.7.1974.

Prepared by

Compared by

Assistant Controller of Examinations, UNIVERSITY OF DACCA.

বিএসসি মার্কশিট

788

University of Dacca

PROVISIONAL CERTIFICATE FOR

Bachelor of Science

This is to Certify that

Abdul Quader Molla

of Rajendra College, Faridpur passed the Examination for the Degree of Bachelor of Science of this University held in the month of May-June 1968, and that he was placed in the Second Division.

University Buildings, Ramna, Dacca

The 10th Sept. 1968

Deputy Controller of Examinations, University of Dacca

বিএসসি সার্টিফিকেট

8—112

University of Dacca

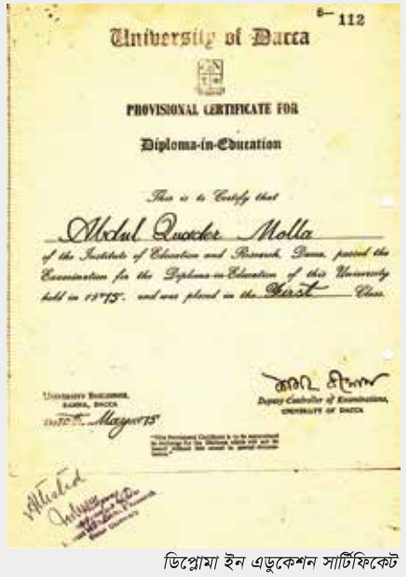

PROVISIONAL CERTIFICATE FOR

Diploma-in-Education

This is to Certify that

Abdul Quader Molla

of the Institute of Education and Research, Dacca, passed the Examination for the Diploma-in-Education of this University held in 1975. and was placed in the First Class.

University Buildings, Ramna, Dacca

Dated 10th May 1975

Deputy Controller of Examinations, University of Dacca

ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন সার্টিফিকেট

করবে তার উপায় খোঁজার চেষ্টা করতেন তারা। তিনি বুঝতে পারলেন বাঙালির এই পথ কণ্টকাকীর্ণ, মুক্তির জন্য ঝরাতে হবে রক্ত, দিতে হবে তাজা তাজা প্রাণ। ২৫ মার্চ কালো রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে গণহত্যার কয়েকদিন

INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH

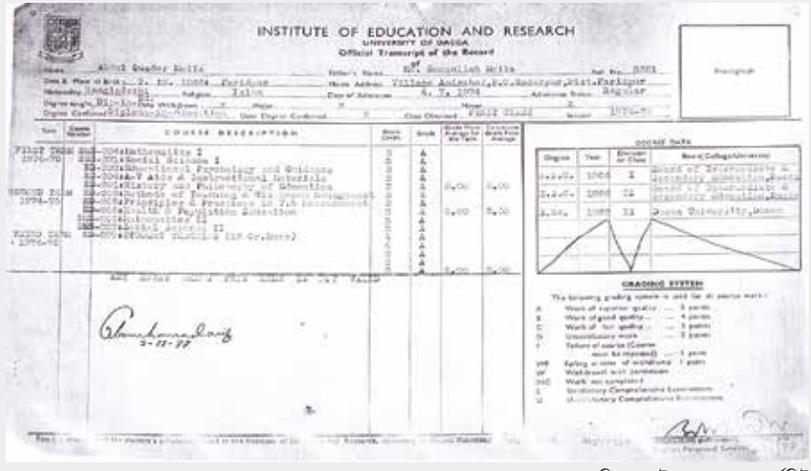

UNIVERSITY OF DACCA

Official Transcript of the Record

GRADING SYSTEM

ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন মার্কশিট

INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH

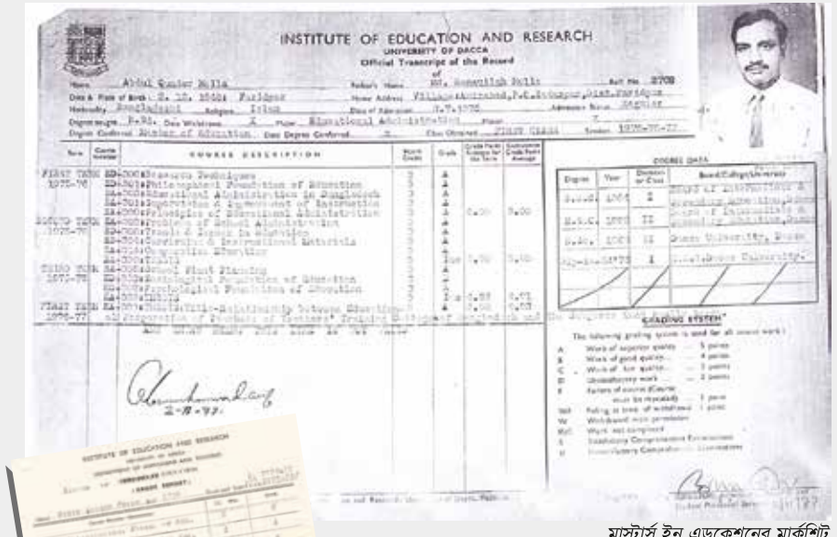

UNIVERSITY OF DACCA

Official Transcript of the Record

GRADING SYSTEM

মাস্টার্স ইন এডুকেশনের মার্কশিট

INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH

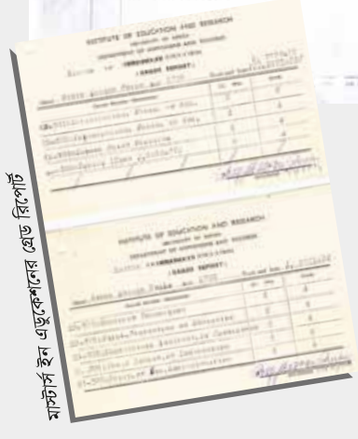

মাস্টার্স ইন এডুকেশনের গ্রেড রিপোর্ট

আগেই শিক্ষক ড: ইন্নাস আলীর নির্দেশে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন। শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের কারণে তিনি মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে পারলেন না।

৭ মার্চের পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবার বাড়ি ফিরে যাবেন, সংগঠিত করবেন

এলাকার যুবক বন্ধুদের, দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য তিনি যুদ্ধ করবেন। ফরিদপুরের বাড়িতে তিনি ফিরে এলেন। প্রতি রাতে তিনি বের হতেন সহপাঠীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য। ইতোমধ্যে এলাকার যুবকেরা সংগঠিত হয়ে গেছে। শহীদ আব্দুল কাদের যোগ দিলেন মুক্তিবাহিনীতে। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জেসিও মফিজুর রহমান এসকল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রদের ট্রেনিং শুরু করলেন। পহেলা মে পাক-হানাদার বাহিনী ফরিদপুরে প্রবেশ করলো। পহেলা মে হানাদার বাহিনী ফরিদপুরে ঢুকলে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ও তার সঙ্গীগণ আর প্রকাশ্যে যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে পারলেন না। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা বাঙালির চূড়ান্ত বিজয় না আসা পর্যন্ত ফরিদপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে গোপনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

১৯৭২ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত, রক্তাক্ত দেশে আরো অনেকের মতো শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার শিক্ষাজীবনের ছেদ ঘটে। ১৯৭৪ সালে তিনি পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই ই আর (ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল রিসার্চ) বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭৫ সালে তিনি শিক্ষা প্রশাসনের ডিপ্লোমায় অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ১৯৭৭ সালে তিনি শিক্ষা প্রশাসনে মাস্টার্সেও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন ।

পুনরায় কর্মজীবন

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার উদয়ন স্কুলের চাকরি শেষে বিদায় উপলক্ষে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের পক্ষ থেকে দেয়া বই

১৯৭৫ সালে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। পরে ১৯৭৮ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এ রিসার্চ স্কলার হিসেবে যোগ দেন।

সাংবাদিক শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

এটা আশির দশকের কথা। দেশ তখন সামরিক জান্তা স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট

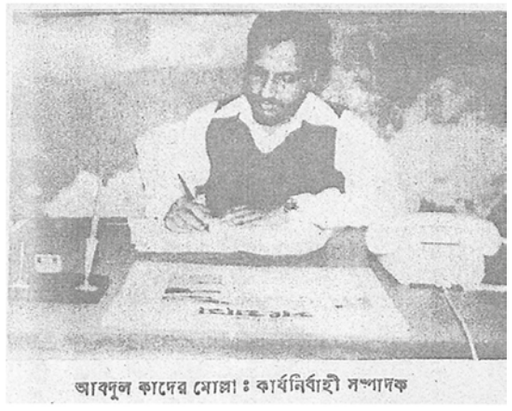

আব্দুল কাদের মোল্লা : কার্যনির্বাহী সম্পাদক

এরশাদের কবলে। সামরিক জান্তা সরকার জনগণের কণ্ঠ রোধ করে ফেলেছে প্রায়। জাতির আকাশে তখন দেশী শকুন ডানা ঝাপটিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। দিশাহীন বাঙালি জাতি আবার যেন ঘোর সঙ্কটে নিমজ্জিত হলো। সামনে এগিয়ে এলেন শহীদ আব্দুল কাদেরের মতো সাহসী লোকরা। শিক্ষকতা পেশায় যে সত্যের পরশ তিনি পেয়েছিলেন, তা সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি সাংবাদিকতা পেশার প্রতি আকৃষ্ট হন। সত্যপ্রকাশে একজন নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে আব্দুল কাদের মোল্লার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসের পাতায় পাতায় ।

১৯৮১ সালে সাব-এডিটর পদে 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকায় যোগ দেন শহীদ আব্দুল

দৈনিক
সংগ্রাম
DAINIK SANGRAM
সংখ্যা : বৃহস্পতিবার : ২৭শে আষাঢ়, ১৩৯১ : ১২ই শাওয়াল : হিজরী, ১৪০৪ : Thursday, 12 July, 1984 : ৮ পৃষ্ঠা : মূল্য : ১৫

১৯৮৪ সালের ১১ জুলাই সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে রাজপথে মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

কাদের মোল্লা। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর দক্ষতা এবং দূরদর্শিতার কারণে পত্রিকাটির প্রথমে সহকারী সম্পাদক ও পরে কার্যনির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পান। সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে সকল পত্রিকা গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছিলো 'দৈনিক সংগ্রাম' তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা 'বীক্ষণ' ও 'সহজ বচন' ছদ্মনামে কলাম লিখতেন। তার লেখা আর্টিকেলগুলো সচেতন পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর ক্ষুরধার ও বস্তুনিষ্ঠ, রসালো লেখা প্রকাশ হতে থাকে দেশের জাতীয় দৈনিকসমূহে। দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম, সোনার বাংলা, পালাবদল, মাসিক পৃথিবী, কলম ইত্যাদি নানা দৈনিক, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনে তিনি লিখেছেন।

আব্দুল কাদের মোল্লা 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকাটি আরো আকর্ষণীয় ও পাঠকপ্রিয় করে তুলেন। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্যপদ লাভের পাশাপাশি ১৯৮২ ও ১৯৮৪ সালে পরপর দু'বার তিনি ঐক্যবদ্ধ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। শিক্ষক আব্দুল কাদের মোল্লা একজন আপসহীন সাংবাদিক নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অন্তরে দ্রোহ আর বিপ্লবের চেতনা লালন করেও সদা হাস্যোজ্জ্বল এ মানুষটি ছিলেন সাংবাদিক আড্ডার প্রাণভ্রমরা। তার রসময় গল্পকথার সজীবতায় ভরে উঠতো গণমানুষের চেতনার প্রতীক জাতীয় প্রেস ক্লাব। সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কারনে এক সময় সাংবাদিকতার পেশাকে বিদায় জানাতে হয় তাকে। কিন্তু যে পেশা তার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে এর মহত্বকে তিনি ধারণ করতেন সবসময়। তাইতো তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে ছিলেন সাংবাদিক সমাজের অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে। দৈনিক সংগ্রাম অফিসের প্রতিটি ধূলিকণা এখনো বহন করে বেড়াচ্ছে কাদের মোল্লার স্মৃতি। কিন্তু একজন আদর্শবাদী সাংবাদিকের জীবন সাধারণভাবেই কুসুমাস্তীর্ণ হয় না। কখনো সমাজের বিপথগামী অংশ, কখনো কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহল, আবার কখনও বা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির রোষানলে পড়তে হয় তাকে। সত্য-মিথ্যার চিরন্তন সংঘর্ষে উৎসর্গিত হয় সাংবাদিকের জীবন। চারপাশের চেনাজন, পরিচিত বন্ধুমহল একসময়ে পরিণত হয় তার শত্রুতে। হানে প্রাণঘাতী ছোবল। যে ছোবলের রূপ হয় নানারকম। মানসিক যন্ত্রণায় বিপন্নতা, শারীরিক আঘাতে পঙ্গুত্ববরণ, প্রাণঘাতি হামলায় মৃত্যু, কারাবন্দিত্বের নি:সঙ্গ যাতনা কিংবা প্রহসনের

বিচারে জীবনাবসান। এসবই ছিল যুগে যুগে সাংবাদিক জীবনের অনিবার্য উপাদান। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার জীবনেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

রাজনৈতিক জীবন

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা একজন দেশ ও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। এই দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণই সব সময় তার ধ্যানজ্ঞান ছিল। একজন সচেতন ব্যক্তি হিসেবে তাই কৈশোরে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা তৎকালীন সমাজের অন্যান্য মানুষের মত সমাজতন্ত্রের চটকদার রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৯৯২ সালের ২৯ ডিসেম্বর টঙ্গীর জামেয়া ইসলামিয়াতে জামায়াতের তিন দিনব্যাপী ত্রিবার্ষিক রুকন সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

১৯৬৬ সালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন। ১৯৬৮ সালে তিনি মাওলানা মওদূদী (রহ:) এর তাফসির 'তাফহীমুল কোরআন' পড়ে কোরআনের হৃদয়স্পর্শী বাণীতে মুগ্ধ হন এবং ছাত্র ইউনিয়ন ছেড়ে ছাত্রসংঘে যোগদান করেন। তিনি পরবর্তীতে ছাত্রসংঘের শহীদুল্লাহ হল শাখার সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি, ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারি এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৯ সালে মে মাসে তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রুকন হন এবং একই সাথে ইসলামবিরোধী মহলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠেন। তিনি ভাষাসৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযমের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি এবং ঢাকা মহানগরীর শূরা সদস্য এবং কর্মপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে অল্পদিনের ব্যবধানেই জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশ-এ-শূরার সদস্য হন।

২০১০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জামায়াতে ইসলামী খুলনা অঞ্চলের উদ্যোগে খুলনার বাবরী চত্বরে ইসলামী রাজনীতি বন্ধের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ও মংলা বন্দর-সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে আয়োজিত বিশাল জনসভায় জামায়াতের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

১৯৮৩ সালে জামায়াতের ঢাকা মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক নিয়োজিত হন। ১৯৮৬ সালে ঢাকা মহানগরীর নায়েবে আমীর, ১৯৮৭ সালে ভারপ্রাপ্ত আমীর, ১৯৮৮ সালের শেষের দিকে ঢাকা মহানগরীর আমীর এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৯০ সালে ১৩ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররামের উত্তর গেটে দুর্নীতি সন্ত্রাস ও নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আয়োজিত সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে জামায়াতের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

তিনি জামায়াতের ঢাকা মহানগরীর আমীর হিসাবে নতুন যুগের সূচনা করেন। তিনি খোলামেলা স্বভাবের হওয়ার ফলে যেকোনো সাধারণ কর্মী উনার কাছে পৌঁছে যেতে পারতো ও সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ পেত। তিনি নানা যুক্তি দিয়ে যেকোনো মানুষকে বুঝাতে পারতেন, দাওয়াত দিলে তিনি সব জায়গায় যেতেন। নিরাপত্তার কোন কারণ তাকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। শৃঙ্খলার নামে অতিরিক্ত কড়াকড়ি তার পছন্দ ছিল না।

লিয়াজোঁ কমিটি ও শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

সাংবাদিক নেতা হওয়ার কারনে সব ধরনের রাজনৈতিক মহলে উনার অবাধ যাতায়াত ছিল। মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশে যাওয়ার কারণে জামায়াত তাকে বিভিন্ন দলের সাথে লিয়াজোঁ করার দায়িত্ব দেয়। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে প্রথম উনার বিভিন্ন দলের সাথে লিয়াজোঁ করার দক্ষতা প্রকাশ পায়। যদিও তখন এটা ছিল অনানুষ্ঠানিক ও গোপন। ৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি ঢাকা মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে কেন্দ্রীয় লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি।

২০০১ সালের ৩ এপ্রিল মিন্টু রোডে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারি বাসভবনে কেন্দ্রীয় লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াত আনুষ্ঠানিকভাবে লিয়াজোঁ কমিটি করে বিভিন্ন দলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। ওই সময়ে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সাথে দিনের পর দিন তিনি মিটিং করে আন্দোলনের কর্মসূচি ঠিক করতেন ও সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতেন। তখন কমিটিতে গৃহীত আন্দোলনের কর্মসূচি সম্পর্কে ব্রিফিং করতেন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম এবং তা বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করতেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা। ১৯৯৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদের সাথে একই দিনে তিনি গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হওয়ার আগে তিনি ও তোফায়েল একসাথে আত্মগোপনে ছিলেন। জেলে তিনি ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতারা বাসার খাবার ভাগাভাগি করে খেতেন।

আওয়ামী লীগ শাসন আমলে ১৯৯৯ সাল থেকে জামায়াত-বিএনপি লিয়াজোঁ শুরু হয়। চারদলীয় লিয়াজোঁ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। লিয়াজোঁ কমিটিতে বিভিন্ন সময়ে নানা দায়িত্ব পালন করার কারণে বিএনপি দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা

জিয়া এবং আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাসহ উভয় দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের সাথে আন্দোলনের নীতিনির্ধারণী সভাতে মিলিত হতেন তিনি। বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ দলের সাথে লিয়াজোঁ করার কারণে ও রসাত্মক ব্যক্তি হওয়ার কারণে অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে উনার সখ্য হয়। রাজনৈতিক নেতাগণ তাদের একান্ত পারিবারিক অনুষ্ঠানেও উনাকে দাওয়াত করতেন।

জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় নেতা

তিনি ১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রচার সম্পাদক হওয়ার পরে তিনি জামায়াতের প্রচার বিভাগের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। তার সময়েই প্রচার বিভাগের জন্য আলাদা জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়, লোকবল বাড়ানো হয়, প্রচার বিভাগকে আধুনিকীকরণ করার জন্য কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, প্রিন্টার সহ অন্যান্য জিনিস কেনা হয়। জামায়াতের নিজস্ব ইংরেজি বুলেটিন আরবীতে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ বাড়ানো ও নিয়মিত করা হয়। ২০০০ সালে তিনি জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে মনোনীত হন। তিনি ২০০৪ সালের মার্চ মাসে স্বল্প সময়ের জন্য ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন।

কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক হিসেবে মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচ তলায় দায়িত্ব পালনরত শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

২০১০ সালের ১১ জুলাই জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জামায়াতের আমীর, সেক্রেটারি জেনারেল ও মাওলানা সাঈদীকে রিমান্ডের নামে নির্যাতনের প্রতিবাদে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা। উল্লেখ্য গ্রেফতার হওয়ার আগে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার এটাই শেষ সাংবাদিক সম্মেলন

১৯৯৩ সালের ২৭ মে বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় মুসলমানদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবিতে ঢাকাস্থ জাতিসংঘের দফতরে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান উপলক্ষে বিক্ষোভ মিছিলে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

বাংলাদেশের বাইরে সারা বিশ্বে মুসলমানদের উপরে অত্যাচার ও নির্যাতনের ব্যাপারে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা সব সময়ই সোচ্চার ছিলেন। কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, চেচনিয়া, লেবানন, ইরাক ইত্যাদি নানা জায়গায় যখনই মুসলিমরা নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তখনই শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা এর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, মিছিল করেছেন, বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছেন, স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য তিনি আর্থিক সাহায্যও জোগাড় করে পাঠিয়েছেন। জামায়াতের পক্ষ থেকে তিনি নানা দেশের হাইকমিশন-এমব্যাসিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন ও জামায়াতের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন।

কারাবরণ

১৯৮৫ সালের ২২ এপ্রিল স্বৈরশাসক এরশাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে জামায়াতের অন্যান্য নেতাসহ গ্রেফতার হন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

- ১৯৬৪ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ অভিযোগে এবং বামপন্থীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন।
- ১৯৭১ সালে স্থানীয় কিছু লোকের ভুল বোঝাবুঝির কারণে তাকে থানায় আটকে রাখা হয়। স্থানীয় জনতা ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার লুতফুল করীম তাকে সাথে সাথেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন ।
- স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট এরশাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় ১৯৮৫ সালের ২২ এপ্রিল ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে জামায়াতের অন্যান্য নেতাসহ গ্রেফতার হন। প্রায় চারমাস আটক থাকার পরে উচ্চ আদালত তার এ আটকাদেশকে অবৈধ ঘোষণা করলে তিনি ১৪ আগস্ট মুক্তি পান।
- ১৯৯৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদের সাথে একই দিনে তিনি গ্রেফতার হন। সাত দিন পরে তিনি মুক্ত হন।

কূটনৈতিক অঙ্গনে কাদের মোল্লা

২০০৮ সালের ২৭ নভেম্বর জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধি দলের জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে সাক্ষাৎকালে জামায়াতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার কূটনীতিকদের সাথে ছিল গভীর সম্পর্ক। সদা হাস্যোজ্জ্বল ও রসিক কাদের মোল্লার কথা ছাড়া কোন প্রোগ্রাম জমজমাট হতো না। জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি নানা কূটনীতিক প্রোগ্রামে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১০ সালে গ্রেফতার হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি জামায়াতের সব ধরনের কূটনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। তার দূরদর্শী, জ্ঞান ও তথ্যসমৃদ্ধ কথা কূটনীতিকদের বিমোহিত করত। অনর্গল ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারার দক্ষতা থাকায় কাদের মোল্লার সাথে কূটনীতিকদের সাথে অতি দ্রুত ভাব হয়ে যেত। সমসাময়িক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপরে তার ভাল দখল থাকায় কূটনীতিকদের সাথে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলতে পারতেন। কূটনীতিকদের সাথে মিশে যাওয়ার একটা প্রবণতা তার মাঝে লক্ষ্য করা যেত। ফলে কূটনীতিকরা তাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানেও উনাকে দাওয়াত করতেন।

২০০০ সালের ১ ডিসেম্বর জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম কর্তৃক মুসলিম দেশের কূটনীতিকদের সম্মানে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে জামায়াতের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে হাস্যোজ্জ্বল শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

বিদেশ ভ্রমণ

২০০০ সালে কানাডা সফরে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সামনে

জনাব মোল্লা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাপান, সিঙ্গাপুর, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, নেপাল, মালায়েশিয়াসহ নানা দেশ সফর করেছেন। তিনি ইসলামিক মিশন অব জাপানের আমন্ত্রণে ১৯৯৭ সালে জাপান যান। তিনি ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকার আমন্ত্রণে ২০০০ সালে আমেরিকা ও কানাডা যান। সেখানে তিনি নানা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। কানাডার বিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে যান তিনি। ২০০২ সালে তিনি ইসলামিক ফোরাম অব ইউরোপ এর দাওয়াতে যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি বেশ কয়েকবার ওমরাহ্ ও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রাজকীয় অতিথি হিসাবে সৌদি আরব যান।

বিবাহ

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার শ্বশুর দিনাজপুর নিবাসী মীর নাতেক আলী একাধারে কলকাতা রাইটারস বিল্ডিং, ইডেন বিল্ডিং, সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট, সেটেলমেন্ট অফিসার, সার্কেল রেভিনিউ অফিসার, টিএনও ইত্যাদি সরকারি পদ অলঙ্কার করে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসাবে কর্মজীবন শেষ করে অবসর নেন। তিনি বই এবং পত্রিকা পড়তে পছন্দ করতেন। তৎকালীন জনপ্রিয় পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত আব্দুল কাদের মোল্লার লেখা "মেরাজ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য" শিরোনামের আর্টিকেল মীর নাতেক আলীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। ঘটনাক্রমে আব্দুল কাদের মোল্লার সাথে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবে বিয়ে দিতে বিনাবাক্যে রাজি হন। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ১৯৭৭ সালের ৮ অক্টোবর জনাব মীর নাতেক আলীর কন্যা বেগম সানোয়ার জাহানের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার দুই ছেলে হাসান জামিল, হাসান মওদুদ এবং চার মেয়ে আমাতুল্লাহ পারভিন, আমাতুল্লাহ শারমিন, আমাতুল্লাহ লারজিন ও আমাতুল্লাহ নাজনীন।

বেগম সানোয়ার জাহান এবং মুক্তিযুদ্ধ

বেগম সানোয়ার জাহান ইডেন কলেজ থেকে পড়াশুনা করেছেন। তিনিও শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার মত বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন ও ইডেন কলেজের ছাত্রী ইউনিয়নের জিএস ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বেগম সানোয়ার জাহান তাঁর পিতার সাথে কুষ্টিয়াতে ছিলেন। বেগম সানোয়ার জাহানের পরিবার মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বেগম সানোয়ার জাহান মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। চরম সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধারা ঠিক মতো খাবার পেতো না। এমন সময় বেগম সানোয়ার জাহান মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিয়মিত খাবার পাঠাতেন। এভাবে সাধ্যমতো মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের, নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়ে ওঠে।

পারিবারিক জীবন

রাসুল (সা) এর আদর্শ অনুসরনে সদা সচেষ্ট ছিলেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা। ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ তিনি যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করতেন। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা) যেমন শুধু রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না, শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে একজন যথার্থ স্বামী ছিলেন। অনুরূপ, রাসূলের (সা) আদর্শে অনুপ্রাণিত আব্দুল কাদের মোল্লা পারিবারিক সকল কাজ করতেন। শত ব্যস্ততার মাঝে বাজার করতেন, স্ত্রীর রান্নার কাজে সহযোগিতা করতেন, ঘর পরিষ্কার ও গোছাতেন। একজন স্বামী হিসেবে তিনি স্ত্রীর কাজের মর্যাদা দিতেন এবং সহযোগিতা করতেন।

উনি নিয়মিত শুক্রবারে পারিবারিক বৈঠক করতেন। কুরআন-হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করতেন। উনি বাচ্চাদেরকে মাথায় নিয়ে ঘুরতেন। বড় মেয়ের দুই ছেলে উনার বিশেষ

পছন্দের ছিল। গ্রেফতার হওয়ার আগে উনি প্রায়ই ডেকে এনে এদের সাথে সময় কাটাতেন। গান শোনাতেন। উনি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খোঁজ নিতেন ও নানা সমস্যার সমাধান দিতেন। সাংগঠনিক সফরে সময় থাকলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে যেতেন। আত্মীয়স্বজনের সাথে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। দরিদ্র আত্মীয়দের সাহায্য করতেন।

পরম আদরের দুই নাতি যায়েদ ও জুনায়েদের সাথে

সাংবাদিকতা ও রাজনীতি নিয়ে সদাব্যস্ত এ মানুষটি যখন পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হতেন, তখন মনেই হতো না শত বোঝা কাঁধে নিয়ে তিনি হাঁটছেন অনন্তের পথে। পরিবারের ছোট সদস্যদের সংস্পর্শে এলে তিনি যেন হয়ে যেতেন শিশুর মতই কোমল। এসব গুণাবলির কারণে নিতান্ত অপরিচিতজনও নিমিষেই হয়ে যেতো তার বন্ধু। তবুও দ্বীন কায়েমের কঠোর তাগিদে পারিবারিক বন্ধনকে অনেক সময়ই দিতে হয়েছে অনিচ্ছাকৃত ছুটি।

একান্ত জীবন

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার অন্যতম অভ্যাস ছিল নিজের কাজ একান্তভাবে নিজের মনে করা। নখ কাটা, জামা-লুঙ্গি ছিঁড়ে গেলে সেলাই করা, নিজের মোজা-গেঞ্জি-টুপি ধোয়া, মাছ ধরার যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা, দাড়ি ছাঁটাই করা ইত্যাদি নানা কাজ করার সময় তিনি আপন ভুবনে ডুবে যেতেন। মাছ ধরা তার প্রিয় শখ ছিল। নানা জায়গায় তিনি মাছ ধরতে যেতেন। অবসর সময়ে মাছ ধরার যন্ত্রপাতি ঠিক করতেন। তিনি ডায়াবেটিক রোগী ছিলেন। তাই নিয়মিত ব্যায়াম করতেন।

বই পড়া ছিলো তার নিয়মিত অভ্যাস। শত-সহস্র ব্যস্ততার মাঝে তিনি শুধুই পড়তেন। জ্ঞানপিপাসু এই মানুষটি জ্ঞানার্জনে ছিলেন অবিচল, শ্রান্তিহীন। ছোটবেলা থেকেই তিনি বই কিনতেন, নিজের লাইব্রেরি ছিল তার সেই সদরপুরের জীবন থেকেই। ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী মানুষটি শুধু ইসলামি বই-পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন তা নয়, বরং তিনি সকল কোরআন, হাদিস, ইসলামি সাহিত্যের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্ম, মতাদর্শ, দর্শন, বিজ্ঞানের বই পড়তেন। শিশু-কিশোরদের বইও

পড়তেন। ভাল কোন বই পড়লে সেকথা অন্যকে বলতেন ও বই দিতেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার সময়ে গাড়িতে উনি বই পড়তেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপরে ইংরেজিতে লেখা বই উনি নিয়মিত সময় করে পড়তেন। আন্তর্জাতিক নানা পত্র-পত্রিকার আর্টিকেল প্রিন্ট করে রাতে ঘুমানোর সময় পড়তেন।

একান্তে মাছ ধরায় ব্যস্ত

শিক্ষাবিদ

জনাব মোল্লা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। যার মধ্যে বাদশাহ ফয়সাল ইনস্টিটিউট, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ও এর স্কুল অন্যতম। তিনি পর পর তিনবার বাদশাহ ফয়সাল ট্রাস্টের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকার অন্যতম নামকরা বিদ্যাপীঠ গুলশানের মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি ছিলেন।

২০০৪ সালে ১৯ অগাস্ট ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে বিসিআইসি মিলনায়তনে আয়োজিত ইসলামী শিক্ষা সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

একজন ইসলামী শিক্ষাবিদ হিসাবে আধুনিক শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার সেতুবন্ধনে তিনি সারা জীবন কাজ করেছেন। আধুনিক শিক্ষার উপরে তার নানা বিশ্লেষণধর্মী আর্টিকেলগুলো সবসময় প্রশংসিত হয়েছে। শিক্ষার উপরে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে তার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল। তার প্রবন্ধ সব সময়েই মৌলিকত্বের দাবি রাখতো। শিক্ষানুরাগী মানুষ মাত্রই কাদের মোল্লার কথায় অন্য মাত্রা খুঁজে পেতেন। জামায়াত-শিবির আয়োজিত শিক্ষাদিবস উপলক্ষে নানা সেমিনারে উনি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। কুদরতে খুদাসহ অন্যান্য শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে উনার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা মানুষের চিন্তার খোরাক ছিল। মানারাতের পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস প্রণয়নে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি প্রকাশিত নানা বই তিনি সম্পাদনা করেছেন। ইসলামী আন্দোলনের শিক্ষা বিপ্লবের ব্যাপারে তিনি সবসময় চিন্তা করতেন। প্রত্যাশিত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তার আর্টিকেলগুলো ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই তার ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল। তার সংগ্রহে প্রচুর বই ছিল। অনেক লেখক উনার কাছে পান্ডুলিপি সংশোধনের জন্য দিত।

সামাজিক কর্মকান্ড

জনাব মোল্লা সক্রিয়ভাবে সামাজিক সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন। যার মধ্যে সাইয়্যেদ

২০০৪ সালের ২৬ জুলাই রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ এলাকার বন্যার্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমি, সদরপুর মাদরাসা ও এতিমখানা, ফরিদপুর জেলার হাজিডাঙ্গি খাদেমুল ইসলাম মাদরাসা ও এতিমখানা, সদরপুর আল-আমিন একাডেমী ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া ফরিদপুরের নানা অঞ্চলে মসজিদ তিনি করে

দিয়েছেন। বাংলাদেশের নানা এলাকার ও ফরিদপুরের অসংখ্য দরিদ্র মানুষের তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ধনী লোকজনের কাছ থেকে টাকা এনে এলাকার লোকদের সাহায্য করেছেন। বন্যার সময়ে ফরিদপুর, রাজবাড়ী ইত্যাদি নানা এলাকায় নৌকা করে মানুষের দ্বারে দ্বারে সাহায্য নিয়ে গিয়েছেন, ওষুধ বিলি করেছেন, স্যালাইন দিয়েছেন, বিশুদ্ধ পানির ট্যাবলেট দিয়েছেন। গরিব শিক্ষার্থীদের মাঝে বই-খাতা বিলি করেছেন। এতিম-মিসকিনদের মাঝে জামা কাপড় দিয়েছেন। জাকাতের টাকা এনে দিয়েছেন। তিনি বাড়ি গেলে গরিব দরিদ্র মানুষের লাইন লেগে যেত। সবাইকে তিনি সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। গরিব মেয়েদের বিয়ে দিতে তিনি

২০০৮ সালের ৩১ অক্টোবর ফরিদপুরের সদরপুরে আল আমীন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

সাহায্য করেছেন। নলকূপ করে দিয়েছেন, ব্রিজ- কালভার্ট করেছেন।

ঈদের সময় তিনি প্রায়ই গ্রামের বাড়ি যেতেন। মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতেন। ঈদের নামাজের মাঠে যাওয়ার আগে সামান্য মিষ্টি খেতেন। ঈদের নামাজের আগে সবার প্রতি কথা বলতেন, ঈদের মাসলা-মাসায়েল জানাতেন, ছেলেদেরকে নিয়ে নামাজে প্রথম কাতারে দাঁড়াতেন। কখনও তিনি নিজেই নামাজ পড়াতেন, খুতবা দিতেন। নামাজ শেষ করে সাধারণ মানুষের সাথে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কোলাকুলি করতেন। নামাজ শেষ করে যে পথে নামাজের জন্য এসেছেন, অন্য পথে বাড়ি ফিরতেন। কোরবানি ঈদের সময় নামাজ শেষ করেই পশু কোরবানির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। অনেকের অনুরোধে অনেক মানুষের পশু কোরবানি করে দিতেন। রক্তে তার পাঞ্জাবি ভিজে যেত। জবাইকৃত পশুর গোশত দিয়ে নাশতা করতেন। অনেক মানুষ দেখা করতে আসত। তাদের সাথে দেখা করা,

কথা বলা, খোঁজ-খবর নেয়া তার স্বভাব ছিল। অভাবী মানুষকে তিনি এই ঈদের সময় সাহায্য করতেন।

সংস্কৃতি ও খেলাধুলা

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার শিক্ষার প্রতি আগ্রহের পাশাপাশি ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে ভাল গান গাইতেন। জামায়াত-শিবিরের রুকন-সদস্যদের শিক্ষাশিবির ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তিনি নানা সময়ে গান গেয়েছেন। ইসলামি আন্দোলনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রাথমিক কাজ হিসেবে সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীকে এক সময়ে তিনি শক্তভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ইসলামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক প্লাটফর্ম তৈরি করার ব্যাপারে তিনি সব সময় কাজ করেছেন। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য আর্থিকভাবে উনি সাহায্য করতেন।

খেলার প্রতিও তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিলো। ফুটবল খেলা খুব পছন্দ করতেন। তিনি নিজে এক সময় ভাল ফুটবল খেলতেন। শরীরচর্চার জন্য উনার কাছে খেলাধুলা প্রয়োজনীয়তা ছিল। এছাড়া মাঝে মাঝে উনি ক্রিকেট খেলা দেখতেন। পরিবারের ছেলেদেরকে খেলাধুলা করতে উৎসাহিত করতেন। উপমহাদেশের ফুটবলের কিংবদন্তী জাদুকর সামাদের গল্প করতেন মাঝে মাঝে। দলীয় অনুষ্ঠানে নেতা-কর্মীদের শারীরিক সুস্থতার জন্য খেলার পরামর্শ দিতেন।

যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার ও বিচার

২০১০ সালের ১৩ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান গেট থেকে গ্রেফতার হন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

জনাব আব্দুল কাদের মোল্লার জীবন সব সময়ই প্রকাশ্য এবং স্বচ্ছ। তিনি কোন গোপন আন্দোলনের সদস্য কিংবা কোন গোপন ব্যক্তি ছিলেন না। দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কেউ কখনও তাকে যুদ্ধপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করেননি অথবা 'কসাই কাদের মোল্লা' বলেও ডাকেনি। বিগত ৪০ বছরের তার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের বা মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি অভিযোগও কোথাও উত্থাপিত হয়নি। যুদ্ধাপরাধী বা রাজাকার, আলবদর, আলশামস হিসাবে কোন তালিকায় তার নামতো

২০১০ সালের ২ আগস্ট ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে জামায়াতের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

দূরের কথা, সন্দেহভাজনের তালিকায়ও নাম ছিল না। এমনকি এ ধরণের অপরাধে তাকে কেউ ইত:পূর্বে অভিযুক্তও করেনি।

স্বাধীনতার প্রায় ৪ দশক পর ২০০৭ সালে ওয়ান ইলেভেনের অদ্ভুত সরকারের সময়ে হঠাৎ করেই যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। শুরু হয় ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের পরিকল্পিত চরিত্রহনন। আওয়ামী লীগ বিরোধী আন্দোলনে যে সব জামায়াত নেতাগণ সাহসী ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম ছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে চলে অব্যাহত মিথ্যা প্রচারণা। যে আওয়ামী লীগ নেতারা এক সময়ে যে জামায়াত নেতাদের সাথে একই টেবিলে বসে চা খেতে খেতে আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছেন, সেই আওয়ামী নেতারা ঐ সব জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসিত বক্তব্য দিতে থাকেন। আওয়ামী লীগ দলীয় লোকদের দিয়ে জামায়াত নেতাদের নামে নানা মামলা দায়ের করতে থাকে। ঐ বছরেরই ১৭ ডিসেম্বর আব্দুল কাদের মোল্লাসহ কয়েকজন শীর্ষ জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জ থানায় একটি মামলা হয়। ১৩ জুলাই ২০১০। সকাল ১১টা। জামায়াতে

ইসলামীর সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লা ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামান হাইকোর্টে আসেন জামিনের জন্য। মামলার যখন শুনানি চলে তখন সুপ্রিম কোর্ট প্রধান গেটের সামনে অবস্থান নেয় বিপুল সংখ্যক গোয়েন্দা সদস্য এবং শাহবাগ থানার পুলিশসহ অগণিত পুলিশ। আব্দুল কাদের মোল্লা এবং মুহাম্মদ কামারুজ্জামান সুপ্রিমকোর্ট চত্বর পার হয়ে প্রধান ফটকে গেলে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। মানবতার কল্যাণের জন্য যে মানুষটি সদা তৎপর ছিলেন, দেশের এ প্রান্ত

২০১১ সালের ১৫ জুন ধানমন্ডির তথাকথিত সেফহোম থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে কারাগারের পথে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত অবিরাম ছুটেছেন, সে নির্মল চরিত্রের অধিকারী মানুষটির উপর 'মানবতাবিরোধী অপরাধের' অভিযোগ আনা হলো !

২৬ জুলাই ২০১০ তারিখে আব্দুল কাদের মোল্লাকে প্রথম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ হাজির করা হয়। সুনির্দিষ্ট কোনো মামলা না থাকলেও আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ট্রাইব্যুনাল। ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে কসাই কাদের উল্লেখ করে সাতটি চার্জ দাখিল করে রাষ্ট্রপক্ষ। ২৮ ডিসেম্বর ২০১১ আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আমলে নেয় ট্রাইব্যুনাল। ২৮ মে ২০১২ তারিখে আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে ছয়টি অভিযোগ উল্লেখ করে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ গঠন করে ট্রাইব্যুনাল-২। ৩ জুলাই কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। রাষ্ট্রপক্ষে ১২ জন এবং আসামি পক্ষে ছয় জন

সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে। ২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আব্দুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। এরপর শুরু হয় তথাকথিত শাহবাগ আন্দোলন। 'অভিনব' এই আন্দোলনের ফলে ২০১৩ সালের ১৭ ফেরুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করে সরকার ও পরবর্তীতে তার সর্বোচ্চ শাস্তির আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ।

২০১৩ সালের ৩১ মার্চ প্রধান বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের আপিল বেঞ্চ গঠন করা হয় আপিল আবেদন শুনানির জন্য। ১ এপ্রিল থেকে শুনানি শুরু হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ যাবজ্জীবন সাজা বাড়িয়ে মৃত্যুদন্ড দেয় কাদের মোল্লাকে। ৫ ডিসেম্বর ২০১৩ আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। ৮ ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনাল তার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে। এরপরই শুরু হয়ে যায় ফাঁসি কার্যকরের প্রস্তুতি।

আব্দুল কাদের মোল্লার শাহাদাতবরণ

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার শাহাদাতের পরদিন সকালে সদরপুরের আমিরাবাদ গ্রামের ফজলুল হক ইনস্টিটিউটের মাঠে অনুষ্ঠিত জানাজায় হাজার হাজার মানুষ

সরকারের নির্দেশে ১০ ডিসেম্বর রাতেই আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের যাবতীয় উদ্যোগ নিয়েছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ফাঁসি কার্যকরের মাত্র দেড় ঘণ্টা আগে চেম্বার বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ফাঁসি কার্যকর বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত স্থগিত করে আদেশ দেন। ১১ ডিসেম্বর বুধবার সকালে প্রধান বিচারপতি মো: মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের আপিল বেঞ্চে

শুরু হয় রিভিউ আবেদনের শুনানি। এ ছাড়া আসামিপক্ষ স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানোরও আবেদন করে। রিভিউ আবেদন চলবে কি চলবে না এ বিষয়ে ১১ ডিসেম্বর শুনানি শেষে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুলতবি করায় ফাঁসি স্থগিতাদেশও বহাল থাকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

১২ ডিসেম্বর সকালে আবার শুরু হয় রিভিউ আবেদনের ওপর শুনানি। শুনানি শেষে ১২টা ৭ মিনিটে প্রধান বিচারপতি ঘোষণা করেন আবেদন ডিসমিসড। ১২ ডিসেম্বর রাত ১০টা ১ মিনিটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আব্দুল কাদের মোল্লাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে মৃত্যু কার্যকর করা হয়। মৃত্যু কার্যকর করার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারির মধ্যে এই মহান শহীদের লাশ নিয়ে যাওয়া হয় তার জন্মস্থান সবুজ ছায়াঘেরা ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার আমিরাবাদ গ্রামে। পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়া পুলিশি প্রহরায় ইসলামী আন্দোলনের এই নেতাকে তার পিতা-মাতার পাশে দাফন করা হয়। ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে আব্দুল কাদের মোল্লা চলে গেলেন সুবাসিত জোছনার দেশে !

শুরু হলো এক নতুন ইতিহাস, নির্বাক হয়ে দেখলো পৃথিবী ! মিথ্যার রোষানলে সত্যকে উজ্জীবিত রাখতে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে সত্যের জয়গান গাইলেন তিনি! একজন আদর্শ মুসলিমের পরিচয় দিলেন এই প্রাণবন্ত মানুষটি। একজন মুসলমান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নোয়াবার নয়! ওরা চিরদিন দমিয়ে রাখতে চেয়েছে আল কোরানের বাণী, কিন্তু যুগে যুগে জন্ম নিয়েছে শহীদ কুতুব, শহীদ হাসান আল বান্না আর শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার মতো সাহসী প্রাণ। যাঁরা জীবনবাজি রেখে নির্ভীকচিত্তে লড়েছেন। আপাত: মূল্যবান ইহজাগতিক প্রাপ্তিকে যাঁরা তুচ্ছজ্ঞান করে চিরস্থায়ী চিরশান্তির নহর ধারা প্রবাহিত, ফুলে-ফলে সুশোভিত জান্নাতের পথে সদা-সর্বদা থেকেছেন অবিচল, তাঁরা কোরআনের পতাকা, আদর্শ এবং বিধানকে পৃথিবীর বুকে সমুন্নত রেখেছেন।

বিচার বিভাগকে কলঙ্কিত করা এ রায় শুধুমাত্র কাদের মোল্লার দেহ থেকে প্রাণের বন্ধনকেই আলাদা করতে পেরেছে, পারেনি শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার লালিত আদর্শের অগ্রযাত্রায় প্রতিরোধের বাঁধ দিতে। যার জীবনের শেষ দিনগুলো ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসকে করেছে আরও মহিমান্বিত। যা অনাগত প্রজন্মের জন্য প্রেরণার বাতিঘর হিসেবে কাজ করবে কেয়ামত পর্যন্ত। তার শেষ জীবনের কথাগুলো স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মানসপটে। আব্দুল কাদের মোল্লা ছিলেন এক অলৌকিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট, যে জীবন ছিলো রাসুল (সা) প্রদর্শিত, যে জীবন ছিলো আবু বকর, ওমর, আলী, ওসমানদের, খোদাভীরুদের। সে জীবন সত্যি আলোয় আলোয় ভরালেন মহান রাব্বুল আলামিন। সত্যের পথের যাত্রীরা পেলো ক্লান্তিহীন অবিচল চলার শক্তি, মজবুত ঈমান, নিশ্চল আদর্শ, সীমাহীন সাহস। অন্তরে এলো মহাপরাক্রমশালীর পক্ষ থেকে বিশ্বাস; সত্যের বিজয় একদিন আসবেই। আঁধারের অপতৎপরতাগুলো রাতের আঁধারেই মিলিয়ে যাবে, রাত শেষে উদিত হবে সত্যের সূর্য। যে সূর্য নিয়ে আসবে আলো, আলো আসবেই। আর শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা চিরদিন বেঁচে থাকবেন এদেশের লক্ষ কোটি মানুষের অন্তরে। একদিন তার রক্তে রঞ্জিত এই বাংলাদেশে তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবেই ইনশাআল্লাহ্।

প্রবন্ধ

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি

২০০২ সালে ২৭ আগস্ট ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ছাত্রশিবির আয়োজিত "জাতীয় শিক্ষামেলা ২০০২" শীর্ষক অনুষ্ঠানে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার পঠিত প্রবন্ধ

'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' এ উপদেশ বাক্যটির চাইতেও শিক্ষার ইতিহাস অনেক পুরাতন। কারণ শিক্ষার ভাল ফল পাওয়ার পরই সম্ভবত এই উপদেশ বাক্যটির জন্ম। মানবসভ্যতার বয়স যতদিন শিক্ষার বয়সও ততদিন। পৃথিবীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত ও অবিকৃত কিতাব আল কুরআনের মতে মানবজাতির বিচরণ অজ্ঞতার অন্ধকারে শুরু হয়নি। বরং প্রথম মানুষকে আল্লাহ একজন জ্ঞানী ও নবী হিসাবেই খলীফা করে পাঠিয়েছেন। হযরত আদমকে (আ) সৃষ্টি করার পূর্বে মহান আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যে কথোপকথন থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে প্রথম মানুষকে খলীফা হিসাবে দুনিয়ায় পাঠানোর জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল, জান্নাতে রাখার জন্য নয়। পরবর্তী পর্যায়ে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে যেন তিনি জ্ঞানার্জনের পর সতর্কতার সাথে জীবনযাপন করতে পারেন। কেননা অভাব, দুঃখ-বেদনা, জরা-মৃত্যু, ভয়ভীতি এবং লোভ-লালসাহীন জান্নাতেও অসতর্ক হলে শয়তান মানুষের

কতটা ক্ষতি করতে পারে, আর দুঃখ বেদনা, অভাব-অনটন, স্নেহ-প্রেম-প্রীতির দুর্বলতা, জরা-মৃত্যু, লোভ-লালসা ও ভীতিকর এই পৃথিবীতে অসতর্ক এবং জ্ঞানহীন হলে শয়তান মানুষকে কতটা বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এই বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে খেলাফতের মহান দায়িত্ব পালনের যোগ্য হওয়ার উদ্দেশ্যে সম্ভবত কিছুকাল জান্নাতে আদম (আ) এবং তাঁর স্ত্রীকে রাখা হয়েছিল। তবে প্রকৃত কারণ কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন।

শিক্ষা কী?

শিক্ষা একটা অব্যাহত প্রক্রিয়া। যেহেতু মানুষের জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করার উদ্দেশ্যেই শিক্ষার আবিষ্কার, সেহেতু এর সংজ্ঞা বা বর্ণনা অল্পকথায় দেয়া কঠিন। পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ আদমকে (আ) সকল জিনিসের নাম শেখানোর মাধ্যমে জ্ঞান বা শিক্ষার সূচনা করেন। তারপর সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও মানুষের প্রয়োজন পুরণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়েছে। জন ডিউই-এর মতে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতাই শিক্ষা। তিনি নীতি-নৈতিকতার বিষয়টি মোটেই বিবেচনা করেননি। সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তো নাস্তিকতা, বস্তুগত উন্নতি এবং বিবেক ও যুক্তিহীন মার্কসবাদই ছিল শিক্ষার মূল কথা। মানুষের হৃদয়বৃত্তি এবং নৈতিকতাকে অস্বীকার করার কারণেই সম্ভবত সমাজতন্ত্রকে এত দ্রুত আত্মহত্যা করতে হয়েছে।

মানুষ শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় 'মান+হুঁশ'। অর্থাৎ যার মান-মর্যাদাবোধ ও কান্ডজ্ঞান আছে সেই মানুষ। কান্ডজ্ঞান কার কতটুকু আছে তার ওপর তার সামগ্রিক আচরণ বা Behavior নির্ভর করে। মানুষের সামগ্রিক আচরণ যা সকলের কাছে বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে গ্রহণযোগ্য বা আকাংখিত-এমন আচরণ সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ন্যূনতম নীতিনৈতিকতা ছাড়া সম্ভব নয়। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যা তিনি 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে মাসীমা, লাবণী আর অমিত রায়ের আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষা হলো পরশ পাথর আর তার থেকে ছিটকে পড়া আলোটাই হল কালচার। শিক্ষার ফল হিসাবে এখানে যা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে মানুষের রুচিসম্মত ব্যবহার ও জীবন-যাপন পদ্ধতি যা তার সামগ্রিক পরিচয় বহন করে যাকে এককথায় বলা যায় কালচার। তাই লাগামহীন ডিগ্রিধারী কোন মানুষের পক্ষে কি করে সমাজকে কিছু উপহার দেয়া সম্ভব?

শিক্ষার সংজ্ঞা

যেকোন জিনিসকেই সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। তবে মানবসভ্যতার গোড়া থেকে যে পদ্ধতি মানুষকে এতদূর নিয়ে এসেছে তার সংজ্ঞাদান কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আমরা কয়েকজন প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদের কয়েকটি সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেই এ পর্ব শেষ করতে চাই।

আমেরিকান শিক্ষাবিদ John Dewey সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "প্রকৃতি এবং মানুষের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ ও মৌলিক মেজাজ প্রবণতা বিন্যাস করার প্রক্রিয়াই শিক্ষা।"

ইংরেজিতে Education শব্দটি নিজেই এর অর্থবহন করে। শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে আগত। E. Ex এবং Ducere, Due শব্দগুলো থেকে আসা। এর বাংলা অর্থ দাঁড়ায় কিছু তথ্য বা Information জেনে সমৃদ্ধ মন যা বের করে দেয়। অর্থাৎ কোন বিষয়ে সম্যক অবগতি এবং জ্ঞাত বিষয়ের মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ। ইংরেজি অভিধানগুলোর ভাষায় "Pack the information in and draw talents out." কবি রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষা হল "To Develop the inert qualities of a man." অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলির উন্নয়নের প্রক্রিয়াই শিক্ষা।

মহাকবি আল্লামা ইকবালের মতে মানুষের 'খুদী' বা রুহের উন্নয়ন ঘটানোর প্রক্রিয়ার নামই শিক্ষা। বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ Professor Syed Muhammad Kutb এর মত অনুযায়ী, "শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের কাজ হল পরিপূর্ণ মানবসত্তার লালন করে এমনভাবে গড়ে তোলা, যা এমন একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি যে, মানুষ তার দেহ, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা, তার বস্তুগত ও আত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের কোনটিই পরিত্যাগ করে না। আর কোন একটির প্রতি অবহেলা বা মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকেও পড়ে না।" Professor Kutb তার The Concept of Islamic Education প্রবন্ধে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

Dr. John Park বলেন, "শিক্ষা হচ্ছে নির্দেশনা ও অধ্যয়ন বা Study-র মাধ্যমে জ্ঞান ও অভ্যাস অর্জন বা প্রদানের কলাকৌশল বা প্রক্রিয়া।"

Herman H. Horne লিখেছেন, "শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত মুক্ত সচেতন মানবসত্তাকে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে উন্নত যোগসূত্র রচনা করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া যেমনটি প্রকাশিত রয়েছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগগত এবং ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় পরিবেশে।" শিক্ষার এ সংজ্ঞাটির মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং উন্নত নৈতিকতা যা স্রষ্টার সাথে সেতুবন্ধন রচনা করার যোগ্যতা রাখে- এমন একটি ধারণা আমাদেরকে দান করে।

মহাকবি মিল্টনের মতে শিক্ষা হল, "Harmonious Development of body, mind and soul." অর্থাৎ দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধন। মন ও আত্মার উন্নতি সাধন ধর্ম ও নৈতিকতা ছাড়া কি করে সম্ভব তা শুধু আমাদের কাছে কেন, যে কোন বিবেকবান ও কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কাছেই বোধগম্য নয়।

এ উপাধ্যায়ের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এবার শুধু পবিত্র কুরআনুল কারীমের উক্তিটি দিয়েই সমাপ্তি টানতে চাই। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতিকে সঠিক জীবনযাপনের জন্য যেসব মহান নবী রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছিল তারা সকলেই ছিলেন মানবতার মহান শিক্ষক। আল্লাহ তাঁদের কাজ সম্পর্কে নিজেই বলেন, "তারা আল্লাহর আয়াত

বা নিদর্শন বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের মানদ- সম্পর্কে মানুষকে পড়ে শুনান, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন আর শিক্ষা দেন জীবনযাপনের কৌশল অথচ এর পূর্বে তারা ছিল সুস্পষ্ট গুমরাহিতে নিমজ্জিত।" (সূরা আল জুমুআ-২)

শব্দের কিছু হেরফের হলেও নবীদের শিক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ তায়ালা কমপক্ষে তিনবার শিক্ষা সম্পর্কে একথাগুলো উচ্চারণ করেছেন।

উপরোক্ত সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ থেকে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে শুধু দৈহিক, বস্তুগত, প্রযুক্তিগত বা ভাষাগত ব্যুৎপত্তি অর্জনের নামই শিক্ষা নয়। তার দেহ, মন, আত্মা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নামই শিক্ষা। আর এর জন্য ধর্ম, নৈতিকতা, আল্লাহর অস্তিত্ব, তার ঐশী হেদায়াত, যার মাধ্যমে মানবজাতি ভাল মন্দ বা হক-বাতিলের জ্ঞানার্জন করার সুযোগ পেয়েছে, তাই হওয়া উচিত শিক্ষার ভিত্তি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দার্শনিক প্লাটো বলেছেন, কোন মানুষ বা জাতির বিশ্বাস বা Commitment এবং তার দেশ পরিচালনার জন্য রচিত সংবিধানই হওয়া উচিত শিক্ষার ভিত্তি।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার প্রয়োজন মানবজাতির জন্য কতটা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মুহাম্মদ (সা) শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনকে প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর জন্য ফরজ বা অপরিহার্য ঘোষণা করেছেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন:

একটি আরবি উপদেশ বাক্য যা অনেকের কাছে হাদিস হিসাবেই পরিচিত তা হল সুদূর চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞানার্জন কর। সম্ভবত তৎকালীন সময়ে আরব থেকে চীনের সাথে যোগাযোগ ছিল সবচেয়ে কঠিন। এ জন্যই জানার্জনের জন্য কষ্ট স্বীকারের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে চীনের উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষা ও জ্ঞান এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা) অন্য একটি হাদিসে এমন গুরুত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী কথা বলেছেন যে, সারা দুনিয়ার দার্শনিকদের কথা যোগ করলেও তার সমান ওজনদার হবে না। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেনঃ "তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। কেননা জ্ঞান অর্জন করা আল্লাহকে ভয় করার শামিল, জ্ঞান অন্বেষণ করা আল্লাহর ইবাদাতের শামিল, তা নিয়ে আলোচনা করা আল্লাহর গুণকীর্তন করার পর্যায়ভুক্ত, তা নিয়ে গবেষণা করা জিহাদের শামিল, মূর্খকে জ্ঞান দান করা সদকাস্বরূপ এবং আত্মীয়-স্বজনকে জ্ঞান দান করা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত। জ্ঞান হচ্ছে হালাল ও হারাম জানার মাধ্যম, জান্নাতের পথের দিশারি, একাকিত্বের সহচর, প্রবাসে সঙ্গী, নির্জনে আলাপকারী, সুখে-দুঃখে পথ নির্দেশক; শত্রুর মুকাবিলা করার হাতিয়ার, বন্ধুদের কাছে অলঙ্কার। এ দ্বারা আল্লাহ বহু জাতিকে উন্নত করেন, সৃমৃদ্ধ করেন ও পথ প্রদশর্ক বানান, অনেককে জ্ঞানীদের অনুসারী বানান, তাদের মতামতকে চূড়ান্ত মত হিসাবে গ্রহণযোগ্য করেন, ফিরিশতারা তাদের বন্ধুত্বের প্রত্যাশী হয়, নিজেদের ডানা

দ্বারা তাদের ধুলা-ময়লা মুছে দেয়, তাদের জন্য প্রতিটি সরস ও নিরস পদার্থ সমুদ্রের মাছ ও জন্তু এবং স্থলের হিংস্র ও সাধারণ পশুপাখি দোয়া করে। কেননা জ্ঞান হচ্ছে অজ্ঞানতা থেকে হৃদয়কে রক্ষা করার উপায়, অন্ধকারে আলো জ্বালানোর প্রদীপ। জ্ঞানের দ্বারাই বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ লোকদের মর্যাদায় উন্নীত হয়। জানার্জনের জন্য চিন্তা, গবেষণা করা রোযার সমতুল্য এবং অধ্যয়ন ও আলোচনা নামাযের তুল্য। জ্ঞান দিয়ে আত্মীয়তা রক্ষা করা হয় এবং হালাল ও হারাম চেনা ও বাছবিচার করা যায়। জ্ঞানই কাজের প্রদর্শক। কাজ জ্ঞানকেই অনুসরণ করে। সৌভাগ্যশালীরাই জ্ঞান অর্জন করে আর হতভাগারই তা থেকে বঞ্চিত হয়।"

শিক্ষার প্রয়োজন এবং সুদূরপ্রসারী ফলের কারণে চীন দেশে এখনও একটি প্রবাদ বাক্য চালু আছে, তা হলো, তুমি যদি এক বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাক তাহলে শস্যদানা রোপণ কর, যদি দশ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাক তাহলে বৃক্ষ রোপণ কর। আর তুমি যদি শত বা হাজার বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাক তাহলে মানুষ 'রোপণ' কর। কারণ শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষে রোপণ করা হয় যা শত-সহস্র বছরের সভ্যতার সূচনা করে।"

উপরোক্ত আলোচনাগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় প্রকৃত মানুষ, সময়ের সাথে খাপ-খাওয়ানোর যোগ্য মানুষ, সংস্কৃতিবান বা রুচিবান মানুষ, সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগাযোগ ও তার ইচ্ছা পূরণের যোগ্য মানুষ, শত-সহস্র বছরের সভ্যতা সংস্কৃতির ভিত রচনা করার যোগ্য মানুষ তৈরি হয় শিক্ষার মাধ্যমে। প্রকৃত কথা হল আকৃতিগত একটি মানুষকে সত্যিকার অর্থে জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ মানুষে রূপান্তরিত করে শিক্ষায়। সম্ভবত এই কারণেই নবী করীম (সা) শিক্ষা গ্রহণকে সকলের প্রতি ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

শিক্ষা ও ধর্ম বা ঐশী জীবনাদর্শ

একটা জিনিস আমাদের খুব ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার যে, তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া আর জ্ঞানী হওয়া এক কথা নয়। শিক্ষা জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। বরং লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার মাধ্যম মাত্র। যার সামনে কোন আদর্শ নেই, মানবতার কল্যাণের মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে খুশি করার কোন চূড়ান্ত লক্ষ্য নেই, তার যত ডিগ্রীই থাকুক, তার শিক্ষা ও জীবন দুটোই ব্যর্থ। M.V.C Jaffreys অভিযোগ করে বলছেন যে, "আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে এর লক্ষ্যের অনিশ্চয়তা। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বস্তুগত প্রাপ্তির উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ছাড়া মহত্তর কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে না।"

শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন মানুষ তৈরি করা যারা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা এবং আদর্শ অনুযায়ী স্বকীয় সংস্কৃতি নির্মাণ করবে এবং এ সংস্কৃতির

মাধ্যমে এমন একটি জাতি গঠন করবে যার ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে হাজার বছর ধরে। জীবন শুধু ধনে নয় জ্ঞানে, গুণে রং-রুচিতে ঐশ্বর্যপূর্ণ হয় জীবনাদর্শ দ্বারা। আদর্শ, ধর্ম বা নৈতিকতা বিহীন শিক্ষার ফল সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে গিয়ে শিক্ষাবিদ Stanly Hull বলেছেন, "If you teach your children the three R's (Reading, Writing and Arithmetic), And Leave the fourth 'R' (Religion), You will get a fifth 'R' (Rascality)." লেখা, পড়া আর যোগ বিয়োগ করার যোগ্যতার সাথে ধর্ম শিক্ষা না দিলে মানুষরূপী বর্বর পাওয়া যাবে তা বোধহয় আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে বা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। আমাদের কলেজ-বিশ্বদ্যিালয়গুলো আজ ডাকাতদের গ্রাম, সেখানে দানবেরা মানুষের সবকিছু লুণ্ঠন আর খুন করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে ধর্ষণের সেঞ্চুরি পালন করে, শিক্ষকদেরকে বেধড়ক মারধর করতেও তাদের লজ্জা হয় না। বাইরের অঙ্গনে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটিয়ে গোটা জাতির জীবন তারাই অতিষ্ঠ করে তোলে। আর প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেলে গডফাদারের ভূমিকা পালন করে, অথবা জাতির সম্পদ লুণ্ঠন করে দেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বা দুর্নীতিতে সারা দুনিয়ায় চ্যাম্পিয়ন বানায়। দুই দশকেরও বেশি আগে সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকায় এক ভদ্রলোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর রিপোর্ট করতে গিয়ে একটি কার্টুনের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাতে দেখা গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন মানুষ ঢুকে শেষ দরজা দিয়ে ছাগল হিসাবে বের হচ্ছে। প্রতীক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিলেও সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা একই।

অন্যদিকে পবিত্র কুরআনে উদ্বোধনী সূরা আল-ফাতিহার মাধ্যমে মানবজাতির পক্ষ থেকে কল্যাণময় জীবনের জন্য ঐশী হেদায়াত চাওয়ার পর আল্লাহ প্রথমেই সন্দেহবিহীন কিতাব নাজিল করে বলে দিলেন যে, আল্লাহকে ভয় করে যারা সতর্ক ও আদর্শ জীবনযাপন করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য আল-কুরআন পথপ্রদর্শক। আর পশুর প্রতীক হিসাবে প্রথম সূরাটির নাম দিলেন গাভী। গোটা কুরআন থেকে হেদায়াত বা পথনির্দেশনার শিক্ষা লাভ শেষে তার আসল পরিচয় কি হবে- সে হিসাবে উপসংহারের সূরাটির নাম দিলেন আন-নাস বা মানুষ। ভাবখানা যেন এমন যে পশু স্বভাবের মানবরূপী জন্তুটি কুরআন থেকে হেদায়াত গ্রহণ করার পর খাঁটি মানুষ হিসাবে বের হবে। সাথে সাথে তাকে মানুষ ও জ্বীনরূপী শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করার শিক্ষাও দেয়া হয়েছে।

বর্তমান দুনিয়ার সকল দেশের অবস্থা প্রায় একই। ইউরোপ-আমেরিকার বস্তুবাদী ভদ্রলোকেরা সভ্যতার যত দাবিই করুক তাদের দেশের অবস্থা আরো খারাপ। সামাজিক বিশৃংখলা, চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণ, যৌন উচ্ছৃংখলতা যেখানে নিত্যদিনের ব্যাপার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের আইন উপদেষ্টার ছেলে তার মাকে পর্যন্ত ধর্ষণ করেছিল যা 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কালামে ছাপা হয়েছিল। তারাই প্রযুক্তির উন্নতির নামে গোটা পৃথিবীর মানুষকে জিম্মি করে একচেটিয়া বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধে কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করেছে। তাদেরই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা মিঃ বুশ, মিঃ রামসফেল্ড, ডিকচেনি আর টনি ব্লেয়ারদের মত যুদ্ধোন্মাদ বিশ্ব সন্ত্রাসী সৃষ্টি করেছে যারা যে কোন সময় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে।

মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচারের মানদন্ড তাদের কাছে ভিন্ন। কাশ্মীর, গুজরাট, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, কসোভো, ফিলিস্তিন, মিন্দানাও প্রভৃতি স্থানে মুসলমানেরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করলে তারা হয় সন্ত্রাসী। আর ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুর, পাকিস্তানের সিন্ধু বা করাচি, নাইজেরিয়া, সুদান, বাংলাদেশে পার্বত্য এলাকায় ছোট বা বড় যে কোন গ্রুপের লোকেরাই বিদ্রোহ করলে তা হলো স্বাধীনতার মহান সংগ্রাম। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপবাদের শাস্তি দিলে তাহলো মানবাধিকার লংঘন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরাইলের যত রকমের শক্তিশালী মারণাস্ত্রের যতবড় গুদামই থাক তারা হলেন শান্তির দূত। আর যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান এবং ইরাকে মসজিদের গম্বুজ দেখা গেলেও সেগুলো হল অস্ত্রের কারখানা। তাদের যেন আত্মরক্ষা করার অধিকারটুকুও নেই। পশ্চাত্যের কাছে একমাত্র উন্নত প্রযুক্তি ছাড়া মহত্তর জীবনের জন্য কোন কিছুই দেয়ার নেই।

বিশ্ব শিক্ষা ব্যবস্থায় বস্তুবাদের থেকে উৎসারিত পুঁজিবাদ বা সহায় সম্পদ ও ক্ষমতার মোহ তাদেরকে এমন এক উন্মত্ত পশুতে পরিণত করেছে যে প্রতিনিয়ত তাদের শান্তির হুমকিতে বিশ্বমানবতা শঙ্কিত। এজন্যে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পর পর The Philosophy of Modern Education বইতে Prof. Brabacher বিশ্বব্যাপী নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, এটা না করলে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ মানুষ ধ্বংসের উপকরণ অনেক বেশি যোগাড় করে ফেলেছে। আসলে গোটা বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থাই যদি নৈতিকতা ও ধর্মের দ্বারা পরিচালিত না হয় তাহলে বিশ্বশান্তি অবাস্তব। দুই হৃদপিন্ডের অধিকারী একটি মানুষ যেমন সুস্থ থাকতে পারে না, তেমনি একাধিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও ধর্ম দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যে মানুষ তৈরি হবে তারা বিশ্বমানবতার ঐক্য গড়ে শান্তির বিশ্ব তৈরী করতে সক্ষম হবে না। এ প্রসঙ্গে Oxford Center for Islamic Studies-এ ১৯৯৩ সালে সেন্টারের Patron Prince Charles অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে বক্তব্যটি পেশ করেন তা নিয়ে বহু আলোচনা-পর্যালোচনা হয় পাশ্চাত্যে। তিনি তাঁর বক্তব্যে পাশ্চাত্যের বর্তমান অন্ধ ইহজাগতিকতা, স্বার্থসর্বস্ব বস্তুগত ভোগবিলাসের পেছনে বিরামহীন ছুটাছুটি এবং প্রকৃতিকে পদানত করে ফেরআউনি স্বেচ্ছাচারিতার লাগামহীন প্রতিযোগিতায় শ্রান্ত, ক্লান্ত ও খন্ডিত জীবনের অধিকারী হতাশ মানবগোষ্ঠীর করুণ কাহিনী তুলে ধরেছেন। একটু দীর্ঘ হলেও বক্তৃতাটির ঐ অংশটি পেশ করার লোভ সামলাতে পারছি না।

"More than this, Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which Christianity itself is the poorer for having lost. At the heart of Islam is its preservation of an integral view of the Universe. Islam-like Buddhism and Hinduism refuses to separate man and nature, religion and science, mind and matter, and has preserved a metaphysical and unified view of ourselves and the world around us. At the core of Christianity, there still lies an integral view of the sanctity of the world and clear sense of the trusteeship and responsibility given to us for our natural surroundings.

But the west gradually, lost this integrated vision of the world with Copernicus and Descartes and the coming of scientific revolution. A comprehensive philosophy of nature is no longer part of our everyday beliefs. I cannot help feeling that, if we could now only rediscover that earlier, all embracing approach to the world around us, to see and understand its deeper meaning, we could begin to get away from the increasing tendency in the west to live on the surface of our surroundings, where we study our world in order to manipulate and dominate it, turning harmony and beauty into disequilibrium and chaos."

যা হোক আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েই বেশি চিন্তিত। সেটার সংস্কার করাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তবু বিশ্বজাহানকে যেহেতু গ্লোবাল ভিলেজ বলে অভিহিত করা হচ্ছে, আমরা সেই গ্রামেরই বাসিন্দা। তাই বিশ্ব পরিস্থিতির কিঞ্চিৎ আলোচনা না করলে প্রবন্ধটির প্রতি অবিচার করা হবে বলেই এ অধ্যায়টি একটু দীর্ঘ করতে হল।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতি কি হওয়া উচিত, উপরের আলোচনায় আশা করি তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতির দাবিই বলুন, আর নৈতিক অধঃপতনের ভুক্তভোগী হওয়ার কারণেই বলুন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতি হওয়া উচিত ইসলাম। এ ব্যাপারে কোন লুকোচুরি বা চালাকির আশ্রয় নেয়ার পরিবর্তে কথাটা পরিস্কার করে বলাই ভাল। কারণ ঃ

এক. এ দেশের অধিবাসীদের কমপক্ষে শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান। গণতন্ত্র, সময়ের দাবি বা যে কোন বিচারেই ইসলামী শিক্ষার দাবি যুক্তিসঙ্গত। বৃটেন, জার্মানি, আমেরিকা এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের দিকে তাকালেই আমাদের দাবির যথার্থতার প্রমাণ মিলবে।

দুই. যেহেতু সেক্যুলারিজম, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ তথা বস্তুবাদী দর্শন আদর্শ ও নৈতিকতায় সমৃদ্ধ মানুষ তৈরিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তাই পরীক্ষামূলকভাবে

হলেও কমপক্ষে দুয়েক যুগ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করে তার ফলাফল দেখা উচিত।

তিন. আমাদের সংবিধান কয়েকবার পরিবর্তনের পর যেহেতু এখন সকল কর্মের উৎস হিসাবে আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা ও ঈমানকেই ভিত্তি ধরা হয়েছে, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দেয়া হয়েছে, সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার হিসাবে, তাই শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী না হওয়ার আর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

চার. ইসলাম যেহেতু জাগতিক উন্নতি, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং প্রগতি কোনটাকেই অস্বীকার করে না, তাই শুধু ইহুদি প্রভাবিত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু সভ্যতার দ্বারা অকারণে প্রভাবিত হয়ে মানবতার মুক্তিসনদ ইসলামকে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ বা আধুনিকতার বিরোধী বলে মানবতার দুশমন সাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠীর সাথে কোরাস গাওয়ার কোন অর্থ নেই। সাম্প্রদায়িকতা অন্য ধর্মে থাকলেও ইসলামে এর কোন স্থান নেই।

পাঁচ. বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার বাংলাদেশের জনগণের ম্যান্ডেট নিয়েছে দেশপ্রেম, মুসলিম জাতিসত্তানির্ভর জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলে। ভোট দিল বাংলাদেশের জনগণ, আর শিক্ষাব্যবস্থা নির্মিত হবে পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের শক্তিধর দেশের নির্দেশ অনুযায়ী তা হতে পারে না। দেশের সকল নীতি বিশেষ করে শিক্ষানীতি যা আগামী দিনে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রণীত হবে, অন্যদের কথায় নয়। একটি স্বাধীন দেশের জনগণ জাতীয় ব্যাপারে সকল নীতি নির্ধারণে সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকা দেখতে চায়। সরকারের গঠিত শিক্ষা কমিশন আশা করি সে দায়িত্ব পালন করবে।

ছয়. আমাদের জীবনাদর্শ ইসলাম যেহেতু শুধু ইহকালীন বস্তুবাদী উন্নয়নে বিশ্বাসী নয়, মৃত্যুর পর একটি অনন্ত জীবনের ওপর সত্যিকারের গুরুত্বারোপ করে। সে জীবনে ইহকালীন সমস্ত কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে। তার ভিত্তিতে জীবনের চূড়ান্ত ফায়সালার মাধ্যমে সত্যিকারের সফলতা নির্ভর করে। ইসলাম ছাড়া আর কোন আদর্শই দুনিয়া ও আখিরাতের এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না।

সাত. বাংলাদেশে মুসলিম ছাড়া অন্য যত ধর্মাবলম্বী বাস করে তাদের কারো ধর্মই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হওয়ার দাবি করে না। অর্থনীতি, সমাজনীতি, জীবনের সামগ্রিক আচরণের ব্যাপারে কোন পথনির্দেশ দেয়ার দাবি করে না। অন্য ধর্মাবলম্বীরা যদি সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি পড়তে পারে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার গবেষণা করতে পারে, এতে যদি তাদের ধর্ম বা জাতিসত্তার কোন

ক্ষতি না হয়, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের সব দিক অধ্যয়ন করলে তাদের জাতি বা ধর্মের সতীত্ব নষ্ট হবে কেন?

আট. আজ এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, (রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে) সার্বভৌমত্ব, স্বাধীন সীমানার একমাত্র গ্যারান্টি হল ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তা। ভূ-রাজনীতি, বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভারতের সম্প্রসারণবাদী নীতির বিপরীতে অটল বিশ্বাস এবং জাতি হিসাবে aggressive attitude নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মানসিকতা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। স্বতন্ত্র আদর্শ ও সংস্কৃতির লালন ছাড়া রাঘববোয়ালের মুখের মধ্যে জীবন বাঁচানো অসম্ভব।

তাই যে কোন বিচারে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতি হবে ইসলাম। তবে সকলেরই যার যার ধর্মীয় বিধিবিধান শিক্ষার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে ইসলাম শুধু উদারই নয় বরং সকল ধর্মের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। ধর্মের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি ইসলাম কোন ক্রমেই অনুমোদন করে না।

আমাদের শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বৃটিশরা এ দেশ দখল করে নেয়ার আগেও এ দেশে মুসলিমদের দীর্ঘ শাসনামলে একটি শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। একই শিক্ষা ব্যবস্থা এ দেশের মানুষের অফিস আদালত, সামাজিক সমস্যার সমাধান, প্রশাসন, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজন পূরণে সক্ষম ছিল।

প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তা সময়ের প্রয়োজন পূরণে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। পরে পাল এবং বৌদ্ধরা মোটামুটি সময়ের চাহিদা অনুযায়ী একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দাঁড় করায়। বৌদ্ধদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ হিসাবে পরিচিত ছিল। হিন্দুসভ্যতার পুনরুত্থানের পর বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে গণহত্যা পরিচালনার সাথে সাথে তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমস্ত নিদর্শন গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। বিজয়ী হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেন বংশের লোকেরা যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে তা সময়ের প্রয়োজন মোটেই পূরণ করতে পারেনি। বিশেষ করে জাতিভেদ প্রথা মানুষে মানুষে বিভেদ ও বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতি ভাষার খঁটিনাটি ব্যাকরণ, তন্ত্র-মন্ত্র এবং অশ্লীলতা ও যৌনচর্চার কারণে এই উপমহাদেশের মানুষকে অমানুষে পরিণত করার কাজটিই ছিল শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দিক।

মুসলমানদের আগমনের পর শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য হওয়ার কারণে প্রতিটি নাগরিককে শিক্ষিত ও জ্ঞানী করে তোলা মুসলিম শাসকদের নিকট ধর্মীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার ফলে ভারতবর্ষের সর্বত্র শিক্ষাব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং রাজভান্ডার থেকে শিক্ষার জন্য বিপুল অর্থ খরচ করা হয়। এতে জাতি-

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারত জ্ঞানে-গুণে, ধনে-ঐশ্বর্যে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের কাছে ঈর্ষার পাত্র হয়ে ওঠে।

ভারতের শাসনভার মুসলিমদের হাত থেকে ইংরেজরা হিন্দুদের সহযোগিতায় কেড়ে নেয়ার পর এখানে তাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নানা ধরনের ফন্দিফিকির করতে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় অনেকটা হিংসা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করে। সংখ্যালঘিষ্ঠ শিক্ষিত এবং সচ্ছল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে জ্ঞানে-গুণে ও ঐশ্বর্যে একেবারে নিঃস্ব করার জন্য তারা অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালায়। এরই এক পর্যায়ে তারা মুসলমানদের দ্বারা প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সুচতুর লর্ড ম্যাকলেকে দায়িত্ব দেয়া হয় শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য। শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ঐ কমিটি পরিষ্কার ঘোষণা দেয় যে, এ দেশে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হবে এমন এক গ্রুপ লোক তৈরী করা যারা ভাষা, চেহারা ও রক্তে-মাংসে ভারতীয় হলেও চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় তারা হবে বৃটিশদের অন্ধ অনুসারী। তাদের প্রধান কাজই হবে বৃটিশ প্রশাসনকে সহযোগিতা করে এ দেশে বিলেতিদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী করা।

হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা বৃটিশদের প্রিয়পাত্র হয়ে এ দেশের ভাগ্য নিয়ন্তা হওয়ার আশায় এবং অনেকটা মুসলিমবিদ্বেষী মানসিকতায় বৃটিশদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা অতি আনন্দের সাথে গ্রহণ করে। শিক্ষার মাধ্যম ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা এবং ইসলামী ধ্যান-ধারণা বাদ দেয়ার কারণে মুসলমানরা এ শিক্ষাকে বয়কট করে। ফলে মুসলমানরা অল্প দিনেই হয়ে পড়ে অশিক্ষিত আর হিন্দু সম্প্রদায় রাতারাতি শিক্ষিত হয়ে অফিস-আদালত ও সামাজিক কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে নেয়। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও বেসরকারি উদ্যোগে যে সব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তার মাধ্যমে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক যোগ্যতা অর্জনের কোন সুযোগ ছিল না। সীমিত অর্থে শুধু ধর্মীয় প্রয়োজনটুকুই পূরণ করে মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। পরে অবশ্য স্যার সৈয়দ আহমেদের আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মাঝে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি কিছুটা উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এর ফলে শিক্ষা-দীক্ষায় কিছুটা অগ্রগতি লাভ করলেও নিজেদের আদর্শের প্রতি মজবুতি অনেকটা কমে যায়। যার ফল এখন আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। দুইবার স্বাধীন হলেও চিন্তা-চেতনা এবং আদর্শিকভাবে আমরা এখনও পুরোপুরি স্বাধীন হতে পরিনি।

শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন

বৃটিশ প্রবর্তিত সেক্যুলার এবং গোলামীর মানসিকতা তৈরীর জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে মুসলমানরা গোড়া থেকেই আন্দোলন করে আসছে। কোন সময় আমূল পরিবর্তন কখনও বা বড় ধরনের সংস্কার করার আন্দোলন গোটা বৃটিশ আমলেই

অব্যাহত ছিল। পাশাপাশি নিজেদের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার জন্য বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার আন্দোলনের ফসলই হল উপমহাদেশের অগণিত মাদ্রাসা। অবশেষে গত্যন্তর না দেখে মুসলমানদের কঠোর মনোভাবকে কিছুটা নমনীয় করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার নিজেই আলীয়া টাইপের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। উদ্দেশ্য যে ভাল ছিল না, তার প্রমাণ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন বৃটিশ খ্রিষ্টান। তবে আদর্শের নিজস্ব একটা শক্তি, গতি ও চাহিদা আছে। তাই পরবর্তী পর্যায়ে আলিয়া এবং দরসে নেজামী যা কওমি মাদ্রাসা নামে পরিচিত উভয় প্রকার মাদ্রাসায় শিক্ষিত অনেক বড় বড় আলেম বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এমনকি ভারতকে খন্ডিত করে মুসলমানদেরকে ডবল গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্য কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে দ্বিজাতি তত্ত্বের পেছনে আদর্শিক প্রেরণার ভিত্তি দাঁড় করিয়েছেন উলামায়ে কেরাম। এ ক্ষেত্রে 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' (মাসালায়ে কওমীয়াত) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই বিখ্যাত বইটির লেখক মরহুম সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি ওঠে। সে অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু কেউই শিক্ষাব্যবস্থাকে এ দেশের মানুষের ঈমান-আকীদা ও ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করেননি। এমনকি যে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের ওয়াদা করে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দেশকে একটি সংবিধান উপহার দিতেও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। শিক্ষা সংস্কারের জন্য অনেক ঢাকঢোল পেটানোর পর বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন ষাটের দশকের গোড়ার দিকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বমূলক যে শিক্ষা রিপোর্ট পেশ করেন তা আরো জটিলতার জন্ম দেয়।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনের অবসান ঘটিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে যে সামরিক শাসন জারি হয়, সে সময় এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে আরেকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। উক্ত কমিশন প্রাথমিকভাবে যে খসড়া রিপোর্ট প্রদান করে, তা ছিল জাতির আদর্শিক চাহিদার অনেকটা কাছাকাছি। একে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রূপ দেয়ার জন্য জামায়াতে ইসলামীসহ সকল ইসলামী দলই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করে। এক্ষেত্রে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের পূর্ব পাকিস্তান শাখা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ছাত্রদের মধ্যে বলতে গেলে তারাই এককভাবে শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামী করণের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যান্য ছাত্রসংগঠনগুলো এমনকি মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন ও সেক্যুলার শিক্ষার পক্ষে নির্লজ্জভাবে ওকালতি করে। নিয়মতন্ত্রিক আন্দোলন সেক্যুলার ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর উগ্রতার কারণে শেষ পর্যন্ত

সাংঘর্ষিক আন্দোলনে রূপ নেয়। ইসলামের পক্ষে অবস্থান নেয়ার কারণে সেক্যুলার ছাত্রদলগুলোর গুন্ডাদের হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম মেধাবী ছাত্র আব্দুল মালেক শাহাদাত বরণ করেন। শহীদ আব্দুল মালেক ইসলামী ছাত্র সংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি ছিলেন। ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনে ইসলামী ছাত্রসংঘই প্রথম শাহাদাতের নজরানা পেশ করার গৌরব অর্জন করে।

তৎকালীন সামরিক সরকার এমনি একটি নৃশংস হত্যাকান্ড যা সংঘটিত হল পাকিস্তানের মূল ভিত্তি ইসলামের পক্ষে অবস্থান নেয়ার কারণে, তার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করতে সক্ষম হল না। ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তান দীর্ঘ পঁচিশ বছর (বেসামরিক ও সামরিক) বৃটিশদের মানস-সন্তান এমন এক সেক্যুলার শাসক দ্বারা শাসিত হল যারা শেষ দিন পর্যন্ত একটা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পারল না। এমনকি ইসলামের জন্য যারা শাহাদাত বরণ করতে প্রস্তুত তাদের পক্ষে দাঁড়ানোর সাহসও করতে পারেনি, বরং সুযোগ পেলেই ইসলাম বিরোধীদের সাথে হাত মিলিয়েছে। তাদের হাতে হাজার মাইল দূরে অবস্থিত দুটি ভূখন্ড নিয়ে একটি দেশ টিকতে পারে না। ইসলামপন্থীরা কিছুটা সরলতা, কিছুটা অদূরদর্শিতা, সর্বোপরি ইসলামের নামে অর্জিত একটি দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এবং পার্শ্বে অবস্থিত মুসলমান ও ইসলামের চির দুশমন ভারতের সম্প্রসারণবাদী নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের ভাঙ্গন ঠেকাতে সফল হয়নি। সেখানে শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষ খুন, ধর্ষণ, লুটপাট আর ষড়যন্ত্র সেখানে বেসরকারিভাবে কিছু লোকের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না।

শিক্ষা সংস্কারের নামে সরকারি প্রতারণা

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত শিক্ষা-সংস্কারের উদ্দেশ্যে যত কমিশন বা কমিটি গঠিত হয়েছে, তারা প্রায় সকলেই জাতির সাথে প্রতারণা করেছেন। কেউ করেছেন অবহেলা বা শক্তিশালী বিপরীত পক্ষের মারমুখী প্রচেষ্টায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে, আর কেউ বা করেছেন নিজেদের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে গঠিত প্রথম শিক্ষা কমিশন যা ডঃ কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন নামে পরিচিত, যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-চেতনার সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। যে প্রেক্ষাপটে এই কমিশন গঠিত হয়েছিল- তাতে এটাই ছিল স্বাভাবিক। ইসলামের নামে পাকিস্তানী শাসকের অনৈসলামী কর্মকান্ড, তার বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু রাষ্ট্র ভারত এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, তাদেরই চাপিয়ে দেয়া রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র, এমনকি ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করণের পরিবেশে গঠিত শিক্ষা কমিশন যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে- এর চেয়ে ভাল কিছু প্রকাশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রিপোর্টটি ভাল করে অধ্যয়ন করলে কমিটির ভারত সফর ও তৎকালীন সরকারের ভারত তোষণনীতির প্রমাণ মিলবে। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সকল সদস্য এবং নেতারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তারা

ইসলামের বিরুদ্ধে নয় বরং পাকিস্তানী শাসকদের যুলুম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু তৎকালীন সরকার, ভারতপন্থী বুদ্ধিজীবীগণ এবং গণমাধ্যমের প্রচারের ধরনটা এমন ছিল যে, ইসলামই সকল অনিষ্টের মূল। আর সেই ইসলামের বিরুদ্ধেই মুক্তিযোদ্ধারা একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

এরপরও আমি এ দেশের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের সাহসের প্রশংসা না করে পারি না। ঐ রকম একটা নাজুক সময়ে শিক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সংসদ সদস্য, ছাত্রনেতা, শ্রমিক নেতাসহ সকল শ্রেণীর মানুষের মতামত যাচাইয়ের জন্য একটি প্রশ্নমালা সরবরাহ করা হয়েছিল। প্রশ্নমালার ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নে যা ছিল এবং উত্তরদাতারা কি উত্তর দিয়েছিলেন তা হুবহু উল্লেখ করছি:

১৭। ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে নিচের কোন প্রস্তাবটা আপনার নিকট বেশী গ্রহণযোগ্য?

১. সাধারণ শিক্ষায়তনে ধর্মশিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়।
২. সাধারণ শিক্ষায়তনে সকল ধর্ম সমন্বয়ে নীতিমালা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।
৩. ধর্মশিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত।
৪. ভিন্নমত।

উপরোক্ত প্রশ্নের (১) নং এর পক্ষে মত দিয়েছেন মাত্র ১৪৭ জন, (২) নং এর পক্ষে মত দিয়েছেন ৩৯৯ জন, (৩) নং এর পক্ষে মত দিয়েছেন ১৯৫১ জন। ভিন্নমত দিয়েছেন ১১৫ জন।

১৮। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে আপনার মত কী?

১. ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরে থাকবে।
২. ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে থাকবে।
৩. ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা সর্বস্তরে থাকবে।
৪. ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা কোন স্তরেই থাকা উচিত নয়।
৫. ভিন্নমত।

এখানেও (১) নং এ পক্ষে মত দিয়েছেন মাত্র ২১৩ জন, (২) নং এ মত দিয়েছেন ১১৫৯ জন, (৩) নং এ মত দিয়েছেন ১১২৬ জন। (৪) নং এ মত দিয়েছেন ১১৬ জন। ভিন্নমত দিয়েছেন ১৯৬ জন।

১৭ নং প্রশ্নের মোট উত্তর দিয়েছেন ২৬১২ জন। তার মধ্যে ধর্মশিক্ষার পক্ষে মত দিয়েছেন ১৯৫১ জন। অর্থাৎ মোট উত্তরদাতার ৭৪.৬৯%।

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মোট ২৮১০ জন। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষে মত দিয়েছেন ২৪৯০ জন। অর্থাৎ মোট উত্তরদাতার ৮৮.৬১%।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই যাদের কাছে প্রশ্নমালা মতামত যাচাইয়ের জন্য

সরবরাহ করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শিক্ষা কমিশন তথা সরকারের বাছাইকৃত সেক্যুলার লোকজনই ছিলেন বেশি। তারপরও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে ফলাফল এসেছিল এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ধর্মশিক্ষার ব্যাপারে এদেশের মানুষের আগ্রহ কতটা গভীর। প্রশ্নমালা সরবরাহ করা হল জনমত যাচাইয়ের মাধ্যমে একটি গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য আর কমিশন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার যে প্রস্তাব করলেন, তা হল পুরাপুরি গণবিরোধী। ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাথমিক স্তরে মোটেই নেই। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে মাত্র কয়েকটি পিরিয়ড রেখে সব জায়গা থেকে ধর্মকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। এটাকে জাতির সাথে প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কী নামে অভিহিত করা যায়। আমার দেয়া এ তথ্য কোন কল্পকাহিনী নয়। কুদরতে খুদা কমিশন রিপোর্টের পরিশিষ্টে আজও সংরক্ষিত আছে। যে কেউ চাইলেই তা দেখে নিতে পারেন।

বিগত সরকারের আমলে আবার সেই প্রতারণার অপচেষ্টা

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রত্যাখ্যাত সেই কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টের আলোকে শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে আবার একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে এমন লোকও ছিল যারা শুধু নাস্তিকই নয়, আল্লাহ এবং রাসূলকে (সা) প্রকাশ্যে গালিগালাজ করার মত জঘন্য কাজও তারা করেছে। তারা শিক্ষা ব্যবস্থায় যতটুকু ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার পরিচয় ছিল তাও মুছে ফেলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। সর্বমহলে পরিচিত এবং বোধগম্য ইসলামী ও মুসলিম পরিভাষাগুলো পর্যন্ত বিদায় করার জন্য তারা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ হওয়ার পর তাদের কিছু চেতনা ফিরলে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট কিছুটা পরিবর্তন করে কমপক্ষে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে এতটুকুই যথেষ্ট নয়। কারণ আমাদের উচ্চ শিক্ষিত সমাজের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনশক্তি নৈতিকতার দিক দিয়ে যে চরম অধ:পতনের শিকার হয়েছে তাতে উচ্চতর শিক্ষার প্রতিটি বিভাগে ধর্ম তথা ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি।

আমার একথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একটা জরিপ পরিচালনা করা যেতে পারে। ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, দুর্নীতি, আন্ডারওয়ার্ল্ডের গডফাদারগিরি করে যারা দেশটাকে ভদ্র মানুষের বসবাসের অনুপযোগী করে তুলেছে, তাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত লোক কতজন, দরিদ্র অসহায়ের সংখ্যা কত, মাদ্রাসায় শিক্ষিতদের সংখ্যা কত, মসজিদের ইমাম অথবা মাদ্রাসা শিক্ষকের সংখ্যা কত, তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা কত। এ ব্যাপারে হাজার দশেক লোকের মধ্যে একটা সার্ভে স্টাডি করে কোন ধরণের মানুষের সংখ্যা শতকরা কতজন এটা সকলের সামনেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সম্প্রতি সামরিক বাহিনীসহ আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর যৌথ 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' এ দেশের অপরাধীদের একটি মোটামুটি চিত্র পাওয়া গেছে।

আর দেরি নয়

অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। দুঃখজনক অভিজ্ঞতাও আমরা অর্জন করেছি অনেক। জীবন নদীতে প্রচন্ড ঝড় উঠলে নদীর বিশাল ঢেউয়ের কারণে তলদেশের ময়লা-পচা-দুর্গন্ধময় ময়লাগুলো ভেসে ওঠার পরও যদি আমরা টের না পাই যে কী পরিমাণ নোংরা আবর্জনা নিয়ে নদীটি প্রবাহিত হচ্ছিল, আর আমরা সেই পানি ব্যবহার করে বারবার অসুস্থ হওয়ার পরও সুস্থ হওয়ার আশায় সরল বিশ্বাসে আবারো সেই পানি নিঃসন্দেহে পান করে চলেছি। এভাবে আর চলতে পারে না। অবিলম্বে আমাদের দেশের মানুষের ঈমান-আকীদা, বিশ্বাস, নৈতিকতার সার্বজনীন ধারণার ভিত্তিতে আধুনিক যুগের চাহিদা পূরণকারী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে জাতি পুনর্গঠনের কাজে হাত দেয়া উচিত। এ ব্যাপারে অবহেলা করলে দিনে দিনে জাতি নিজের অজান্তেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে। বর্তমান সরকার এ বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নিবেন ততই মঙ্গল।

শিক্ষাব্যবস্থায় মৌলিক প্রয়োজন

আদর্শিক দিক থেকে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রাথমিক থেকে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। রাশিয়া ও চীনে উচ্চ শিক্ষার যে কোন স্তরে বস্তুবাদী দর্শন, মার্কসবাদ ও লেলিনবাদের ওপর পড়াশুনা করতে হত এবং এর প্রতিটি বিষয়ের ওপরই বেশ ভাল পরিমাণ নম্বর ছিল। মানুষকে বস্তুবাদী ও নাস্তিক বানানোর জন্য যা যা করা দরকার তার সবটাই তাদের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। আমাদের রয়েছে স্বতন্ত্র এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে আমাদের মহান দ্বীন বা জীবনাদর্শ ইসলামে। আমরা যদি একজন পূর্ণাঙ্গ দেশপ্রেমিক আদর্শ মানুষ তৈরী করতে চাই তাহলে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় গভীর বিশ্বাসে বলীয়ান উন্নততর মানুষ তৈরির উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষার জন্য কমপক্ষে একশত নম্বরের একটি বিষয় সংযোজন করতে আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই। অন্তত দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয় ইসলামী করণসহ ইসলামের মূলনীতি ও মৌলিক ইবাদতসমূহ শেখার জন্য ইসলামিয়াত অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। ওআইসি গঠিত হওয়ার পর মুসলিম বিশ্বের প্রধানদের এক সম্মেলন হয় মক্কায়। সেই সম্মেলনের একটি ঘোষণাপত্র ছিল যাতে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য কামনার সাথে সাথে আমাদের স্বতন্ত্র ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সভ্যতার উল্লেখ ছিল। সেই ঘোষণার আলোকে মুসলিম বিশ্বের সেরা শিক্ষাবিদদের নিয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য সাধারণ (Common) শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা

হয়। এরপর প্রতিটি দেশের জন্য সাব কমিটি গঠিত হয় বিষয়ের কারিকুলাম গঠনের জন্য। বাংলাদেশে বিভিন্ন কমিটির সাথে অংক ও বিজ্ঞান বিষয়ক একটি সাবকমিটিও গঠিত হয়। অংকের জন্য যে সাব-কমিটি গঠিত হয় তার আহ্বায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংকশাস্ত্র বিভাগের চেয়ারম্যান আবদুর রহমান। অন্য দুজন সদস্যের একজন ছিলেন আজিমপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক এবং এই প্রবন্ধের লেখক নিজে। আমি তাদের সাথে যতদিন কাজ করেছি, তাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিক পেয়েছি। তবে আমাদের সকলের আশংকা ছিল আদৌ আমাদের সুপারিশ বাস্তবায়িত হবে কিনা। কারণ সেখানে আমরা শিক্ষাব্যবস্থায় অংক শাস্ত্রের মধ্যে নৈতিক মটিভেশনের বাস্তব পরামর্শ কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। আশঙ্কার কারণ ছিল মুসলিম বিশ্বের সেক্যুলার, অর্ধ সেক্যুলার ও সমাজতন্ত্রী শাসকদের কারণে। সেই আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপলাভ করেছে। মূল শিক্ষাকমিটি সকল দেশের সাব-কমিটির প্রস্তাবনা বিবেচনা করে মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি সাধারণ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলেন যা বাস্তবায়িত হওয়া তো দূরের কথা, কোন কোন দেশে আলোর মুখও দেখতে পারেনি। বাংলাদেশে যতদূর অগ্রসর হয়েছিল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের পর তাঁর আর কোন হদিস মেলেনি।

আমাদের বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নবগঠিত শিক্ষা কমিশন যদি ওআইসি কর্তৃক গঠিত কমিটি ও সাব কমিটির পরামর্শগুলো দেখেন তাহলে শিক্ষানীতি প্রণয়নে কিছুটা হলেও সহযোগিতা পেতে পারেন।

শিক্ষার মান, ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

আমাদের শিক্ষার বর্তমানে কোন মানই নেই। স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। শিক্ষাঙ্গনে অযাচিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, দলীয়করণ, সহিংস ছাত্র-রাজনীতি, ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশের কারণে শিক্ষকদের মধ্যে উচ্চতর পদ ও সুবিধা পাওয়ার জন্য দলীয় রাজনীতি এবং হানাহানির বিস্তার যেভাবে ঘটেছে, জাতি কতদিন তার কাফফারা দিবে তা আল্লাহ পাকই জানেন।

অবিলম্বে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ এবং ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বাতিল করা উচিত। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি, দলীয় এবং আত্মীয়করণের কারণ যেসব গন্ডমূর্খ, দুর্নীতিপরায়ণ ও চরিত্রহীন শিক্ষকদের নিয়োগদান করা হয়েছে তার তদন্ত হওয়া দরকার। প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ দিয়ে হলেও এসব অপরাধীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় করা উচিত। শিক্ষক ও প্রশিক্ষক নামের কলঙ্কের কোন একটি শিকড়ও যদি থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানে আবার বিষবৃক্ষের চারা গজিয়ে উঠবে। পরিবেশ হবে সংক্রামিত। কারণ রোগ সংক্রামক, কিন্তু স্বাস্থ্য সংক্রামক নয়।

এখন থেকে সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর বেতন ভাতা দিয়ে সবচাইতে ভাল এবং চরিত্রবান ছাত্রদের নিয়োগ দান করা উচিত। জাতি গঠনের এই মহান কাজে কত টাকা খরচ হবে এ নিয়ে হৈচৈ বা কৃপণতা মোটেই করা উচিত নয়। কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগের চাইতে উত্তম বিনিয়োগ আর নেই। পৃথিবীর বহু অনুন্নত জাতি শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে লাভবানই হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

শিক্ষকদেরকে বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন সভ্যতার অভিভাবক। গন্ডমূর্খ, চরিত্র ও আদর্শহীন ব্যক্তি সভ্যতার অভিভাবক হতে পারে না। এ প্রসংগে আধা নাস্তিক দার্শনিক রাসেলের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। উক্তিটি হল "Knowledge is power. It is a power as good as for evil. Unless and untill wisdom will be increased with the increase of knowledge, the incrase of knowledge will the increase of sorrow."

দুই দুইবার বিশেষ করে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে অব্যাহতভাবে আমরা জাতির যে সর্বনাশ করেছি এর জন্য ভবিষ্যত বংশধরদের কাছ থেকে কতদিন অভিশাপ কুড়াতে হবে আল্লাহই জানেন। এর অবসান অবিলম্বে হওয়া উচিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যাহত উন্নতি বজায় রাখতে হলে একাডেমিক ক্যারিয়ার ভাল এবং চরিত্রবান শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি তাদের উত্তম প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রশিক্ষণবিহীন অবস্থায় তাদেরকে শিক্ষাদানের কাজে নিয়োগ করা উচিত নয়। কেননা একবার এ ধরনের অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গেলে প্রশিক্ষণেও তার পরিবর্তন হতে চায় না। এরপর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে দ্রুত বিস্তার এবং উন্নতি তাতে কমপক্ষে প্রতি তিনবছর অন্তর অন্তর শিক্ষকদের চাকরিকালীন (Inservice) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকাও বাঞ্ছনীয়। এর সাথে দুনিয়ায় মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন এবং পশ্চিমা সভ্যতা কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া সভ্যতার দ্বন্দ্বের (Clash of Civilization) ব্যাপারেও নজর রাখা আমাদের অস্তিত্বের জন্যেই জরুরি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষকরাই সভ্যতা, আদর্শ এবং জাতিসত্তার পরিচয় টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে পারেন।

শিক্ষার ইসলামীকরণ

অনেকেরই ধারণা যে সাধারণ শিক্ষার বিষয় যেমনি আছে তেমনি রেখে শিশু শ্রেণী থেকে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত 'ইসলামিয়াত' নামে একটি বিষয় অবশ্য পাঠ্য করে দিলেই শিক্ষা ইসলামী হয়ে গেল। এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। বরং এমনি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা দারুণভাবে সন্দেহ প্রবণতায় ভুগতে থাকবে। কারণ ইসলামিয়াতের ক্লাসে ধর্মীয় শিক্ষকের কাছে শুনবে এ মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যার নাম আল্লাহ। তিনি আমাদের সৃষ্টি, লালন-পালন, রিজিক প্রদান, জীবন-মৃত্যু, ভাগ্যের ভাল-মন্দ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এমনকি জীবন যাপনের জন্য

খুঁটিনাটি বিষয়সহ ছোট-বড় সকল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য কিতাব পাঠিয়েছেন, আর নবী-রাসুলগণ সেই কিতাব অনুযায়ী কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে তার বাস্তব নমুনা মানবজাতির সামনে পেশ করেছেন।

অন্যদিকে বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের ক্লাসে শিক্ষকের কাছে শুনবে যে বিশ্বের কোন স্রষ্টা নেই। ক্রমবিবর্তন, বিগ ব্যাং, হঠাৎ বিস্ফোরণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বজাহানের সৃষ্টি। এমনিতেই এক সময় কয়েকটি বিশেষ পদার্থের একত্রীকরণের মাধ্যমে পৃথিবীসহ সম্ভবত আরো কয়েকটি গ্রহে জীবনের স্পন্দন শুরু হয়ে গেছে। গুহায়, বনে-জঙ্গলে বাস করতে করতে বিভিন্ন সময় প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ আগুন জ্বালানো ও অস্ত্রপাতিসহ সবকিছু তৈরী করতে শিখেছে। বিশ্বের জন্য কোন আইন দাতা বা বিধানদাতা নেই। নবী-রাসূল নামে যে সব ব্যক্তির ওপর বিভিন্ন বিশেষণ আরোপ করা হয় তারা আমাদের মতই মানুষ। তবে তারা ঐ সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বা চালাক-চতুর লোক ছিলেন, ইত্যাদি।

এসব ভুল ধারণার অবসান ঘটাতে হবে সাহিত্যে, সমাজবিজ্ঞানে, পদার্থবিজ্ঞানে ও রসায়নসহ জ্ঞানের সকল শাখায়। অর্থাৎ শিক্ষার জন্য নির্ধারিত সকল বিষয়ে বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে একই ধরনের ধারণা দিতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞান আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ডারউইনের বস্তাপচা ভুল আন্দাজ-অনুমান আজ আর বিজ্ঞানের আবিষ্কার বা গবেষণার কোন ভিত্তি নয়। আজকের বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিত্তি কোন 'সংশয়' নয় বরং প্রত্যয়। যতদিন বিশ্বের মানুষ মাত্র দুয়েক ডজন পদার্থের আবিষ্কার সম্পর্কে জানতো, ততদিন মনে করতো অংকের সূত্র অনুযায়ী Permutation বা Combination এর মাধ্যমে আপনা আপনিই জীবনের স্পন্দন ও কর্মকা- শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু শতাধিক পদার্থের আবিষ্কারের পর দেখা গেল এমনিভাবে জীবনের স্পন্দন শুরু হতে গেলে হাজার হাজার কোটি বছরে দুয়েকবার মাত্র এমনটির সম্ভাবনা আছে। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক ধারণা মতে পৃথিবীর বয়স পাঁচশ' কোটি বছর। চিন্তা গবেষণার ফলে দেখা যাচ্ছে অনেক পূর্ব ধারণা বা Hypothesis ই ঠিক নয়।

ডারউইনের বির্বতনের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে বলে যে ধারণা ছিল তাও এখন আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করে না। বর্তমান বিজ্ঞান বিভিন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একথার প্রমাণ পেয়েছে যে, কোন প্রাণী বা গাছপালা যাই হোক না কেন, তার Genetical Component -এর কোন পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ একটি গোলাপের গাছে বিভিন্ন পরিবেশ ও যত্নের তারতম্যের কারণে আকার, আকৃতি, ঘ্রাণ ও রঙের কিছুটা হেরফের হলেও গোলাপ ফুলই ফুটবে। গোলাপের গাছে কাঁঠালচাঁপা, গন্ধরাজের গাছে জুঁই বা রজনীগন্ধা অথবা আমগাছে কমলালেবু ধরবে না। তেমনি অন্য কোন জীন থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের আগমন ঘটেনি। মানুষ মানুষ হিসাবেই সৃষ্টি হয়েছে। যদি কৃত্রিমভাবে Cosmic Ray-র মাধ্যমে বস্তু বা প্রাণীর কোন Genetical

Component-এর পরিবর্তন ঘটানো হয়, তাহলে বস্তু Energy বা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর গোটা বস্তুজগৎ যদি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাহলে কিয়ামত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

তেমনি আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারটি নিয়েই চিন্তা করা যাক। উপরের আলোচনার এক পর্যায়ে আমরা বলেছি যে, কয়েকটি বস্তুর সমন্বয়ে এমনিতেই জীবনের স্পন্দন শুরু হয়ে কর্মমুখর পৃথিবী তৈরি হতে পারে না। তাহলে সৃষ্টি জগতের পেছনে কোন বিবেচনাশীল ও নিখুঁত পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব আছে যিনি পরিকল্পিতভাবেই এসব করে চলেছেন। সেই বুদ্ধিদীপ্ত সত্তা মানুষের মত সর্বশ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করার পর জীবন যাপনের কোন বিধান বা নিয়মকানুন না দিয়ে খেয়াল খুশির ওপর ছেড়ে দিবেন। এমনটি কখনো হতে পারে কি?

পদার্থবিজ্ঞানের Quantum Mechanics-এ Uncertainity Principle বা Theory of Relativity-র ব্যাপারটিই ধরা যাক। Uncertainity Principle এ Electron, Proton, Neutron, Deutron ও Messon-এর যে Behaviour তা সাধারণ বিজ্ঞানের তত্ত্বের সাথে অনেকাংশে মিলে না বা সবসময় একই ধরনের Behave করে না। অলৌকিক বা Miraculous ধরনের এমন কিছু ব্যবহার বা আচরণ আছে যা ব্যাখ্যা করতে গেলে সেই পরিকল্পনাকারী মহান সত্তার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। আবার কোন কিছুর গতি যদি আলোর গতির চাইতেও বেশি হয় তাহলে তার কাছে Time factor-minus হয়ে যায়। এমনকি পূর্বে সংঘটিত কোন বিষয়কে ঘটমান অবস্থায় দেখা যেতে পারে। এর মাধ্যমে বিশ্বনবীর (সা) 'মিরাজ' এর বৈজ্ঞানিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে পাশাপাশি ঐ সব বিষয়ে ইসলামের কি ধারণা বা Concept তার তুলনামূলক পড়াশুনার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কোনটি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, বাস্তব এবং কল্যাণময় পাঠক তা নিজেই নির্ধারণ করে নেবে।

এভাবে শিক্ষার সকল স্তর ও বিষয়েই ইসলামীকরণ করা সম্ভব। প্রবন্ধটি দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিয়েই এ বিষয়ের সমাপ্তি টানছি। বই আকারে প্রকাশ করার সুযোগ পেলে বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল।

জোড়াতালি নয়, আমূল পরিবর্তন দরকার

কোন জাতির শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হয় তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে। বৃটিশ শাসিত গোলামী যুগে তাদের ঔপনৈবিশিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল, দুই-দুইবার স্বাধীন হওয়ার পরও সেই শিক্ষার সাথে কিছু জোড়াতালি দিয়ে আজো আমরা এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছি। এর চেয়ে হাস্যাস্পদ আর কিছু হতে পারে না। কবি নজরুল ইসলাম দু:খ করে বলেছিলেন, "বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে, আমরা চলেছি পিছে,

বিবি-তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি কুরআন-হাদিস চষে।" আমাদের দশাও তাই। ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সব ব্যাপারেই যখন দুনিয়া প্রতিনিয়তই অগ্রসর হচ্ছে, কখনও বা বিপ্লব সাধিত হচ্ছে, এমনকি খোদ বৃটিশদের শিক্ষাব্যবস্থার যখন আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, সেখানে পৌনে দুইশত বছর আগের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা বর্তমান যুগের সমস্যার সমাধান খুঁজছি। সেকেলে ধরনের কারিকুলাম, পাঠ্যপুস্তক রচনা, শিক্ষাদানপদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা যুগোপযোগী মানুষ তৈরির বিফল চেষ্টায় রত, এর চেয়ে বেকামি আর হতে পারে না।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভাষা

একথা সর্বজনবিদিত যে, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার বিকল্প নেই। তাই জ্ঞানের সকল শাখায় আমাদের বাংলা ভাষায় পুস্তক রচনা অত্যাবশ্যক। যেসব শাখায় আমরা অনেক পিছনে, সৃষ্টিধর্মী পুস্তক রচনার যোগ্যতা নেই, সে সব শাখায় অনুবাদ করে আপাতত কাজ চালানো যেতে পারে। তবে চেষ্টা করা উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৌলিক বই-পত্র রচনা করা। মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসেবে আমরা একটি আন্তর্জাতিক ও আদর্শিক জাতির অংশ। আমাদের জীবন বিধানের মূল কিতাব আল কুরআন ও তার ব্যাখ্যা আল হাদিসের মূল ভাষা আরবি। তাই প্রতিটি মুসলিম শিক্ষার্থীকে এতটুকু আরবি ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে কুরআন এবং বাছাই করা হাদিসের অর্থ বুঝতে পারে।

আমাদের সমাজের কিছু লোক ইংরেজি ভাষাকে একেবারে বর্জনের পক্ষপাতী। এ ধারণা মারাত্মক। কারণ বিশ্বের অত্যাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের স্বার্থে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করা অপরিহার্য। দুনিয়ার সবকিছু থেকে চক্ষু বন্ধ করে আমরা চলতে পারব না। তাতে পেছনে পড়ে আবারও আফসোস করতে হবে।

অনেকে মনে করতে পারেন, তিনটি ভাষা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বোঝা হয়ে যাবে। প্রকৃত জ্ঞানার্জনের চাইতে ভাষা শিক্ষার সময় ব্যয় হবে অনেক বেশি। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ পেয়েছেন যে একজন সাধারণ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীও ছোটবেলা থেকে চেষ্টা করলে এবং ভাল অভিভাবকত্ব পেলে এক সাথে চারটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যারা একটু বেশি মেধাবী তারা পারে ছয়টি ভাষায়।

সহশিক্ষা

নৈতিক অবক্ষয় ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তাছাড়া আমাদের জীবনাদর্শ কর্তৃক অনুমোদনের ব্যাপারটি কোনক্রমেই অগ্রাহ্য করা যাবে না। বিশ্বের তথ্যপ্রবাহ, ডিস এন্টেনা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমদানি-রফতানি চলছে। আমাদের জাতিসত্তা ও জীবনাদর্শ ইসলামের ওপর টিকে

থাকতে হলে, আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা যা সভ্যতার ভিত্তি তা টিকিয়ে রাখতে হলে কিছুতেই সহশিক্ষা অনুমোদন করা যায় না। প্রাথমিক অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বড়জোর অনুমোদন করা যায়।

বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার হার একেবারে কম নয়। তাই ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে শিক্ষার উপরের স্তর ও বিভাগ (চিকিৎসা, প্রকৌশল, বৃত্তিমূলক ইত্যাদি) মহিলাদের জন্য পৃথক করে দিলে শিক্ষক বা প্রশাসকের অভাব হবে না। বিষয়টি মোটেই হালকাভাবে দেখা ঠিক নয়। মহিলারা মহিলাদের পরিবেশে জ্ঞানার্জন, গবেষণাসহ নানা কর্মকান্ডে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নের জন্য গঠিত কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছে তা মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে আরো কিছু সংস্কারের প্রয়োজন আছে। মাদ্রাসাগুলোর ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর এফিলিয়েশন ও নির্দেশনার জন্য একটি জাতীয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ই সময়ের দাবি পূরণের জন্য কারিকুলাম, সিলেবাস, শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সংযোগের ব্যাপারটি নির্ধারণ করবে।

মহিলাদের মধ্যেও ইসলামী শিক্ষার প্রতি যেভাবে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে তাতে মহিলাদের জন্য প্রতিটি জেলায় একটি কামিল মাদ্রাসা এবং উপজেলা পর্যায়ে একটি ফাজিল মাদ্রাসা স্থাপন করা প্রয়োজন। পর্যায়ক্রমে একাজে হাত না দিলে একসময় প্রয়োজন ও দাবির চাপে তাড়াহুড়া করতে হবে। তাড়াহুড়ায় কাজের মান কখনও ভাল হয় না।

শিক্ষার স্তরবিন্যাস

আমাদের শিক্ষার স্তর বর্তমানে যেভাবে বিন্যাস করা আছে তাতে অসুবিধা নেই। এভাবেই থাকতে পারে। তবে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ প্রতিটি নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক করা উচিত। কারণ বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নিজের জীবনের প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়। পর্যায়ক্রমে আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে নারী-পুরুষ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করা। আর এর জন্য খরচ পত্র সরকারের পক্ষ থেকে নারী-পুরুষ সকলের জন্যই বহন করা উচিত।

বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষা

ছোট একটি দেশে যে জনসংখ্যা তাকে কর্মীর হাতে পরিণত করতে না পারলে এই জনশক্তি আমাদের জন্য বড় ধরনের বোঝা হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। অনেক সামাজিক অপরাধ, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভবত এটাও একটা কারণ। শিক্ষাকে কি করে উৎপাদনমুখী করা যায় এবং শিক্ষিত লোককে কি

করে শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচুর অফিস আদালত স্থাপন আর অলস বাবু ক্লাস তৈরি করে তাদেরকে লালন-পালন করার দায়িত্ব একটা জাতি কিছুতেই বহন করতে পারে না। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষার প্রতি নজর দিতে হবে বেশি। সাধারণ মেধার চেয়েও I.Q. যাদের নিচে তাদের কোনক্রমেই উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বায়না ধরা উচিত নয়। এতে তার জীবনও দুঃখময় এবং জাতীয় সম্পদ অপচয় হতে বাধ্য। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য যাতে দেশে ব্যবহার করা যায় এবং প্রয়োজনে বিদেশে রফতানি করা যায় এমন ধরনের শিক্ষার প্রতি বেশি নজর দিতে হবে। আর আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করে জনশক্তি রফতানির প্রতি গুরুত্ব তো দিতেই হবে।

স্বাস্থ্যসেবার দিকটিতে আমরা অনেক অনুন্নত দেশেরও পেছনে রয়েছি। জনসংখ্যার অনুপাতে ডাক্তারদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ রোগীরা যুলুমের শিকার হচ্ছে। পয়সা কড়ি নেয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ডাক্তারের মধ্যে সেবার মনোভাবের চাইতে বাণিজ্যিক বা কমার্শিয়াল মনোভাবই বেশি কাজ করে। বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে না।

উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা

সকলের জন্যই উচ্চতর শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা উচিত- শ্লোগানটি শুনতে ভালই শুনায়। কিন্তু এর বাস্তব ফল মোটেই সুখকর নয়। বার বার পরীক্ষা দেয়া, অথবা কয়েকবার ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা দিয়ে কোনক্রমে মাস্টার ডিগ্রিতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী লাভ করলে তার মর্যাদা এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীর চেয়ে কমে যায়। অন্যদিকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করা ব্যক্তি লেখাপড়া না জানলেও তার মধ্যে অনাকাঙ্খিত এবং নিরর্থক এক ধরনের ডিগ্রির অহমিকা জন্মায়। ফলে ছোট খাট কোন চাকরি বা কাজ তার পছন্দ হয় না। আবার ইন্টারভিউ দিয়ে ভাল চাকরি পাওয়ার যোগ্যতাও নেই। প্রযুক্তি বা টেকনিক্যাল কোন জ্ঞানও তার নেই যে কোন একটা কিছু করে খেতে পারে।

উচ্চশিক্ষা হওয়া উচিত অত্যন্ত কঠোরভাবে নির্বাচনমূলক বা Highly Selective. স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, গবেষণা বা প্রশিক্ষণমূলক কিছু প্রতিষ্ঠান ছাড়া অহেতুক এমএ পাস বা বহুবার প্রতিযোগিতায় প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর একটা ডক্টরেট ডিগ্রী মনের সান্তনা দিতে পারে, উচ্চশিক্ষিত হয়েছি বলে মনের মধ্যে শিক্ষার কিছুটা গরমী উপলব্ধিতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে জীবনের দু:খ বাড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ হয় না।

অনার্স আর পাস কোর্স নামে দু'ধরনের ব্যবস্থার কারণে বুনিয়াদি আর তফসিলি সম্প্রদায়ের মত বিভাজন জাতির জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষার মান বাড়িয়ে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু করা উচিত। এতে যারা চূড়ান্ত পরীক্ষায় শতকরা ষাট বা তার বেশি নম্বর পাবে তাদেরকে অনার্স দেয়া এবং অন্যদেরকে স্বাভাবিক গ্রাজুয়েট হিসাবে ধরা যেতে পারে। উন্নত মানের শিক্ষা পেলে প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় কাজ গ্র্যাজুয়েট লোক দ্বারাই চলতে পারে। পাকিস্তান আমলে যারা গ্র্যাজুয়েশনের পর এমনকি অনার্স তৃতীয় বর্ষে পাঠরত অবস্থায় সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসে যোগদান করেছিলেন তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন অযোগ্যতার পরিচয় দেননি। প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত অনেক দেশেই প্রশাসন ও বড় শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গ্রাজুয়েশনের চাইতে উচ্চশিক্ষিত লোক নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তেমন উৎসাহ দেখায় না। কারণ তাদের ধারণামতে Over Qualified লোক অনেক সময় ভাল সার্ভিস দিতে পারে না। এরা নাকি মনস্তাত্ত্বিকভাবে অধিকাংশ সময়ই কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারে অতৃপ্তিতে (Dissatisfaction)-এ ভুগে।

প্রতিরক্ষা ও সামরিক শিক্ষা

আমাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থান আর সবচেয়ে বড় প্রতিবেশীর যে মানসিকতা তাতে আমাদের প্রতিরক্ষা এবং স্বাধীনতা রক্ষা তথা অস্তিত্ব রক্ষা করার ব্যাপারটি মোটেই উপেক্ষা করা যায় না। সিকিমের অস্তিত্ব আজ বিলীন। নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকার স্বাধীনতার অস্তিত্বকেও অব্যাহতভাবে হুমকির সম্মুখীন করে রাখা হয়েছে। উপরন্তু আমাদের দেশের ভেতরে এমন একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জ্ঞানপাপী আছে যারা অখন্ড ভারতে বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস বাস্তবায়িত করার কাজে তারা সদা তৎপর। আর এটার বাস্তবায়ন হলে আমাদের স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর যেভাবে অব্যাহত হুমকি চলছে তাতে আমরা বিনা প্রস্তুতিতে বসে থাকতে পারি না। এজন্য নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সামরিক প্রশিক্ষণ সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করা উচিত, যাতে দেশের ওপর যে কোন হুমকি আসলে তার মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। তাছাড়া যুদ্ধকালীন সময় সক্ষম জনশক্তির সকলেই সিভিল ডিফেন্সের দায়িত্ব পালন করতে পারে তারও ব্যবস্থা থাকা উচিত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়।

ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়তে দরকার সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা

একই দেশে একাধিক শিক্ষাব্যবস্থা কোনক্রমেই কল্যাণকর নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ঘটিয়ে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে আসা উচিত যাতে আমাদের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তেমন কোন পার্থক্য না থাকে। আবার স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে আসা উচিত যাতে মাদ্রাসা শিক্ষার ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও পরিবেশের সাথে তেমন কোন পার্থক্য না থাকে। এমনিভাবে একটা পর্যায়ে এসে আমাদেরকে একটি

মাত্র সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা কমপক্ষে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত থাকে যাতে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির মৌলিক আদর্শ ও মূল্যবোধ, জাতি হিসাবে তাদের পরিচয়, আধুনিক জীবন যাপনের জন্য সমকালীন প্রযুক্তির একটা প্রয়োজনীয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করতে পারে। এরপর বিশেষভাবে অধ্যয়নের জন্য যার যে বিষয় পছন্দ সে ব্যাপারে উচ্চতর শিক্ষালাভ করার সুযোগ গ্রহণ করবে।

আরেকটি দিকে খেয়াল করার জন্য শিক্ষা কমিশন তথা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কিছু অসাধু লোকেরা কিন্ডারগার্টেন, ক্যাডেট স্কুল ও কলেজ এবং বিভিন্ন নামে জনগণকে প্রতারণা করে অর্থ লুটপাট করে নিচ্ছে। অন্যদিকে এক এক স্কুলে একেক ধরনের বই পড়ানো হচ্ছে। আরো দু:খজনক এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বিপদজ্জনক এই বইগুলোর মান এবং বিষয়বস্তু পর্যালোচনার কোন ব্যবস্থাও নেই। এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে যে, স্ট্যান্ডার্ড এর নামে আমাদের জাতিসত্তা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের চিন্তা-ধারার বিপরীত বইপুস্তকও শিক্ষার্থীদের পড়ানো হচ্ছে। এসব বন্ধ হওয়া উচিত। শিক্ষার মান বাড়াতে এবং পরিবেশ ভাল করতে পারলে এগুলোর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে। আর শিক্ষার ব্যাপারে তো আগেই বলেছি।

শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ

শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের শতকরা কত ভাগ ব্যয় করতে হবে সেদিকে না গিয়ে আমাদের দেখা দরকার জাতির প্রয়োজনে একটি মডেল শিক্ষাব্যবস্থার জন্য কত টাকা দরকার। যা লাগে তাই খরচ করতে হবে। প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের বাজেট কর্তন করে শিক্ষাখাতে বাড়ানো উচিত। কেননা দেশ ও জাতি গঠনের কাজটিকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা উচিত নয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানকে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় আয়ের শতকরা তেত্রিশভাগ তারা ব্যয় করতো শিক্ষাখাতে। আফ্রিকায় কালো ও একেবারে অশিক্ষিত অনেক দেশেও জাতীয় আয়ের শতকরা বিশভাগের বেশি খরচ করা হচ্ছে শিক্ষাখাতে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে প্রয়োজনে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করা ঠিক নয়।

উপসংহার

এতক্ষণ যে বিষয়ে লিখলাম বা আলোচনা করলাম, কাজটি নিঃসন্দেহে কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে একটি বিপ্লবী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পাছে লোকে কিছু বলে, অথবা অজ্ঞ, গন্ডমূর্খ কিছু রাজনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবী, অথবা উঠতি বয়সের অভিজ্ঞতাহীন শিক্ষার্থীরা কী বলবে তার পরোয়া করা উচিত নয়। কারণ শিশু, কিশোর এমনকি যুবকদেরকে জাতির ভবিষ্যতের জন্য মনমানসিকতা, দেশপ্রেম, নিজস্ব জাতিসত্তা, আধুনিক প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে কিভাবে গঠন করতে হবে এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের চাইতে অভিভাবকদের দায়িত্ব অনেক বেশি। রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগের জন্য দেশ শাসন করা আর জাতিগঠনের জন্য দেশ পরিচালনা করা এক কথা নয়।

আমাদের শিক্ষানীতি প্রণয়নে জাতীয় মূল্যবোধ ও আদর্শিক ভিত্তি

১৯৯৭ সালের ২১ মার্চ ঢাকার নায়েম মিলনায়তনে সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ আয়োজিত "জাতীয় মূল্যবোধ ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন" শীর্ষক সেমিনারে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধ

মানব সভ্যতার বয়স যতদিন শিক্ষার বয়সও ততদিন। কারণ প্রথম মানুষ সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ যেদিন তাকে সবকিছুর নাম শিখালেন সেদিনই মানবসভ্যতায় জ্ঞানের সূত্রপাত। সবকিছুর নাম শেখানোর মাধ্যমে আল্লাহ বাস্তবিক পক্ষে হযরত আদমকে (আ) বস্তুজগত সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছিলেন। কোনটার কি ব্যবহার তার প্রাথমিক জ্ঞান শুরু হয় ঐ বস্তু বা প্রাণীকে চেনাজানার মধ্য দিয়ে।

মাটি দিয়ে হযরত আদমকে (আ) সৃষ্টি করার পর তার মধ্যে রুহ্ ফুঁকে দেয়া এবং পরবর্তীতে একটি ভুলের মাধ্যমে বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন মহান আল্লাহ। এরপর জীবন যাপনের সামগ্রিক হেদায়াতের জন্য দিলেন 'হুদা' বা জীবনবিধান। আর এই জীবন যাপনের পদ্ধতির সর্বশেষ সংস্করণ হলো 'আল কুরআন' যা শেষ নবী মুহাম্মদের (সা) ওপর নাজিল হয়েছে।

শিক্ষা কী?

এ প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেয়া কঠিন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে দীর্ঘ এবং তাত্ত্বিকতার আলোচনায় না গিয়ে বড় বড় শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন তাদের আইডিয়া অনুসারে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা নেয়ার চেষ্টা করবো। মহাকবি মিল্টনের মতে - Education is the harmonious development of body, mind and soul." অর্থাৎ শিক্ষা হলো দেহ, মন এবং আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধন। জন ডিউই, জে.এস. ব্রুনারসহ আধুনিক বহু শিক্ষাবিদই শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন একটি অব্যাহত পদ্ধতি হিসেবে দেখেছেন যার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জেনারেশন তৈরির কাজ করা হয়। জাতীয় আদর্শ এবং ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের কাছে ট্রান্সফার করাসহ সময়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা অর্জন করানো শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম দায়িত্ব হওয়া উচিত। প্ল্যাটোর মতে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হওয়া উচিত সেই দেশের সংবিধানের আদর্শ অনুযায়ী।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শেষের কবিতায় শিক্ষাকে তুলনা করেছেন পরশ পাথরের সাথে। তার চিন্তা অনুযায়ী শিক্ষা হলো পরশ পাথর, তার থেকে ছিটকে পড়া আলোটাই হচ্ছে কালচার। মহাকবি আল্লামা ইকবালের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো খুদি বা আত্মার উন্নতি সাধন। খুদি উন্নত হলে সে-ই মানুষের সমস্ত কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ এবং সুষমামন্ডিত করতে সক্ষম। Stanly Hull-এর মতে "If you teach your children the three R's (i.e. Reading, Writing and Arithmetic) and leave the fourth R (i.e. Religion), you will get a fifth R (i.e. Rascality).

পবিত্র কুরআন শরীফে সূরা বাকারার ১৫১ নং আয়াত, সূরা আল ইমরানের ১৬৪ নং আয়াত এবং সূরা জুমুয়ার ৬ নং আয়াতে আল্লাহ নবীদের কাজ সম্পর্কে যে কথা কয়েকটি বলেছেন তার সমন্বিত রূপ হলো, "তাদের ভেতর থেকে আমি একজন রাসূল (সা) পাঠিয়েছি, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনান, আর শিক্ষা দেন কিতাবের জ্ঞান, হিকমত এবং তাদের অন্তরকে করেন পবিত্র।"

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে পবিত্র কালামের দেয়া সংজ্ঞাটাই শিক্ষার বিস্তারিত এবং সঠিক সংজ্ঞা। আর মহাকবি মিলটনের সংজ্ঞাটি কুরআনে দেয়া সংজ্ঞার অনেকটা কাছাকাছি।

শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতি

শিক্ষার সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, একটি মূল্যবোধ ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। মন এবং আত্মার উন্নতির জন্য উন্নতমানের নৈতিক মূল্যবোধ অপরিহার্য। পাশ্চাত্যের দীর্ঘ সাধনার পরও সামাজিক ও বস্তুগত কিছু নিয়ম কানুনের মাধ্যমে মূল্যবোধ লালন এবং শিক্ষার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা হস্তান্তর করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত অনেক উন্নতি হওয়ার পরও

প্রকৃত অর্থে শিক্ষাব্যবস্থা কোন আদর্শ মানুষ তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। বরং দিন দিন অবস্থার অবনতিই ঘটছে। পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদ, সমাজবিদ, রাজনীতিবিদ, ধর্মগুরু সকলেই এখন উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে মুসলিম, খৃষ্টান, হিন্দু এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের বড় বড় শিক্ষাবিদগণের সকলেই একবাক্যে একথা স্বীকার করেছেন, ধর্ম ছাড়া মূল্যবোধ লালন করা সম্ভব নয় এবং ধর্ম ছাড়া কোন শিক্ষাও হতে পারে না। সকল ধর্মই যেহেতু স্বীকার করে যে, আল্লাহ এক এবং ঐশী নৈতিক মূল্যবোধ ছাড়া সত্যিকারের মানুষ গড়া সম্ভব নয়। সেহেতু শিক্ষাব্যবস্থা নির্মিত হওয়া উচিত ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী।

ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ রাজা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতীক যুবরাজ চার্লস বিগত কয়েক বছর ধরে ইউরোপ বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সমাজব্যবস্থায় নৈতিক বিপর্যয়ের জন্য সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করে চলেছেন। তাঁর বক্তব্য বিবৃতিতে তিনি যেখানেই সুযোগ পাচ্ছেন, সেখানেই শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় মূল্যবোধ সংযোজনের কথা বলেছেন। বিশেষ করে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে তার সর্বজনীন মূল্যবোধগুলোকে ইউরোপ গ্রহণ করে বর্তমান নৈতিক বিপর্যয় থেকে সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে কিনা এ ব্যাপারে নূতন করে খোলামনে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যও তিনি অনুরোধ করে চলেছেন। অতীব দুঃখের বিষয় এমনি ধরনের একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশে আগমন করলে আমরা তাকে নাচ-গান দিয়েই অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা করলাম।

দুনিয়ার মানুষকে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, মানবতাবোধ, মানুষে মানুষে সাম্য, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণ কামনা এবং কল্যাণ করার জন্য একমাত্র ধর্মই উদ্বুদ্ধ করেছে এবং শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং কোন দেশে সত্যিকারের মানুষ গড়তে হলে সেই দেশের ধর্ম এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতেই শিক্ষানীতি প্রণীত হওয়া অপরিহার্য।

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নে ধর্মের ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রধানত: মুসলিম এবং হিন্দু জাতির লোকেরাই বাস করে। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ এবং উপজাতীয় লোকজনদের থেকে ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে বর্তমানে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খৃষ্টানও আছে। খুব কম সংখ্যক লোক আছে যাদের কোন ধর্মীয় পরিচিতি নেই অথবা ধর্ম সম্পর্কে তাদের কোন চেতনা নেই। এরা শতাংশের হিসাবেও পড়ে না। যাদের ধর্মীয় পরিচয় আছে তাদের অনেকেই কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালন না করলেও ধর্মীয় মানসিকতার দিক থেকে খুবই আন্তরিক। অর্থাৎ সকলেই ধর্মপ্রাণ।

বাংলাদেশের সকল ধর্মের লোকেই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ আছেন এবং তিনি এক ও একক। মানুষের ইহলৌকিক জীবনটাই একমাত্র জীবন নয়। মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে এবং সেখানে মানুষের ইহজগতের সমস্ত কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে। হিসাব দানে যারা সফল হবেন, তাদের জন্য রয়েছে বেহেশত বা অফুরন্ত সুখ ও

শান্তি। আর যারা ব্যর্থ হবে তাদের স্থান হবে দোজখে যা চিরন্তন শাস্তি ও অপমানের জায়গা। সকল ধর্মের মানুষই বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ প্রদত্ত আইন কানুনের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করার মাধ্যমেই সত্যিকারের সফলতা।

এটাকে জনগণের সাধারণ বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ হিসেবে ধরে নিলে প্রত্যেক জাতির তার নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানার অধিকার একটি মৌলিক মানবীয় অধিকার। এই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। আমাদের সংবিধানেও এই অধিকার সংরক্ষিত। তাই শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যার যার ধর্মের মৌলিক নীতিমালা, আনুষ্ঠানিক ইবাদত বা ধর্মকর্ম এবং তার দার্শনিক ভিত্তি শিক্ষার অধিকার রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় এ সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে।

এরপর যে কথাটি বলতে চাই, তাহলো ধর্মপ্রাণ এবং ধর্মপালনকারী লোকজনদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। ধর্মের পরিচয় দানকারী, অথচ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ বা আমল আখলাকে অভ্যস্ত নয় এরাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক। আর এরাই সুযোগ বুঝে ধর্মকে বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে। এই অপকর্মটি সেক্যুলারপন্থী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনেতিক সংগঠনগুলিই করে থাকে।

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম সামাজিক বিধিবিধান, আইন-আদালত তথা বিচার পদ্ধতি, পারস্পরিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার, রাজনীতি, তথা জীবনের অনেক অধ্যায় সম্পর্কে নীরব। এসব ব্যাপারে তাদের কোন বক্তব্য নেই। সুতরাং ইসলামী রাজনীতির রূপরেখা, অর্থনৈতিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণসহ অন্যান্য বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করলে অমুসলিমদের কোন আপত্তি থাকার কারণ নাই। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পড়াশুনা করলে একজন হিন্দু ছাত্রের হিন্দুত্বের যদি কোন ক্ষতি না হয়, পুঁজিবাদী তথা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করলে যদি কোন বৌদ্ধ ছাত্রের ধর্মে কোন আঘাত না লাগে, মানবসৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে বস্তুবাদী এবং ডারউইনের মতবাদ পড়াশুনা করলে যদি কোন খৃস্টানের ধর্মানুভূতিতে আঘাত না লাগে, তাহলে ঐ সমস্ত ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পড়াশুনা করলে অন্যান্য ধর্মের লোকদের আপত্তির যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই। এতে তাদের ক্ষতির পরিবর্তে লাভই বেশী। জ্ঞানের ভান্ডার বৃদ্ধিই হবে।

বাংলাদেশে ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী একটি শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হওয়া গণতন্ত্রের দাবি। কারণ যে দেশের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮৭ ভাগ বা তারও বেশী মুসলিম অর্থাৎ ইসলামে বিশ্বাসী, সেই ধর্মের মূলনীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হবে এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সহজ-সরল চিন্তার পরিবর্তে বিপরীত চিন্তা এবং বক্তব্য জনমতের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং বিদ্রোহের শামিল। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে এ ধরণের কিছু বিভ্রান্ত লোকের মতামতের কোন গুরুত্ব থাকতে পারে না।

কুদরাত-এ- খুদা কমিশন রিপোর্ট

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২৩ শে মে। তৎকালীন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরও সোয়া দুই বছরের মত জীবিত ছিলেন। এরমধ্যে তিনি একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বাকশালও কায়েম করেন। কিন্তু কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তিনি বাস্তবায়ন করে যাননি এবং বাস্তবায়ন করবেন বলে কোন জনসভা, রেডিও বা টিভি ভাষণে জাতির সামনে ওয়াদাও করেননি। পরবর্তী কোন সরকারও এটা বাস্তবায়িত করার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

তাহলে কি আছে এই রিপোর্টে ?

প্রথমতঃ এই কমিশন রিপোর্টে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে তা পুরাপুরি একটি ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা। এই রিপোর্ট বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে যে তীব্র নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এ ব্যাপারে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। আর পঁচাত্তরের পটপরিবর্তন এবং বাংলাদেশের সংবিধান থেকে সেক্যুলারিজম এবং সমাজতন্ত্র তার আদি ব্যাখ্যাসহ বিদায় নেয়ার পর আর এই কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়িত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই বাকশাল সরকার পতনের পর এই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য কোন সরকার চেষ্টা করেননি।

এই শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট জনগণের মতামত উপেক্ষা করেছে

অনেক প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তির কাছে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তৈরির আগে প্রশ্নমালা পাঠানো হয়েছিল শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের জন্য। সেখানে ধর্ম সম্পর্কে ১৭ এবং ১৮ নং প্রশ্নে যে মতামত চাওয়া হয়েছিল তা হুবহু উল্লেখ করছি:

১৭। ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে নীচের কোন প্রস্তাবটা আপনার নিকট বেশী গ্রহণযোগ্য ?

(১) সাধারণ শিক্ষায়তনে ধর্ম শিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়।

(২) সাধারণ শিক্ষায়তনে সকল ধর্ম সমন্বয়ে নীতিমালা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৩) ধর্ম শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত।

(৪) ভিন্নমত।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে (১) নং এর পক্ষে মত দিয়েছেন মাত্র ১৪৭ জন, (২) নং এর পক্ষে মত দিয়েছেন ৩৯৯ জন, (৩) নং এর পক্ষে মত দিয়েছেন ১৯৫১ জন, অর্থাৎ মোট উত্তরদাতার ৬৯.৩৮% । আর ভিন্নমত দিয়েছেন ১১৫ জন।

১৮। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে আপনার মত:

(১) ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরে থাকবে।

(২) ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে থাকবে।

(৩) ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা সর্বস্তরে থাকবে।

(৪) ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা কোন স্তরেই থাকা উচিত নয়।

(৫) ভিন্নমত।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ১ নং এর পক্ষে মত দিয়েছেন ২১৩ জন, ২নং এ মত দিয়েছেন ১১৫৯ জন, ৩নং এ মত দিয়েছেন ১১২৬ জন, ৪ নং এ দিয়েছেন মাত্র ১১জন। ভিন্নমত দিয়েছেন ১৯৬ জন।

এখানে যারা সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা চেয়েছেন তারা অবশ্যই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষে। এই দুই মতের পক্ষে মত প্রকাশকারী লোকের সংখ্যা ৮০% উপর। অথচ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষায় ধর্মের কোন স্থান নেই। আছে ললিতকলার নামে নাচ-গান শিক্ষার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। শুধুমাত্র ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে দুয়েকটি পিরিয়ড রেখে আর কোন শ্রেণীতেই ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এক্ষেত্রে কমিশন শুধু জনমতকে উপেক্ষাই করেনি বরং জনগণের সাথে একটি বড় ধরনের প্রতারণা করে তাদের মতামতের বিপরীতে একটি গণবিরোধী শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করেছে।

বিভিন্ন টেকনিক্যাল যেমন মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি বিজ্ঞানসহ অন্যান্য পেশার শিক্ষা সম্পর্কে যে সব সুপারিশ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট পেশার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং বিশেষজ্ঞদেরও রয়েছে তাতে প্রবল আপত্তি। অন্যদিকে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটি প্রায় চব্বিশ বছরের পুরনো। এরিমধ্যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে এখন রাষ্ট্রধর্ম হচ্ছে ইসলাম। সুতরাং ধর্মীয় ও আদর্শিক, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন অর্থাৎ যেকোন বিচারের কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটি বাতিলযোগ্য। বাতিল না করে সংস্কার করতে গেলে এর খোলনলচেসহ এমন একটা পরিবর্তন করতে হবে যে রিপোর্টটির অবস্থা হবে কম্বলের সকল লোম বেছে ফেলার পর কম্বলের দশার মত। সুতরাং এসব পুরানো, সময় ও প্রয়োজনের সাথে খাপ খাওয়ানোর অনুপযোগী শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটি বাতিল করাই বাঞ্ছনীয়।

এখন কী করা উচিত?

উপরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত যে, আমাদের দেশের জন্য সত্যিকার অর্থেই আদর্শিক ও জাতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি সমন্বিত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন। আর এটাও পরিষ্কার যে বর্তমানে

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাও আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে অক্ষম। ইংরেজ আমলে লর্ড ম্যাকলে একদল অনুগত গোলাম তৈরি করার জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত করেছিলেন, তার মধ্যে কোনক্রমে জোড়াতালি দিয়ে আমরা হাস্যাস্পদ অবস্থায় চলছি। এতে অবস্থা পূর্বের চেয়ে খারাপ হয়েছে। এ অবস্থা আর চলতে পারে না।

সরকারের যদি কোন সদিচ্ছা থাকে তাহলে জাতির জন্য একটি যুযোপযোগী ও সমন্বিত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া উচিত। যে সব ব্যক্তির ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণের যোগ্যতা আছে এমন একজন ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার রিপোর্ট প্রকাশ করা দরকার। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কারিকুলাম এবং সিলেবাস তৈরির পর পাঠ্যবই রচনার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা উচিত। পর্যায়ক্রমে মাত্র দুই তিন বছরের মধ্যে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত নতুন কমিশনের রিপোর্টের আলোকে পরিবর্তন আনা জরুরি। সরকার যদি সত্যিই জাতিগঠনের ব্যাপারে আন্তরিক হন তাহলে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এই মৌলিক কাজটি করা উচিত।

দক্ষ জাতি গঠনে প্রয়োজন কর্মমুখী শিক্ষা

(১৯ আগষ্ট ২০০৪ সালে ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ছাত্র শিবিরের উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী শিক্ষা সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ)

শিক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে চীন দেশে অতি প্রাচীন একটি উপদেশ বাক্য চালু আছে। কথাগুলো সত্যিই অত্যন্ত বাস্তব। "তুমি যদি এক বছরের পরিকল্পনা করে থাক তাহলে শস্যদানা রোপণ করো, যদি দশ বছরের পরিকল্পনা করে থাক তাহলে বৃক্ষরোপণ করো, আর তুমি যদি শত বা হাজার বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাক তাহলে মানুষ রোপণ কর"। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল শিক্ষাবিদই মানুষ রোপণ করা অর্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকেই বুঝিয়েছেন।

আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

আমাদের শিক্ষার মূল রচয়িতা বৃটিশ শাসন আমলের লর্ড ম্যাকলে। এস. নূরুল্লাহ এবং নায়েক লিখিত শিক্ষার ইতিহাসে বৃটিশ রচিত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সেই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট থেকেই যা উদ্বৃত করা হয়েছে তার সার-সংক্ষেপ হলো যে, এমন একটি শিক্ষিত গোষ্ঠী তৈরী করা, যারা রক্তে মাংসে ও ভাষায় ভারতীয় হলেও চিন্তা চেতনা, জীবনবোধ এবং কাজে কর্মে হবে বৃটিশ জাতির মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত। আমাদের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা ঐ চিন্তারই ফসল। দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া তারা পাশ্চাত্যের মূল্যমান ও সকল ব্যাপারে তাদের চিন্তা-চেতনাকেই মানদন্ড হিসাবে ধরে নিয়েছে।

আমরা দুই-দুইবার স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় ডজনখানেক কমিশন ও কমিটি গঠন করে শিক্ষা ক্ষেত্রে তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারি নাই। ঐ মূল চিন্তার সাথে কিছুটা জোড়াতালি দিয়ে হাস্যাস্পদ অবস্থায় চলছি। ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থা

আরো মারাত্মক। বিভিন্ন রকমে শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত ধর্মীয় ব্যক্তিরা ইসলামী জ্ঞানের মূলসূত্র কুরআন ও হাদীসের চাইতে ফিকাহ শাস্ত্র এবং আকাবেরীনদের প্রাধান্য বেশী দেয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তা অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। কিছু সংস্কার হলেও এক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।

শিক্ষা ও নৈতিকতা

নীতি-নৈতিকতা বা শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রয়োজন সম্পর্কে আমার দীর্ঘ কোন আলোচনার ইচ্ছা নাই। কেননা এ ব্যাপার আমার পূর্বে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবু জাফর সাহেব মূল আলোচনা পেশ করেছেন। তবে কর্মময় জীবন গড়ার ক্ষেত্রে যেহেতু আদর্শ বা কমিটমেন্ট এবং দেশপ্রেম ও জাতিসত্তার সম্মানবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি কথা না বললেই নয়। বহুকাল আগে চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস বলেছিলেন, "Education without thinking is meaningless and thinking without education is dangerous." বিলেতি শিক্ষাবিদ Stanly Hull বলেন "If you teach your children the three R`s (i.e Reading. Writing and Arithmetic) and leave the fourth `R` (Religion), you will get a fifth `R` (Rascality)."

মহাকবি Milton শিক্ষা সম্পর্কে বলেন, "Harmonious development of body, mind & soul." কুরআনের ভাষায় নবীদের কাজ হলো:

তিনি কিতাবের আয়াত (অর্থাৎ ভাল মন্দ চেনাজানার জ্ঞান) শিক্ষা দেন, আর শিক্ষা দেন জীবনযাপনের কৌশল আত্মশুদ্ধি। উপরোক্ত তিনটি সংজ্ঞার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। চিন্তা বা দর্শন সঠিক হয় না কোন আদর্শিক বিশ্বাস ছাড়া, আর দেহ-মন এবং আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধন হয় না ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া । ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া যে বর্বরতাই শুধু পাওয়া যায় আমরাই তার বাস্তব শিক্ষা। সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ ও লালন এবং কর্মময় কল্যাণমুখী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না শিক্ষার্থীরা।

কর্মে উৎসাহদানকারী শিক্ষা এবং আমাদের শিক্ষার অবস্থা

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অধিকাংশ বিভাগই কর্মহীন বেকার তৈরীর কারখানা। শিক্ষিত হওয়া মানেই এক ধরনের ভুয়া আত্মসম্মান, কোথাও একটা অহঙ্কারের মনোভাব যেন আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। ডাবল সেক্রেটারিয়েট টেবিল, পিয়ন, পাইক পেয়াদা'সহ বেল টিপলেই attendant হাজির এমন একটা মনোভাব যেন ভার্সিটি ফেরত সকলের। অথচ এরা একবারও চিন্তা করে না যে, দেশের শতকরা ৫০% লোকও যদি উচ্চ শিক্ষা লাভ করে, তাদের জন্য গোটা বাংলাদেশকে অফিস-আদালত বানানো সম্ভব নয়। আর এই অনুৎপাদনশীল খাতে কোন উন্নত দেশই এমনটি করে না।

আমাদের প্রযুক্তিগত শিক্ষায় যারা শিক্ষিত তাদের প্রায় সকলের মানসিকতাও এমনি ধরনের। ইঞ্জিনিয়ার বা প্রকৌশলীরা নিজ হাতে কাজ করতে লজ্জাবোধ করেন।

অফিসের প্রশাসকের মতই তাদের মনোভাব। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজগুলো বহু একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পরও ঐ সব প্রতিষ্ঠানের চাল-ডাল, মাছ, তরিতরকারী কেন বাইরে থেকে কিনে খেতে হয় আমার বুঝে আসে না।

ধান, পাট, মাছ, গরু-ছাগল, পুল, কালভার্ট, দালান-কোঠা, ফ্লাইওভার, ওভারব্রিজের উপর যদি তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জনই এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কতটুকু তা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন অথবা মতিঝিল কর্মাশিয়াল এলাকার মত মাত্র দুই এক বিঘা জমির উপর একটি বহুতল বিশিষ্ট ভবনই যথেষ্ট। জাতির দুর্ভাগ্য হল এসব ব্যাপারে কেউ কথা বলতে চায় না। কারণ কিছু বললেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সেটাকে কাজে লাগিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে। অথচ বিনা কাজে দলীয় পরিচয়ে সুযোগ সুবিধার আশায় যারা ক্ষমতার কাছাকাছি ঘুরাফিরা করে, তারাও প্রতিপক্ষের সাথে যোগদান করবে। পরিচালকদের এই হীনমন্যতা আর ভীরুতা নিয়ে একটি দেশ কোনক্রমেই অগ্রসর হতে পারে না।

সকলের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত শ্লোগান একটি বড় ধরনের সমস্যা

উচ্চশিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে কথাটা শুনতে খুবই ভালই শুনায়। তথাকথিত মানবাধিকারপন্থীরা এ ব্যাপারে সুড়সুড়ি দেয়ার ব্যাপারে পারঙ্গম। কিন্তু আমার চিন্তায়ও ধরে না যে মধ্যম মাপের অর্থাৎ বর্তমান পদ্ধতিতে 'A' নীচে যাদের পরীক্ষার ফলাফল বা মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যারা Morn or Idiot তাদেরকে ছাগলের গলায় রশি বাঁধার মত করে মাস্টার ডিগ্রী পর্যন্ত টেনে নিয়ে সকল শ্রেণীতে তৃতীয় বিভাগ অর্জন করিয়ে তার নিজের, পরিবারের বা জাতির কি লাভ? বিদ্যা বুদ্ধিতে গন্ডমূর্খ থেকে শুধু উচ্চতর একটা ডিগ্রী অর্জন করে শেষ পর্যন্ত উচ্চতর ডিগ্রী গোপন রেখে এস.এস.সি বা এইচ.এস.সি পাশ ছাত্রদের সাথে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হওয়ার মধ্যে কি গৌরব বা মর্যাদা- তাও এসব ভদ্রলোক এবং তাদের পরিবারের লোকেরা বুঝতে চান না।

মেডিক্যাল কলেজগুলো থেকে যারা সাফল্যের সাথে বের হয়ে আসেন, তাদের মধ্যে কতজন সত্যিকার অর্থে সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করেন? আরো একটু এগিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে যে তাঁরা কতজন সত্যিকার অর্থে ডাক্তারী বিদ্যাটা রপ্ত করেছেন? রাজনীতি, দলাদলি, গ্রুপিং শিক্ষকদের সাথে লবি বা ক্ষেত্র বিশেষে মস্তানী করে ডিগ্রী হাসিল করলেই কি জাতির জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর ডাক্তারী বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যায়? আমার জানামতে রাজধানী শহরেই বেশ কিছু ডাক্তার আছেন যাদের আয় রোজগারের বিশেষ একটা অংশ আসে বিভিন্ন নামকরা ক্লিনিকের কমিশন থেকে। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে বিশেষ কোন ক্লিনিক বা ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে তারা এই অপকর্মটি করে থাকেন। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মাত্র এক মাস এ ব্যাপারে গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে চাইলে তা পারবেন। মাত্র কয়েকদিন আগে বগুড়ার জিয়াউর রহমান

মেডিক্যাল কলেজে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের আকস্মিক পরিদর্শনের যে খবরটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা পড়লেই অনেকে বাস্তব চিত্রটি অনুধাবন করতে পারবেন।

টেকনিক্যাল, পেশাগত এবং সেবামূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের একটা বিরাট অংশের অবস্থা যদি এই হয় তাহলে যাদেরকে কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়ানো আর শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয় তাদের শিক্ষা ও বাস্তবতার মধ্যে ফাঁক-ফোকর কতটা তা সহজেই অনুমেয়।

দেশ ও জাতির স্বার্থে উচ্চশিক্ষা সীমিতকরণ

বেশ কিছু দেশ ঘুরে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, যে সমস্ত দেশ অতি দ্রুত অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে অপরকে সহযোগিতা করছে, অন্য দেশে বিনিয়োগ করছে, অন্যদেশ থেকে শ্রমিক নিয়ে তাদের দেশের অগ্রগতিতে কাজে লাগাচ্ছে তারা কেউই সাধারণ শিক্ষার উপর এতটা গুরুত্ব দেয়নি। বরং কর্মমুখী প্রযুক্তি, বৃত্তিমূলক ও পেশাগত বিভিন্ন শিক্ষার দিকেই গুরুত্ব দিয়েছে এবং অতি দ্রুত তার ফলও পেয়েছে। যেমন-জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রভৃতি। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারতও কর্মমুখী শিক্ষার উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে তাদের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

ঐ সব দেশে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তারাই বাছাইকৃত হয়ে থাকে, যার জ্ঞান-গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান কাজে সেবা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাদের ছোট্ট আয়তনের দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে কর্মমুখী শিক্ষা দিয়ে আয় রোজগার বাড়াতে না পারলে ভবিষ্যতে মহাবিপদ। অদক্ষ এবং আধাদক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করে আমরা যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি, দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ করতে পারলে এর পরিমাণ কমপক্ষে কয়েকগুণ বেশী হতে পারতো। আর দেরি না করে পাছে লোকে কিছু বলে এ ধরনের হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অতি দ্রুত এ ব্যাপারে সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।

ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করার জন্য অন্যতম কারণ। সমাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক উত্তেজনায় সে সময় অর্থনীতি ধ্বংস হয়েছে পাইকারি জাতীয়করণের কারণে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পরিবেশ ধ্বংস হয়েছে শিক্ষকরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে। অকৃত্রিম দেশপ্রেম অথবা শত বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একটা দেশ গণতন্ত্রায়ণ বা এ ধরনের প্রক্রিয়ায় যেখানে পৌঁছেছে, একটি শিশু রাষ্ট্রে ঐ জাতীয় পদক্ষেপ নিয়ে আমরা নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করে এখন শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার কাফফারা দিচ্ছি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে খোলাখুলিভাবে কেউ কিছু বলার সাহস করছে না। ভাইস

চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ডিন, পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় চেয়ারম্যান জুনিয়র শিক্ষকদের দ্বারা অলঙ্কৃত করার ফল হাড়ে হাড়ে বুঝার পরও আমরা হক কথাটা বলতে পারছি না।

ছাত্ররাজনীতি শিক্ষার পরিবেশের জন্য আরেকটা অভিশাপ। ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের বাতিল চান, ছাত্ররাজনীতির নামে গুন্ডামি বন্ধ হোক- এটা চান। কিন্তু অগ্রসর হয়ে কোন সরকারই এ কাজটা করতে পারছেন না। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এ ব্যাপারে গণভোট নিলে জনগণের শতকরা কমপক্ষে আশি জন শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে মত দিবেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ ভোট হলে তাদের শতকরা ৭০/৭৫ ভাগ লোক এ ব্যাপারে সমর্থন জানাবে। কোন সরকার সাহস করে এ কাজটা করতে পারলে ভুক্তভোগী জনগণ, অভিভাবক, বিবেকবান শিক্ষক ও ছাত্রজীবনে যারা কিছু না শিখে গুন্ডামি বা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ডিগ্রী অর্জন করে এখন কোথাও জায়গা পাচ্ছেন না, যাদের কাছে সেই সরকার হবে সবচাইতে জনপ্রিয়।

সবকিছুরই মাথায় পচন ধরে আগে

শুধু মাছ নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের মাথায়ও পচন ধরে প্রথম। তারপর আস্তে আস্তে তা নীচের দিকে ছড়ায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের অসুশীল ব্যক্তিদের মাথা ঠিক হয়ে গেলে একাজ মোটেই কঠিন নয়। রাজনীতিতে বিরাট অংশ নিয়ন্ত্রণ করে কালোবাজারি ও মাফিয়া চক্র এবং গডফাদাররা। এরা সরকার, শিল্প কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসহ অধিকাংশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে চলেছে। গোটা জাতি বিশেষ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধাররা কালেভদ্রে কথাটি উচ্চারণ করলেও কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে রাজি নয়। কারণ যারা জাতিকে প্রতিদিন উপদেশ বাক্য শুনান, তাদেরও এর মধ্যে স্বার্থ নিহিত। দেশ গঠনের জন্য বড় কোন কাজে হাত দেয়ার আগে এদেরকে শায়েস্তা করতে না পারলে কোন পদক্ষেপই সফল হবে না।

কর্মমুখী শিক্ষার জন্য জরুরি কয়েকটি পদক্ষেপ

এক : শিক্ষার্থীরা সকলে যাতে জাতীয় আদর্শ ইসলাম ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি অটল কমিটমেন্ট অর্জন করতে পারে, সেই ধরনের কারিকুলাম-সিলেবাস ও পাঠ্যবই তৈরীর পদক্ষেপ নেয়া। কিন্তু আমরা চারদলীয় জোটের পক্ষ থেকে যে শিক্ষা কমিটি তৈরী করেছি, শিক্ষার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তাদের প্রণীত রিপোর্টে একটি বাক্যেও এর উল্লেখ নেই। এমন সমাজ যে নৈতিকতার দুর্ভিক্ষে ভুগছে তার জন্য নৈতিক মান উন্নয়নের কোন কথাও নেই। এত বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের কাছে কেন গুরুত্ব পেল না- এটা রীতিমত দুশ্চিন্তার বিষয়।

দুই : সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার স্তর কমপক্ষে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা উচিত। কারণ বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে নিজেদের খাপ-খাইয়ে নেয়ার জন্য এবং জাতিসত্তার প্রতি কমিটমেন্টের জন্য মৌলিক আদর্শের শিক্ষা বুঝতে হলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করা একান্ত জরুরি।

তিন : অবিলম্বে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ বাতিল এবং ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা। পরীক্ষামূলকভাবে হলেও কমপক্ষে ১৫ বছরের জন্য শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা উচিত। এ ব্যাপারে পার্লামেন্টে আইন পাস করার পর সহজে যাতে কেউ পরিবর্তন না করতে পারে এ জন্য গণভোট পর্যন্ত অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

চার : জাতির প্রশাসনিক উচ্চতর পদ, জ্ঞান-গবেষণা, শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষক তৈরীর জন্য যত সংখ্যায় প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশী লোক বিশেষ করে মধ্যমানের (Average) নিচের লোকদের জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা খোলা রাখার কোন যুক্তি নেই। এ ব্যাপারে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। জাতীয় অর্থের অপচয় করে শুধু অর্থহীন ডিগ্রীর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।

পাঁচ : প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজে শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে যারা ঝরে পড়েন (drop-out) এমন ধরনের I.Q সম্পন্ন ছেলেদের জন্য নানা ধরনের বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষা, কৃষিকাজ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের জন্য স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

আমাদের দেশীয় কাঁচামাল দ্বারা নানা ধরনের হস্ত শিল্পের কাজ শিক্ষা দেয়া এবং এ ধরনের শিল্প স্থাপনের কাজ খুবই সহজ। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলোতে এর চাহিদা ব্যাপক। ইউরোপ-আমেরিকায় শুধু হস্ত শিল্পের তৈরী পণ্য বিক্রি করে বাংলাদেশ বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর ব্যাপক সহযোগিতা প্রয়োজন।

ছয় : ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের যুব মন্ত্রণালয়ের কিছু উদ্যোগ উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। ভালমত তদারক করতে পারলে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে অপচয় কমিয়ে এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও ভর্তুকি প্রদান করলে কর্মমুখী শিক্ষায় বিশেষভাবে যুবসম্প্রদায় উৎসাহ পাবে। দেশে বেকারত্বের অভিশাপ অনেকটা কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

সাত : গ্লোবালাইজেশনের অভিশাপ থেকে বাঁচতে হলে কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অতি দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশ্বায়নের শ্লোগানটি শুনতে ভাল লাগলেও শক্তিধর দেশগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের মতো গরিব ও সামরিকভাবে দুর্বল দেশগুলোকে স্থায়ী বাজারে পরিণত করে অর্থনৈতিক গোলাম বানানো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার হব নাকি বিশ্বায়নের অংশ হিসেবে ভূমিকা পালন করব। প্রথমটাতে গোলামী আর দ্বিতীয়টাতে অংশীদার।

আট : আমদানি বা রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতি মোটেই টেকসই অর্থনীতি নয়-একথাটা আমাদের অর্থনীতিবিদ এবং অর্থবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বুঝতে হবে। এককেন্দ্রিক শক্তিধরের কারণে বিশ্বে সংঘাত-সংঘর্ষ আরো বাড়বে। সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর সদস্যরা পরিকল্পিতভাবেই এটা বাড়িয়ে তুলবে। ফলে নিজ দেশে তৈরী পণ্য নিজ দেশেই ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে কেনাচেনার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের কর্মমুখী শিক্ষার কারিকুলাম, সিলেবাস, বইপত্র রচনা, শিল্পকারখানা স্থাপন- এসব ব্যাপারে সমন্বয় রেখেই পদক্ষেপ নিতে হবে।

নয় : কোন এক বিষয়ের চাহিদা দেখে হঠাৎ জাতির দৃষ্টি একমাত্র সেদিকেই নিবন্ধ করা ঠিক নয়। যেমন কম্পিউটার সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকের জ্ঞানের মূল্য এখন সবদিকেই বেশী। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এ ব্যাপারটা শুধু আমরা নয়, অন্য দেশও বুঝে। তাই মাত্র কয়েক বছর পরেই হয়তো এ বিদ্যার কদর কমতে থাকবে। কারণ চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি হলে অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই দাম কমে যাবে। তাই কর্মমুখী শিক্ষায় আগামী দিনে কোন বিষয়ে চাহিদা হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পরিকল্পনা নিতে হবে।

দশ : কর্মমুখী তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে অবশ্য বাস্তব বা Practical (ব্যবহারিক) কাজ কর্ম থাকতে হবে। যাতে কাজ করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা অনীহাবোধ বা লজ্জা না করে। যেমন ডাক্তারদের ইন্টারনিশিপের মতো প্রকৌশীলীদেরও বাস্তব ময়দানে নিজ হাতে কাজ করেই চূড়ান্ত ডিগ্রীর সনদপত্র পাওয়ার জন্য শর্ত করা উচিত। এমনি ধরনের চিন্তা অন্যান্য কর্মমুখী শিক্ষায়ও প্রয়োগের চিন্তা-ভাবনা থাকা দরকার।

এগার : কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে যে অতি উন্নত মানের টেকনোলজিক্যাল শিক্ষাকে কাজে লাগানোর মত অর্থনৈতিক সামর্থ আমাদের নেই। তদুপরি বিশাল জনশক্তির একটি বড় অংশ বেকার হয়ে পড়ার আশঙ্কা। এ জন্য (Highly Technological) দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে (Labour Intensive) কর্মমুখী শিক্ষা এবং শিল্পের দিকে আমাদের নজর দেয়া দরকার।

সাহসী পদক্ষেপ নিতে তেমন কোন বাধা নেই

এ ব্যাপারে সাধারণ জনগণ বিশেষ করে শিক্ষার্থী এবং আমাদের নতুন প্রজন্মকে মটিভেট ও আগ্রহী করে তোলার দায়িত্ব পালনে আমাদের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ার বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সম্ভবত: জাতীয় প্রচারমাধ্যম এত অপ্রয়োজনীয় এবং এত নিম্নমানের অনুষ্ঠান আর কোন দেশে প্রচার করে না। আমার স্বচক্ষে দেখা উন্নত দেশগুলোর কমপক্ষে ১০/১২টা দেশের অভিজ্ঞতা নিয়েই মন্তব্যটা করছি। সরকারের উচিত যতসব নোংরা ও বিদ্বেষমূলক এবং অর্থহীন অনুষ্ঠান বন্ধ করে জাতি গঠনে ভূমিকা পালন করার জন্য জাতীয় প্রচারমাধ্যমকে নির্দেশ দেয়া। কথায় বলে প্রচারেই প্রসার।

আমাদের অঙ্গীকার হোক

আসুন আমরা জাতিগতভাবে কয়েকটি অঙ্গীকার করি

এক. জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও করণীয় বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণে দলমত-নির্বিশেষে সকলে একমত হয়ে যাই।

দুই. জাতিকে মিস্টার, সাহেব বা বাবু না বানিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী বানাই।

তিন. ভিক্ষুকের হাতকে দানের হাতে পরিণত করার জন্য একটি সম্মানজনক জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করি।

চার. ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি এমনকি সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য অথবা ক্ষমতায় থাকার জন্য ষড়যন্ত্রের পথ পরিহার করে সরল-সহজ এবং পরিচ্ছন্ন পথ ও কৌশল অবলম্বন করি।

পাঁচ. অন্ধ বিদ্বেষ বা অন্ধপ্রেম দুটোই বাদ দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের পথে মন নিয়ে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করি।

ছয়. আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা এবং সংবিধানে লিখিত জাতীয় আদর্শের ব্যাপারে কারো সাথে কোন কিছুর বিনিময়েই আপস না করি।

উপসংহার

উপরোক্ত অঙ্গীকার এবং তা পূরণ করার এখনই সময়। আমাদের স্বার্থ, হিংসা-বিদ্বেষ বা ক্ষমতার লোভের কারণে যদি ওপরোক্ত কাজগুলো করতে ব্যর্থ হই, তাহলে আগামী প্রজন্ম আমাদের কবরের উপর লাথি মারবে আর অনাগতকাল ধরে অভিশাপ বর্ষণ করবে। আর যদি সফল হই তাহলে পাব অব্যাহত দোয়া এবং মহান আল্লাহর কাছে অফুরন্ত পুরস্কার।

সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের নব্য কৌশলঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

২০০৮ সালের ২২ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবে মিলনায়তনে জামায়াত ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সপ্তাহ পালন উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা এই প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন

সাম্রাজ্যবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Imperialism. Oxford Dictionary-তে যার ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "The power of authority of an emperor, the policy, the practice or advocacy of extension of a nation's power or influence over other territories."

আধিপত্যের ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Mastery, Supremacy, Authority of overlordship. আধিপত্যবাদের ইংরেজি সংজ্ঞা দিতে গেলে দাঁড়াবে policy or practice of mastery, supremacy or overlordship to other states or territories.

সম্প্রসারণবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে, Expansionism অর্থাৎ The principle or practice of expanding territories.

উপরের তিনটি বাংলা শব্দ এবং ইংরেজিতে তার প্রতিশব্দ এবং ব্যাখ্যা যা দেয়া হয়েছে তার অর্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গি হুবহু একই রকম।

সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ তিনটি ভিন্ন নাম হলেও দুর্বল

জাতি বা রাষ্ট্রের উপর তার প্রভাব, ফলাফল এবং পরিণতি প্রায় একই। বর্তমান বিশ্বে উন্নত ধনী দেশগুলো প্রযুক্তি ও শক্তিবলে শোষণ-লুণ্ঠনের যে নব নব কৌশল আবিষ্কার করেছে তাতে আমাদের মত দেশগুলোর উপর তাদের যুলুম-নির্যাতন অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াগুলো একচেটিয়া দখলে থাকার কারণে বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলো গোয়েবলসীয় কায়দায় প্রচার চালিয়ে দিনকে রাত এবং রাতকে দিন বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

হত-দরিদ্র এবং অর্থনৈতিক জীবন-মানের দিক থেকে পশ্চাদপদ জাতির লোকেরা হীনমন্যতার কারণে আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাবে তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে বা করে নিচ্ছে। অনেক সময় পশ্চাদপদ জাতির লোকেরা ঐসব বিশ্বশক্তির প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে হীরকের মত দামী জিনিসের বদলে গাঁজা বা হিরোইন কিনে খাচ্ছে। এতবড় আত্মঘাতী কাজ করার সময় তারা যেটাকে মধু বলে গ্রহণ করছে, সময়ের ব্যবধানে যখন বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে তখন গলায় দাসত্বের শৃংখল এতটাই মজবুত যে তা ছিন্ন করে মুক্ত হওয়ার আর কোন সুযোগ নাই। ১৭৫৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার উদাহরণ এক রকম আর বর্তমান আফগানিস্তান, ইরাক এবং সিকিমের স্বাধীনতা হরণের উদাহরণের কৌশল ভিন্ন হলেও ফলাফল একই।

সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের কৌশলের কয়েকটি দিক

১. টার্গেটকৃত জাতিকে তার আদর্শ, ঐতিহ্য, ইতিহাস, কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে হীনমন্যতা সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষা-সাংস্কৃতি ও প্রচার মিডিয়াকে ব্যবহার করা। ঐতিহাসিক সকল জাতীয় বীর এবং ব্যক্তিকে দুশ্চরিত্র হিসেবে প্রমাণ করে ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

২. গ্লোবালাইজেশনের নামে বিশ্বব্যবস্থার ঐক্যের দোহাই দিয়ে অসম প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দুর্বলকে আরো দুর্বল করা।

৩. ধর্ম/আদর্শ/জাতিসত্তা বা স্বকীয়তাকে বিতর্কিত বা বিরোধিতা করার জন্য ঐ ধর্ম/আদর্শ/জাতীয়তার ধ্বজাধারী কিছু দালালকে দিয়ে আত্মহনের প্রক্রিয়া চালু করা।

৪. একই আদর্শিক জাতি/জাতিসত্তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার গ্রুপ তৈরী করার মাধ্যমে জাতিকে বিভক্ত করে Divide and Rule ষড়যন্ত্র প্রলম্বিত করা।

৫. আদর্শ বাস্তবায়নের নামে বিভিন্ন হঠকারী গ্রুপ তৈরী করে তাদের মধ্যে জিঘাংসা, হানাহানি, রক্তারক্তি এবং শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার মত সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা। অবশেষে জাতিকে মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা।

৬. শিল্পকারখানায় অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্র এবং মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্যে যে দেশে যে দ্রব্যের মৌলিক প্রয়োজন তা উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলো ক্রমে ক্রমে পঙ্গু করার মাধ্যমে অর্থনীতিকে ধ্বংস করে পরনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত করা।

৭. বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ও বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে দরিদ্র রেখে সাহায্যের নামে জনগণকে গোলামের শিকলে আবদ্ধ করার স্থায়ী কৌশল কার্যকর করা।

৮. জাতির মধ্যে একশ্রেণীর এলিট তৈরীর জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করার মাধ্যমে ভোগ-বিলাসে লিপ্ত অপচয়ী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে শাসক শ্রেণীকে আবদ্ধ করে দেশীয় পণ্যের তুলনায় বিদেশী পণ্যদ্রব্যাদি চড়ামূল্যে ক্রয় করিয়ে বড় অংকের অর্থ হাতিয়ে নেয়া।

৯. জাতির মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী অংশের মগজ ধোলাই করার জন্য অর্থ, নারী ও নেশাজাতীয় দ্রব্যসহ যাবতীয় লোভনীয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে নৈতিকভাবে অধ:পতিত অথচ বাইরের খোলসে অতি ভদ্র তথা সিভিল সোসাইটি নামে একটি অভিজাত গোষ্ঠী তৈরী করা।

১০. "রাজনীতিবিদরাই রাজনীতি করবেন, দেশ পরিচালনা করবেন"– এ বাস্তবতার পরিবর্তে দেশকে রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বশূন্য করার জন্য তাদের চরিত্র হননের যাবতীয় কৌশল অবলম্বন করা। রাজনৈতিক নেতাদের দোষত্রুটি শতগুণ বাড়িয়ে প্রচার করা যাতে গণমানুষের মধ্যে তাদের প্রতি দীর্ঘদিনের আস্থা বিনষ্ট হয়।

১১. টেকনোক্র্যাটদের মর্যাদার নামে রাষ্ট্র পরিচালনায় বেসামরিক ও সামরিক আমলা, ব্যবসায়ী এবং তথাকথিত সিভিল সোসাইটির প্রাধান্য বিস্তার করা। কারণ তাদের দেশ ও জাতির প্রতি কোন কমিটমেন্ট বা জবাবদিহিতা নেই। আজীবন গোলামী মোসাহেবির অভ্যাসের কারণে এরা নিজ দেশ ও জাতির স্বার্থের পরিবর্তে প্রভুদের এজেন্ডা বাস্তবায়নেই সময়-শ্রম ও মেধা ব্যয় করে। দেশপ্রেম বলতে এদের অধিকাংশের মধ্যেই কিছু নেই। প্রভু এবং নিজেদের স্বার্থের সমন্বয় ঘটলে এরা দেশ-জাতি এমনকি মা-বোনের ইজ্জত বিক্রি করতেও দ্বিধা করে না।

১২. জাতিগতভাবে হীনমন্যতার চরম পর্যায়ে নামানোর পর বিশেষ করে শক্তিশালী দেশটি যদি প্রতিবেশী হয় তাহলে নাগরিকদের মধ্যে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করা "খাদ্য খাই তাদের, কাপড়–চোপড় পরি তাদের", ব্যবসায়ীরা মনে করে, "কোন উৎপাদন করি না শুধু ট্রেডিং করি, তাহলে এভাবে বেঁচে থাকার চাইতে এক দেহে লীন হয়ে যাওয়াই ভাল। উপপত্নী স্ত্রীর মর্যাদা পায় না, মোহরানার হকও নেই। আইনগতভাবে নাগরিক হলে কমপক্ষে বৈধ স্ত্রীর অধিকার পাওয়া যাবে। অধিকার ক্ষুণ্ন হলে আইন আদালতের আশ্রয় নিতে পারব।"

প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে দেশটি ছোট হলেও এর গুরুত্ব সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদীদের কাছে অনেক কারণেই বেশী। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ:

১. দেশটির জনসংখ্যা বিশাল। দেশের ধারণক্ষমতার বাইরে চলে গেলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

২. মাটির নীচে গ্যাস, কয়লা, তেলের খনির যে অফুরন্ত সম্পদ আর মাটির উপরে অল্পে সন্তুষ্ট বিশাল পরিশ্রমী জনগোষ্ঠী-যা সমৃদ্ধ দেশ গড়ার অন্যতম নিয়ামক। সম্ভবত এ কারণেই আধিপত্যবাদী ভারত ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের চাপে আমাদের খনিজ সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করার সুযোগও পাচ্ছি না। আওয়ামী লীগ নেতা আবু সাঈদের লিখিত একটি বইতে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় খনিজসম্পদ অনুসন্ধানের জন্য আনীত বিদেশী জাহাজগুলিকে কিভাবে ভারতীয় নৌবাহিনী গুঁড়িয়ে দিয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

৩. বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা চর যদি বাংলাদেশের সীমানার সাথে সংযুক্ত হয় তাহলে আগামী পঞ্চাশ বছর পর বাংলাদেশ কমপক্ষে আকৃতিতে বর্তমানের ৪/৫ গুন বেশী হবে।

৪. ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বাংলাদেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সহনশীল। ইসলামে বিশ্বাসীদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৯০ ভাগের কাছাকাছি। তদুপরি তাদের মধ্যে মাযহাবী বা তত্ত্বগত ফিরকা নেই বললেই চলে। দেশের অধিকাংশ জনগণ বিশ্বাস করে যে, ইসলাম এবং ইসলামী মূল্যবোধ ও মুসলিম জাতিসত্তাই আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি। যুবসমাজের মধ্যে বিশেষভাবে জাতিসত্তার চেতনাবোধ এবং মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ তাদের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ। তাই মূলে আঘাত হানার জন্য আমাদের ভেতর থেকেই দালাল তৈরী করা।

৫. এলিট ও ভোগবিলাসী গোষ্ঠীকে হাত করার মাধ্যমে আমাদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করে উচ্ছিষ্ট কিছু অর্থ দিয়ে সাময়িকভাবে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড করার মাধ্যমে সাধারণ অশিক্ষিত গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করে সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদীদের স্থায়ী স্বার্থ হাসিল করার ব্যবস্থা করা।

৬. টার্গেটকৃত যে কোন দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশে অব্যাহতভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, অব্যাহত গণতান্ত্রিক চর্চার কারণে স্থিতিশীলতা, গণতান্ত্রিক আচরণে অভ্যস্ত হলে দেশের সবকিছুই সুসংহত হয়। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোন সরকারের কিছু দোষত্রুটি থাকলেও দেশের সম্পদ অন্যের হাতে তুলে দেয়া বা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের উপর হুমকি সৃষ্টি হয় এমন কিছু করতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শক্তি এবং প্রাচ্যের আধিপত্য শক্তির মূল শত্রু হিসেবে যেহেতু তারা আদর্শ হিসেবে ইসলাম এবং দেশ হিসেবে মুসলিম বিশ্বকেই টার্গেট করে নিয়েছে, তাই এসব দেশ বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান যাতে Emerging Tiger

হিসেবে উন্নীত হতে না পারে সে জন্য অব্যাহতভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরী করে রাখা তাদের কৌশলের অংশ। কারণ অনির্বাচিত, অসাংবিধানিক একটি কারজাই মার্কা নতজানু সরকারের মাধ্যমে অবাধ লুণ্ঠন এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়া সহজেই সম্ভব।

৭. একটি দূরবর্তী টার্গেটও আছে। তাহলো মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের মত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, আমাদের পার্বত্য এলাকাসহ চট্টগ্রাম জেলা ও বন্দর নিয়ে একটি খৃষ্টান রাষ্ট্র তৈরী করা যাতে খৃষ্টান জগতের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সহজ হয়। সেন্টমার্টিন–মহেশখালী এলাকায় একটি বিশাল নৌঘাঁটি এবং স্থলভূমিতে একটি অত্যাধুনিক সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে পারলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের আধিপত্যকে স্থায়ী রূপ দিতে আর কোন বাধা থাকে না।

ষড়যন্ত্র যেহেতু আর গোপন নাই সুতরাং আমাদের কর্তব্য

১. যে ইসলাম, ইসলামী মূল্যবোধ ও মুসলিম জাতীয়তা আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি-সে ব্যাপারে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রচার মাধ্যমের দ্বারা জাতিকে সজাগ-সচেতন করার জন্য সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিয়ে সম্ভাব্য সব কিছু করা।

২. জাতীয় স্বার্থের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলা। কিছু বেঈমান ও দালাল তো থাকবেই, সে ব্যাপারে পরোয়া না করা।

৩. আমাদের সশস্ত্রবাহিনী এবং জনগণের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে মুখোমুখি অবস্থানে নিয়ে আসার যে ষড়যন্ত্র চলছে তাকে কোনক্রমেই সফল হতে না দেয়া। এ ব্যাপারে তাদের ষড়যন্ত্র সফল হলে সব প্রচেষ্টাই ভন্ডুল হবে। তখন "মামাবাড়িতে আগুন লেগেছে সুতরাং এই সুযোগে আলু পুড়িয়ে খেয়ে নাও" এই প্রবাদ বাক্যটি প্রতিবেশী ভারত সহজেই কার্যকর করতে পারবে।

৪. বর্তমান মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে হলে সর্বাগ্রে সকল দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অতিসত্বর একটি সুষ্ঠু ও অবাধ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করাই একমাত্র পথ। নির্বাচনে যারাই সরকার গঠন করতে সমর্থ হবেন, তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে সহযোগিতার জন্য অঙ্গীকার করতে হবে। এ ছাড়া অন্য যে কোন পথেই সঙ্কট নিরসনের চেষ্টা করা হোক, সঙ্কট বাড়বে ছাড়া কমবে না।

সকলকে আল্লাহ পাক এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার তাওফিক দিন। আমীন॥

যে মরণের জন্য আমার লোভ হয়

১৯৯৯ সালের ৩ অক্টোবর বর্ষীয়ান জননেতা জনাব আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালের পর জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শোকে বিহ্বল শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাসহ জামায়াতের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ

(১৯৯৯ সালে ৮ অক্টোবর বর্ষীয়ান জননেতা মরহুম আব্বাস আলী খান স্মরণে দৈনিক সংগ্রাম যে বিশেষ সংখ্যা বের করে সে সংখ্যায় শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার এই কলামটি ছাপা হয়)

গত ৬ই অক্টোবর। ভোর সাড়ে সাতটা। বাসায় বেল বাজলো। দরজা খুলে দেখি আমার শিক্ষকতা জীবনের এক প্রিয় ছাত্র শহীদ কোনো একটি কাজে হাজির। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর একজন কর্মী। বাসা উত্তরার কাছে। কথাবার্তা বলতেই শহীদ মরহুম আব্বাস আলী খানের প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধার কথা তুললো। তার ভাষায়– 'জনাব খান আকার আকৃতিতে খুব বড় দেহের লোক ছিলেন না। কিন্তু হাঁটা চলায়, কথা বলার ধরণে, তাঁর চাহনিতে মনে হতো যেনো এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। জনসভায় তিনি যে বক্তৃতা দিতেন তা অন্যান্য নেতাদের মতো ছিলো না। ভাষার গাঁথুনি, বলার ভঙ্গি, যেখানে যে শব্দের উপর যতোটা জোর দেয়া দরকার তা দিতেন খুব মজবুতভাবে। স্যার,

আসলে খান সাহেবের প্রতি আমার কিযে ভক্তি শ্রদ্ধা এবং মহব্বত ছিলো তা ভাষায় বলতে পারবোনা। মনে হয় যদি মরহুম খান সাহেবের জন্য প্রাণভরে চিৎকার করে কাঁদতে পারতাম একেবারে শিশুর মতো গড়াগড়ি দিয়ে তাহলে মনটা একটু হালকা হতো।"

আমার ছাত্রটি জামায়াতের সাথে যুক্ত হয়েছে খুব বেশী দিন নয়। কিন্তু এতো অল্প দিনে খান সাহেবের প্রতি তার শ্রদ্ধা এবং মহব্বতের কথা যেভাবে সহজ সরল ভাষায় অশ্রুসিক্ত চোখে বলে গেলো এটা হুবহু আমার মনেরই কথা। বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড় এবং ব্যক্তিত্বটি বেশী ভারী হওয়ার কারণে আমরা সাধারণত কেউই তাঁর নাম সচরাচর উচ্চারণ করতাম না। আমীরে জামায়াত থেকে সকলেই বলতাম 'খান সাহেব'। তার পান্ডিত্য ছিলো সুগভীর। বাংলা ছাড়াও ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় তার দখল ছিলো প্রায় মাতৃভাষার মতো। আরবিতেও তাঁর দখল এতোটা ছিলো যে একজন আধুনিক শিক্ষিত লোক হওয়ার পরও জুমআর নামাজে খুতবা দেয়ার অনুরোধ এ কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই উঠে পড়তেন মিম্বরে। খুতবা দিতেন একজন যোগ্য আলেমের মতোই। নামাযে ইমামতি করতেন অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ওয়াক্তে প্রায়ই নতুন নতুন আয়াত তেলাওয়াত করতেন।

ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা খান সাহেব আপনি মাদ্রাসায় না পড়েও এতো সূরা বা আয়াত মুখস্থ করলেন কী করে?" তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, "বুঝলেন মোল্লা সাহেব, আমি ছোটবেলা থেকেই গানের পাগল ছিলাম। গান গাইতামও খুব। বিশেষ করে ঘুমন্ত মুসলিম জাতির জন্য কবি নজরুল ইসলামের জাগরণী গানগুলো আমার ছিলো খুব পছন্দ। কিন্তু ফুরফুরার মরহুম পীর আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের মুরিদ হয়ে যখন গানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি তা অপছন্দ করলেন। আমি পীর সাহেবের খেলাফত পেয়েছিলাম। তাই গান ছেড়ে দিয়ে কুরআন সুর দিয়ে পড়া শুরু করলাম। আর মুখস্থ করতে লাগলাম নতুন নতুন সূরা ও আয়াত। যখন সময় পাই, গুণ গুণ করে আমার বেশী পছন্দের আয়াতগুলো আবেগভরে তেলাওয়াত করি। একা একা থাকলে বেশ সুর দিয়েই তা করি। এ জন্যেই বেশ আয়াত মুখস্ত করতে পেরেছি। বয়স হলেও আল্লাহর মেহেরবানিতে আমার স্মরণশক্তিতে ভাটা পড়েনি। এখনও নতুন নতুন আয়াত মুখস্ত করার কোশেশ করি। মনেও থাকে বেশ।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম পীর মুরিদি ছাড়লেন কেন? হেসে বললেন একেবারে তো ছাড়িনি। আমি মাওলানা মওদূদীর (র.) মুরিদ। আপনারা আমার মুরিদ। বলেই জামায়াতে আসার ঘটনাটি বললেন। তিনি বললেন, 'হেডমাস্টারির জীবনে অধ্যাপক গোলাম আযমের কাছ থেকে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পাই। বগুড়ায় গিয়ে জেলা জামায়াত অফিস থেকে কিছু বই সংগ্রহ করে পড়ি আর আকৃষ্ট হতে থাকি।

একদিন ট্রেনে ভ্রমণের সময় আমার পীর সাহেবকে মাওলানা মওদূদী (র.) লিখিত কয়েকটি বই থেকে উর্দুতে কিছু পড়ে শুনাতে থাকি। তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন উঠেন, "বাবা এটাই তো আসল কাজ। ইক্বামাতের দ্বীনের জন্যই তো আমি আপনাদের তৈরি করছি। এ কাজই যখন আপনার পছন্দ, তখন জান-প্রাণ দিয়ে করেন। এ কাজে কিন্তু ঝুঁকি আছে।" তখন থেকেই জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়ে কাজ শুরু করি।'

উর্দু ভাষায়ও তাঁর দখল ছিলো বেশ। মাওলানা মওদূদীর (র.) বেশ কয়েকটি কঠিন বই তিনি তরজমা করেছেন। তার তরজমা যে কোনো আলেমের চেয়ে মোটেই কম সার্থক নয়। বই পড়লেই বুঝা যাবে উর্দু ভাষায় তাঁর দখল কতটা ছিলো। শুনেছি জেলখানায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মরহুম শাহ আজিজুর রহমান একদিন উর্দু ভাষায় আল্লামা ইকবাল, মির্জা গালিবসহ অন্যান্য অনেক কবি ও লেখকের কবিতা বইপত্র নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে মরহুম খান সাহেবকে উস্তাদ হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। উর্দু ভাষায় মরহুম শাহ আজিজের দখল সম্বন্ধে যাদের ধারণা আছে তারা অবশ্যই তাঁর স্বীকৃত উস্তাদের ভাষা জ্ঞান সম্পর্কে সহজেই ধারণা করতে পারবেন।

খান সাহেবের কোনো পুত্র-সন্তান ছিলো না। এ জন্যে কোনো সময়ই তাঁকে আফসোস করতে দেখিনি। স্ত্রী অসুস্থ হয়ে বিছানায় ছিলেন দীর্ঘ নয়-দশ বছর। কিন্তু কোনো সময়ই তাঁর জন্য তাঁকে পেরেশান দেখিনি। এমনকি ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় নিজের থেকে কোনো সময়ই এসব কথা তুলতেন না। বরং ইসলামী আন্দোলন, তাক্বওয়া, উত্তম নামায, আল্লাহর ওয়াস্তে যে সব কাজ করা হয় তাতে নিয়তের বিশুদ্ধতা বা এখলাস, দেশের ভবিষ্যত, বিশেষ করে বর্তমানে ভারতপন্থী এবং মারদাঙ্গা ও খুনাখুনিতে পারঙ্গম দলটি সরকারি ক্ষমতায় আসায় দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে– এগুলোই ছিলো তাঁর আলোচনার বিষয়। বিগত কয়েক বছর ধরে দেশ নিয়ে তার পেরেশানি এতটাই ছিলো যে, তার প্রতিক্রিয়া তিনি বিভিন্ন বৈঠকেও প্রকাশ করেছেন।

একদিন আমাদেরই নির্বাহী পরিষদের এক সদস্য নাসের ভাই বর্তমান দেশ ও জাতিদ্রোহী সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলছিলেন, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি এতটাই শঙ্কিত যে, যদি এ সময় ইবলিসও এসে বলে, "আমিও বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে একটা ঢিল ছুঁড়তে চাই, এদের কুকর্মের জন্য এদের মুখে থুথু মারতে চাই।" তাহলে আমি বলবো, বেশক। একটু মুচকি হেসে খান সাহেব বললেন, "নাসের আমার মনের কথাই বলেছে।"

ইতিহাসের উপর তার দখল ছিলো দারুণ রকমের। ১৯৩৫ সালে যখন মুসলমানেরা ইংরেজ ও হিন্দুদের ডাবল গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ, সে সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন মুসলিম ছাত্রের ইতিহাসে গ্র্যাজুয়েশন পরীক্ষায়

ডিস্টিংকশন পাওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না। বিশেষ করে হিন্দুদের চরম সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কারণে মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ভালো ফল করা খুবই কঠিন ছিলো। কারণ শিক্ষকদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। তাঁর লিখিত 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' ইতিহাসের প্রতি মরহুমের দখলের অন্যতম দলিল। এই বইটির প্রকাশনা উৎসবে সুসাহিত্যিক ও সকলের শ্রদ্ধেয় পন্ডিত ব্যক্তি জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেছিলেন, "আমার ধারণা ছিলো রাজনীতিবিদরা পড়াশুনা করেন না। কিন্তু খান সাহেবের বইখানা পড়ে মনে হয়েছে এমন কিছু রাজনীতিবিদ এখনো আছেন যারা শুধু পড়াশোনাই করেন না, মনে হয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমরা যারা পড়াশুনা ও বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার করি তাদের চাইতে বেশী করেন। বরং শুধু পড়াশুনা নয়, গবেষকদের মতই লেখাপড়া করেন"। সত্যিই আমি নিজে সাক্ষী যে অসুস্থতাপূর্ব পর্যন্ত দিনের অধিকাংশ সময়ই জনাব আব্বাস আলী খান পড়াশুনায় কাটাতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন বড় ধরনের আবেদ এবং মুত্তাকি। ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত ছাড়াও নফলের প্রতি তিনি ছিলেন বেশ আগ্রহী। বিশেষ করে তাহাজ্জুদ নামাযে দীর্ঘ সময় কাটাতেন। দুয়েকবার তার সাথে শেষ রাতে নামাজের সময় তাঁকে শিশুর মতো কাঁদতে দেখেছি। শুনেছি একা একা কুরআন পড়ার সময় তিনি অত্যন্ত আবেগভরে তেলাওয়াত করতেন। মাঝে মাঝেই তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠতো। অসুখে যখন বেহুঁশ অবস্থায় প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন ক'টা বাজে? উত্তর শুনার পর নামাজের সময় হলে তিনি যে ইশারায় নামায আদায় করছেন তা বুঝা যেতো। নাতি নাতনীদের প্রায় বলতেন, "ভালভাবে চলো। আল্লাহকে ভয় করো। আন্দোলনের কাজ করো। তাহলে জান্নাতে একসঙ্গে থাকতে পারবো। খালি আমার খেদমত করে লাভ হবে না।" চরম অসুস্থ অবস্থায় তার স্নেহের এক নাতনীর উদ্দেশে থর থর করে কম্পমান হাতে লিখলেন, "তুই তো একটা পাগল, অথচ আমার সময় ফুরিয়ে গেছে, ইনশাআল্লাহ জান্নাতে দেখা হবে।"

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি রাসূলে পাকের (সা.) কর্মকৌশল অনুসরণ

(মে ২০০৪ সালে ছাত্রসংবাদে প্রকাশিত প্রবন্ধ)

হামদ: মহান আল্লাহর লাখো কোটি শুকরিয়া যে উপরোক্ত শিরোনামে তিনি আমাকে কলম ধরার সাহস দিয়েছেন। অষ্টম শ্রেণি থেকে ডিগ্রি প্রথম বর্ষ পর্যন্ত একজন বাম আন্দোলনের সমর্থক আমাকে আল্লাহ যে তার অপার মেহেবানিতে হেদায়াতের আলোতে পথ চলার চেষ্টা করার তৌফিক দিয়েছেন তার শুকরিয়া আদায় করার ভাষা আমার জানা নেই। শুধু পরম দয়াবান আল্লাহর শেখানো ভাষায় বলছি, আলহামদুলিল্লাহ।

দরূদ : অসংখ্যবার দরূদ ও সালাম সেই মহানবীর (সা.) প্রতি যিনি মানবতার মুক্তির জন্য অজীবন জিহাদ করে গেছেন। পৃথিবী ভোগ লালসা অথবা সীমাহীন সম্পদ যার পবিত্র সীরাতকে বিন্দুমাত্র কলঙ্কিত করতে পারেনি। খাওয়া-দাওয়া আয়-রোজগার, বিবাহ-শাদি, সন্তান প্রতিপালন, বন্ধু ও ভক্তদের প্রতি বিনয়ী ও অভিভাবকসুলভ আচরণ, যুদ্ধ-সন্ধি, চুক্তি সম্পাদন, রাষ্ট্র পরিচালনা, একান্ত ব্যক্তিগত জীবন মোটকথা গোটা জীবন আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা তথা আল কুরআন অনুযায়ী পরিচালনা করেছেন। এজন্য তার জীবনকে বলা হয় জীবন্ত কুরআন। রবিউল আউয়াল মাসে আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এ জন্য এ মাসে মানবতার মহান শিক্ষক ও মুক্তির পথে আহ্বানকারী মহানবী (সা.) এর প্রতি আবারো জানাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দ্বীন ও নবী রাসূল পাঠানোর ব্যাপারে আল্লাহর উদ্দেশ্য

আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত, সত্য দ্বীন, নবী ও রাসূল পাঠানোর ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তার উদ্দেশ্য কী।

সূরা আল-ফাতহ এর ২৮নং আয়াতে আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্যদাতা হিসেবে বলেন, "তিনি সেই আল্লাহ যিনি তার রাসূলকে হেদায়াত (পথনির্দেশ) ও সত্য দ্বীন (ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা) সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন এক (সত্যদ্বীনকে) সকল দ্বীন বা ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করতে পারে। আর এ ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।"

ঠিক অনুরূপ কথা আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন শেষের অংশটুকুর পরিবর্তে অন্যকথা বলে। তাহলো, সূরা আস-সফ এর ৯ নং আয়াত এবং সূরা আত-তাওবার ৩৩ নং আয়াতে। এখানে শেষের অংশে বলা হয়েছে, "এ ব্যাপারটি মুশরিকদের কাছে যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন?"

সূরা আস-সফ এ ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তারা (কাফেররা) ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর আলোকে (সত্য দ্বীনকে) নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তাঁর আলো (দ্বীনকে) প্রজ্বলিত ও বিকশিত করবেনই, কাফেরদের কাছে তা যতই অসহনীয় হোকনা কেন।"

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ কথাগুলো আরো অনেক জায়গায় মহান আল্লাহ তার কুরআনুল কারীম এবং রাসূল পাক (সা) তার হাদিসে উল্লেখ করেছেন। মোট কথা আল্লাহ নিজে দায়িত্ব নিয়েছেন মানবজাতিকে পথনির্দেশ তথা সত্য জীবনব্যবস্থা এবং এর জন্য একজন আদর্শ ও বাস্তব অনুসারী ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে নবী বা রাসূল পাঠানোর। সত্যি বলতে প্রথম নবী হযরত আদম (আ) এবং মানবজাতির প্রথম মাতা হযরত হাওয়াকে দুনিয়ায় পাঠানোর পর তিনি এমনটি করবেন বলে ওয়াদাও করেছিলেন। সূরা আল-বাকারার চতুর্থ রুকু তথা ৩৮ নং আয়াতে আমরা সেই ওয়াদার কথা জানতে পাই-"অত:পর আমার নিকট থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের জন্য পৌঁছাবে, আর যারা সেই বিধান মেনে চলবে তাদের জন্য কোন চিন্তাভাবনার কারণ নেই।"

মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানবজাতির জন্য দেয়া আশ্বাস ও ওয়াদা পালন করেছেন এবং তাঁর সেই কৃত ওয়াদা মুতাবেক শেষ নবী হিসেবে মুহাম্মদ (সা) কে রাসূল হিসেবে আর মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল কুরআনের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে সার্বজনীন ও কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করে দিয়েছেন।

আল কুরআনের সূরা আল মায়েদার ৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আজ আমি তোমাদের দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের জন্য আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই আমার দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম।"

দ্বীন যখন পরিপূর্ণ, দ্বীনের মত নিয়ামত যখন আল্লাহ সম্পূর্ণ করে সেই দ্বীনকে গোটা মানবজাতির জন্য জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করার কাজ চূড়ান্ত করে দিলেন আল্লাহ স্বয়ং নিজেই, তখন আর নতুন কোনো কিতাব বা নবীর প্রয়োজন নেই। তাই মানবজাতির জন্য কেয়ামত পর্যন্ত হেদায়াতের একমাত্র কিতাব আল কুরআন এবং মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) খাতামুন্নাবীয়ীন বা শেষ নবী। এ ব্যাপারে আর কোন বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে না।

নবী জীবনের আমল এবং কর্মধারা

উপরোক্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর কোন নবী আসবেন না ঠিকই, কিন্তু যুগে যুগে দ্বীনের ব্যাখ্যা মানবজাতির প্রয়োজন অনুযায়ী চলবে। তাই তো আমরা দেখি পবিত্র কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা অগণিত সংখ্যায় বর্তমান পর্যন্ত পৌঁছেছে। এবং প্রতিটি ব্যাখ্যাই স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। চলমান পৃথিবীতে মানুষের জন্য নিত্য নতুন সমস্যা আসবে। সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদেরকে কুরআন সুন্নাহর কাছেই ফিরে আসতে হবে। নবী করীমের (সা) জীবনের শেষ দিকের উপদেশ নসিহত ও নির্দেশও তাই।

সমস্যা, প্রয়োজন, আপদ, বিপদ প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য সময়োপযোগী সমাধান ও কর্মসূচি প্রয়োজন। নবী করীমের (সা) জীবন থেকে আজ পর্যন্ত মানবজাতির এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্য থেকে মহান ও উত্তম ব্যক্তিগণ দিয়ে যাননি। কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদ বা গবেষণার কাজ চলে আসছে, বর্তমানে চলছে এবং আগামীতেও চলবে। কুরআন সুন্নাহ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও সমসাময়িক জ্ঞানের সমন্বয়ে সমস্যা সমাধান মানবজাতির জন্য উন্নত জীবন এমনকি দ্বীন কায়েমের বিভিন্ন কৌশলের নামই হিকমাহ্। কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় নবীদের শিক্ষা, দ্বীনের দিকে আহ্বান ও বিভিন্ন কর্মকান্ডে হিকমাহ বা কর্মকৌশলের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নবী করীমের (সা) আমলকে আমাদের বিজ্ঞ ফিকাহবিদগণ প্রধানত দুইভাবে ভাগ করেছেন।

এক : আমলে শারঈ। যা হলো অপরিবর্তনীয় এবং অলঙ্ঘনীয়। যেমন দিনে পাঁচবার সালাত বা নামাজ নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা। মিথ্যা কথা না বলা। রমজান মাসের ফরজ রোযা পালন করা। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাত দেয়া এবং হজ করা। এমনি ধরনের আরো অনেক কাজ আছে যা রাসূলে পাক (সা) সেসব দিনের যে সময়ে বা যে পদ্ধতিতে করেছেন তাতে কোন পরিবর্তন করা যাবে না।

দুই : আমলে তারঈ। এধরনের আমলগুলো অন্তর্নিহিত ভাবধারা অনুধাবন করে প্রয়োজনমত শরিয়তের সীমার মধ্যে উত্তমরূপে সম্পাদন করাও হিকমতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন রাসূলে করীম (সা.) যুদ্ধের জন্য উটের চাইতে ঘোড়াকে অগ্রাধিকার দিতেন। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত দ্রুতগামী এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনে অতি তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করার যোগ্য যানবাহন অধিকতর কার্যকরী। এখানে ঘোড়ার ব্যবহারটাই সুন্নাহর অনুসরণ নয়। সময়ের প্রয়োজনে অধিকতর কার্যকর যানবাহন বা সমরাস্ত্র ব্যবহার করাই সুন্নাহর অনুসরণ বা হিকমাহ্।

সহজে বুঝার জন্য হুজুরে পাকের (সা) খানাপিনা ও পোশাক পরিচ্ছদের কথাই ধরা যাক। তিনি খেজুর, উটের দুধ, যবের ছাতুসহ সহজপ্রাপ্য খাবারেই সন্তুষ্ট থাকতেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। ঐ যুগে প্রচলিত পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে রুচিশীল ও শালীন অথচ ব্যয়বহুল নয় এমন পোশাকই পরিধান করতেন। আরবরা ঐ যুগে প্রায় সকলেই পায়ের হাঁটুর নিচ পর্যন্ত জামা পরত। কারণ তারা নাভি থেকে পায়ের টাকনুর ওপর পর্যন্ত ঢাকার জন্য আলাদা কোন পায়জামা বা প্যান্ট জাতীয়

কোন পোশাক পরিধান করতো না। অর্থাৎ প্রায় সকল লোকই "গায় জামা" আর "পায় জামা" কাজ একটা পোশাক দিয়েই চালিয়ে নিত। কখনও তাহবন্দ বা এমন কোন ধরনের পোশাক পরিধান করিলেও তা ছিল সেলাই ছাড়া । তাই ফরজ অঙ্গসমূহ ঢাকার জন্য পুরুষদের জন্য লম্বা জামার প্রয়োজন ছিল। হুজুরে পাক (সা) অত্যন্ত রুচিবান, লজ্জাশীল ও শরীফ মানুষ হওয়ার কারণে তিনি গায়ে দেয়া পোশাকটির নিচে আন্ডারওয়্যার বা হাফপ্যান্ট জাতীয় একটা পোশাক পরতেন। এরপরও গায়ের জামাটার দৈর্ঘ্য হাঁটুর নিচ পর্যন্তই ছিল। যেহেতু দীর্ঘ জামার অভ্যন্তরে পোশাকটার দৈর্ঘ্য এমন ছিল না যাতে যেসব অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরজ তার উদ্দেশ্য সফল হয়। কিন্তু বর্তমানে মানুষ যেভাবে পায়জামা বা ফুল প্যান্ট ব্যবহার করে তাতে গায়ের জামাটা নেছাবে ছাক বা হাঁটুর নিচ পর্যন্ত জরুরত নেই। হুজুরে পাক (সা) এ পোশাকের ধরন-ধারণ বা কাটিং দ্বারা যে মূল জিনিসটি অনুধাবন করা যায় তাহলো যে কোন মূল্যে ফরজ যেন তরক না হয়। উপরন্তু পোশাকটা যেন এমন হয় যা রুচিশীল ভদ্রজনোচিত এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কোন বিশেষ ধরনের পোশাককে সুন্নতি পোশাক বলে ফতওয়া দেয়ার সুযোগ নেই। আমাদের দেশে যেটাকে আমরা পাঞ্জাবি বলে থাকি, পাকিস্তানে ওটাকেই বলে বাঙালি কোর্তা।

দ্বীন কায়েমে নবী করীমের (সা) কর্মসূচি ও গণতন্ত্র

এ প্রবন্ধে আমি শুধু এই একটি ব্যাপারেই কিছু আলোচনা করবো। কারণ সময় ও সাময়িকীর স্থান বিবেচনায় এবং বর্তমান বিষয়টির মধ্যে আমার কথা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

বর্তমান বিশ্বের গণতন্ত্রের ধরন ও প্রকৃতি সব জায়গা বা সবদেশে একরকম নয়। গণতন্ত্রে বাক স্বাধীনতা, মৌলিক মানবাধিকার বা ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকলেও যা খুশি তাই বলা যায় না। আধুনিক গণতন্ত্রের জন্মভূমি খোদ বৃটেনেও যিশু খ্রিস্টের বিরুদ্ধে কিছু বললে ব্লাসফেমি আইনে দন্ড পেতে হয়। রানী বা রাজার কোন সমালোচনা করা যায় না। যদিও জনগণকেই সকল ক্ষমতার উৎস ধরা হয়। ফ্রান্সের গণতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। রাজা-রানীর কোন স্থান নেই। সুতরাং King can do no wrong-এই ইংরেজি প্রবাদ বাক্যটি মোটেও ফ্রান্স দেশে প্রযোজ্য নয়। জার্মানির অবস্থা প্রায় একই ধরনের । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের রূপ সম্পূর্ণ আলাদা।

বৃহৎ দুটি শক্তির মধ্যে রাশিয়ার পতনের পর ক্ষমতার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক মোড়লিপনায় তো গোটা বিশ্বেই এখন গণতন্ত্র এবং মূল্যমান সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দানবীয় শক্তি এখন গণতন্ত্র, সন্ত্রাস, স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকারের যে সংজ্ঞা দেয় বিশ্বকে তাই কার্যত মেনে নিতে হচ্ছে। আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ইরাক কাশ্মিরসহ যেসব দেশের জনগণ স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ করছে তা হলো সন্ত্রাস, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা বিশেষ করে ইসরাইল পরের দেশ দখল করে গণহত্যা ধর্ষণ, কার্পেট বোম্বিং রাসায়নিক অস্ত্র যাই ব্যবহার করুক

তা সন্ত্রাস নয় বরং সন্ত্রাস দমনের জন্য ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ। হায়রে গণতন্ত্র, হায়রে মৌলিক মানবীয় ও ধর্মীয় অধিকার! পাশবিক ও দানবীয় শক্তির কাছে আজ ন্যায়বিচার, মৌলিক অধিকার সবকিছুই পদদলিত।

অবশ্য প্রতিবাদও হচ্ছে প্রচন্ড। শুধু অধিকৃত দেশেই জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে নয়, খোদ মার্কিন মুলুক, ইউরোপ, এশিয়াসহ সারা দুনিয়ায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে। দিন দিন এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ যুদ্ধ জোরদার হতে বাধ্য। কারণ হকের বিরুদ্ধে বাতিলের লড়াই, মানবতার বিরুদ্ধে পশু শক্তির দম্ভ একদিন পরাজিত হতে বাধ্য। স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ যদি সন্ত্রাস হয়, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই সন্ত্রাসের ফসল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুশ এবং ব্রিটেনের টনি ব্লেয়ার সন্ত্রাসের (?) বিরুদ্ধে দানবীয় লড়াই আর জল্লাদ শ্যারণের দানবীয় গণহত্যা নিজের চোখে দেখলে তাদের পূর্ব পুরুষ যারা গণতন্ত্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় না থাকলেও এদেরকে ফাঁসির আদেশ দিতেন অথবা ক্ষোভে দুঃখে আত্মহত্যা করতেন।

যা হোক আবার গণতন্ত্রের কথায় ফিরে আসি। গণতন্ত্রের আসল কথা হল, সমঝোতা, সহিষ্ণুতা, অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিজের আদর্শ বা মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা। এর সাথে ইসলামের বিরোধ থাকতে পারে না। মানুষের তৈরি সবকিছুই অস্বীকার করলে খাওয়া-পরার অনেক আইটেম বাদ দিতে হবে, ঔষধ তো গ্রহণ করার সুযোগই নেই, যানবাহনে ওঠার কোন উপায় নেই। অবশেষে বেঘোরে মৃত্যু ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ইসলামে হালাল-হারামের দিকে বিবেচনা করলে দেখতে পাই কুরআন হাদিসে হালালের তালিকা নেই। আছে হারামের। হালাল-হারামের মৌলিক উসুল বাণীটি দিয়ে বিচার করলে যা হারাম ঘোষণা করা হয়নি, তাই হালাল । কিছু জিনিস আছে মোবাহ। অবস্থা, স্থান, প্রকৃতি , সময় ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী হালাল হারাম বা জায়েজ এর ব্যাপারে মোবাহর সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবে। বিজ্ঞ আলেমগণ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার যোগ্যতা অবশ্যই রাখেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন কুরআন হাদিস বা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যারা বিশ্ববিখ্যাত আলেম ছিলেন তাদের কোন কিতাবে গণতন্ত্র হারাম এমন কথা লেখা আছে বলে আমার জানা নেই। যদি থেকে থাকে তাহলে আমি আমার চিন্তাধারা সংশোধন করে নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবো না।

গণতন্ত্রের মূল অর্থ যদি হয়ে বাকস্বাধীনতা, অন্যের ধর্মীয় বা সামাজিক মূল্যবোধকে গালিগালাজ না করে নিজের মত যুক্তি সহকারে প্রচার করার পর যদি জনগণ তা গ্রহণ করে এবং সেই মতাদর্শকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করে তাহলে তার সাথে ইসলামী ধারণার বিরোধ কোথায়?

রাসূলে পাক (সা) মক্কার তের বছর অনেক কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করেও ইসলামকে

অন্যদের কাছে এমন পরিমাণ গ্রহণযোগ্য করতে সক্ষম হলেন না যাতে তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। অন্যদিকে নিজের জন্মভূমি থেকে বহুদূরে মদিনার লোকজনের আমন্ত্রণে আল্লাহর ইচ্ছায় সেখানে গিয়ে ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অর্থাৎ জনগণের কাছে ইসলাম যখন গ্রহণযোগ্য হল এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নিয়ে তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম করতে আগ্রহী হল তখন নবী করীম (সা) পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কায়েম করার ব্যবস্থা করলেন। তার এ কর্মসূচি কি সশস্ত্র বিপ্লবের সমার্থক নাকি গণতন্ত্রের বেশি কাছাকাছি ব্যাপারটি আমি ভালভাবে চিন্তা করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ রাখছি। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে তিনি কি যুদ্ধবিগ্রহ করেননি? শত্রুর বিরুদ্ধে কি অস্ত্র ধারণ করেননি? হ্যাঁ অবশ্যই ধরেছেন। তা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পর নবী করীম (সা) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে। নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচির মাধ্যমে অধিকাংশ সময়ে নির্যাতনের শিকার হলেও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাহাবাদের কাউকেই সশস্ত্রযুদ্ধের অনুমতি দেননি।

আল্লাহ তো খাঁটি ঈমানদার হলে দশজনকে একশজনের ওপর বিশজনকে দুশজনের ওপর বিজয় দানের ওয়াদা করেছেন। কিন্তু দুর্বল ঈমান ও ত্রুটিপূর্ণ আমল নিয়ে যারা বিধর্মীদের বা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের একজনকে দুই হাজার বা একলক্ষের ওপর বিজয় দানের ওয়াদা তিনি করেননি। বর্তমান মুসলমানদের যে ঈমান আর আমরা আধুনিক প্রযুক্তির সমরাস্ত্র হাতে অনুপাতটা এক লক্ষ ভাগের তুলনায় এক ভাগেরও কম। এ অবস্থায় দ্বীন কায়েমের জন্য গৃহযুদ্ধ বা সশস্ত্র বিপ্লবের চিত্র কতখানি বাস্তব এটা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থানের কারণে ব্যাপারটি কতখানি ঝুঁকিপূর্ণ তা আরো চিন্তার বিষয়। তবে হ্যাঁ, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের ওপর অন্যায়ভাবে কেউ আক্রমণ করলে তার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত জিহাদ অবশ্যই ফরজ। তাই ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনে যে জিহাদ চলছে তা অবশ্য ন্যায়সঙ্গত। তার প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। ঐসব দেশে দানবীয় শক্তিকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য সশস্ত্র জিহাদ ছাড়া অন্যকোন বিকল্প নেই।

বর্তমান দুনিয়ার দ্বীন কায়েমের স্বাভাবিক কর্মসূচি অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক হওয়া উচিত। এখানে দ্বীনের সঠিক চিত্র মানবজাতির কাছে এমনকি বিভ্রান্ত ও অশিক্ষিত মুসলমানদের কাছেও তুলে ধরতে হবে। সঠিক ঈমান-আকিদা, উন্নত আমল, মুসলিম উম্মাহর ও মানবতাবাদী মানুষের ঐক্য এবং উন্নতমানের প্রযুক্তি অর্জনই আমাদের প্রধান টার্গেট হওয়া উচিত। অন্য কিছু করলে তা আত্মহত্যামূলক কর্মসূচির দিকেই আমাদেরকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে সবদিকে বিবেচনা করে দ্বীন কায়েমের পক্ষে সঠিকভাবে অগ্রসর হওয়ার তৌফিক দিন আমীন।

হৃদয়ে অব্যাহত রক্তক্ষরণে মনে জাগে নতুন নতুন প্রশ্ন

(২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর বায়তুল মোকাররমের সামনে নৃশংস হত্যাকান্ডের পরে শহীদদের স্মরণে প্রকাশিত বিশেষ স্মরণিকায় শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার লেখা প্রবন্ধ)

২৮ অক্টোবর ২০০৬। সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের বিদায় নেয়ার আগের দিন। তখনও বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ দু'জনেই জোট সরকারের মন্ত্রী। বিএনপির জনসভা তাদের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে। জামায়াতের জনসভা বায়তুল মোকাররমের উত্তরগেটে, উভয় সভারই সময় বিকেল ৩টায়। স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ সমর্থক এবং জনগণ তিনটা সাড়ে তিনটার আগে আসার কথা নয়। সেক্যুলার বাম ও সুশীলসমাজের একটি কলঙ্কিত অংশটির সুশীল এবং রাজনৈতিক দলগুলোর আক্রমণের মূল টার্গেট যেহেতু জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির, তাই কোনো সভা সমিতির আয়োজন করলে দুর্বৃত্ত রাজনৈতিক দলের কর্মীদের আক্রমণের আশংকায় একটু আগ থেকেই স্বেচ্ছাসেবকদের থাকতে হয়। দুর্বৃত্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সশস্ত্র মাস্তানদের আক্রমণ থেকে যাতে মঞ্চ নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ নির্বিঘ্নে করা যায় সেজন্যে সকাল সাড়ে দশটায় বসে আছি মহানগর কেন্দ্রীয় দফতরে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জামায়াতের মহানগরী শাখার কেন্দ্রীয় অফিস পুরানা পল্টনে পৌঁছে খবরের কাগজগুলোর ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে প্রায় সাড়ে এগারটা বেজে গেল। জোহর নামাজ বাদ হালকা খানা খেয়ে বায়তুল মোকাররমের উত্তরগেটের জনসভায়

যোগদান করার জন্য উঠি উঠি করছি। হঠাৎ মহানগরী অফিসে ফোন আসল। আমীরে জামায়াতের বরাত দিয়ে রাস্তার অবস্থা ভালো নয়, আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর নির্দেশক্রমে লগি-বৈঠা নিয়ে চৌদ্দদলীয় জোটের মূলত যুবসংগঠনের কর্মীরা জামায়াতের মঞ্চ পাহারায় ব্যস্ত চার/পাঁচশত কর্মীর ওপর হামলা চালাচ্ছে। সাথে সশস্ত্র মাস্তানরা আছে আর জামায়াতের স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে তেমন কিছুই নেই। পথে ঘাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইটের টুকরো আর পোস্টার ফেস্টুনের দু'চার খানা লাঠি। সুতরাং অবস্থা আমাদের জন্য ভাল নয়। সভার মঞ্চ পর্যন্ত তারা যেকোনো সময় চলে আসতে পারে। তাই আমি আর পল্টনে না গিয়ে কেন্দ্রীয় অফিসে থেকে টেলিভিশন দেখি আর প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগিতা চাই। পুলিশের সংখ্যা একেবারেই কম, যারা আছে তারাও নিষ্ক্রিয়, টেলিভিশন খুললাম, কোন চ্যানেলে খবর বা বিশেষ বুলেটিন প্রচার করে কিনা সযত্ন দৃষ্টি রাখছি, কিন্তু মোবাইল ও টিএন্ডটি ফোনে বারবার বিভিন্ন দিক থেকে খবর আসছে- অবস্থা ভয়াবহ, আহত শতাধিক, কয়েকজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক, পরান দুরুদুরু করছে। না জানি কত মায়ের বুক আজ আবার খালি করার ব্যবস্থা হচ্ছে। শহীদের তালিকা আরো দীর্ঘ হবে নাকি, এরই মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গোলাম আযম ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেন- পুরানা পল্টনের জনসভার খবর কিছু জানো। দরদভরা আবেগপ্লুত কণ্ঠে তিনি বললেন- ইতোমধ্যেই নাকি দুজন শাহাদত বরণ করেছেন? জামায়াত-শিবির কর্মীদের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসায় ভরা শিশুর মতো কোমল মনে আঘাত যাতে কম লাগে সেজন্য বললাম- আমি শুনেছি, নজর রাখছি, আক্রমণ চলছে হিংসাত্মকভাবে। কিন্তু শাহাদাতের ঘটনা বোধহয় এখনো ঘটেনি। তবে মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত কয়েকজনের অবস্থা শুনেছি দোয়া করেন।

হঠাৎ চ্যানেল আইতে দেখি খবর অথবা বিশেষ বুলেটিনের সচিত্র রিপোর্ট। একজন পাঞ্জাবি পরা কিশোরের উপর হঠাৎ লাঠি-বৈঠার উপর্যুপরি আঘাত কিল-ঘুষির পর ছেলেটি পিচঢালা পথে লুটিয়ে পড়ে গেল, এরপরও তার উপর চললো লাঠি-বৈঠার আঘাত আর উপর্যুপরি জুতা পায়ে লাথি। কিন্তু অবাক হলাম মানুষখেকো দলের মধ্যে একটি মানুষকেও দেখলাম না আঘাতকারী কাউকে থামানোর চেষ্টা করতে অথবা এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করতে যে, ছেলেটি তো বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেছে আর মারার দরকার নেই। অবস্থা দেখে ভাবলাম এদের কারো মধ্যেই মানুষের আত্মা নেই। আর বয়সের কারণে পিতৃসুলভ দৃষ্টিতে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখে নিজের অজান্তেই কয়েক ফোঁটা পানি চোখ থেকে মুখমন্ডল হয়ে দাড়ি পর্যন্ত গড়িয়ে পড়লো। মনটা একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইলো। কারণ স্বভাবগতভাবেই আমি ফ্যানের নিচে বসে এ ধরণের

অমানবিক দৃশ্য মৌনভাবে দেখে চুপ থাকার লোক নই। এরপর যা দেখলাম তা আরো ভয়াবহ এবং পৈশাচিক। কয়েকজন নরপশু ছেলেটির আসাড় লাশের উপর লাফালাফি শুরু করলো! টেলিভিশনের সংবাদ পাঠকের কণ্ঠে শুনা গেল যে, অমানবিকভাবে একে হত্যা করা হয়েছে, একটি বিষধর সাপকেও এরূপ নির্দয়ভাবে কেউ মারে না।

দেখছি আর দেখছি। পুরানা পল্টনের অলিগলি আমার চেনা। একদিক থেকে অব্যাহতভাবে লাঠি, লগি-বৈঠার আঘাত আর পিস্তলের গুলি চলছে, অন্যদিক থেকে ইটপাটকেল ছুঁড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থল পুরানা পল্টন মোড়, প্রিতম হোটেল, বাসস এবং এর উল্টা অর্থাৎ উত্তর দিকে বহুতল বিশিষ্ট ভবনের সামনের এ ফাঁকা এলাকা জুড়ে। এরপর দেখলাম একজন গুলি করে মারার পর লাশের উপর আঘাতের পর আঘাত দিয়ে গোটা শরীরকে এমনভাবে রক্তাক্ত করা হয়েছে যাতে মানুষটিকে চেনার উপায় নেই। পরনে লুঙ্গি এবং গায়ে একটি হাফশার্ট। চারজনে দুই হাত দুই পা ধরে এমনভাবে লাশটিকে নিচ্ছে যেন কসাইখানায় একটি গরু জবাই করে অন্যত্র সরিয়ে আরেকটি গরু জবাই করার জন্য জায়গা করে নিচ্ছে। নিহতের শরীর থেকে অব্যাহতভাবে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে। একটু পরে একজন লোককে আনা হলো টেলিভিশনের ক্যামেরায়, তিনি দাবি করলেন নিহত ব্যক্তির নাম মনির, তিনি তার বাবা। শিবিরের ছেলেরা তার ছেলেকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। ভয়ে শিউরে উঠলাম। কারণ যদি এ বিবরণ সত্য হয়, তাহলে আমাদের পত্রপত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলোর সত্য বা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের যে মান আর ঐসব সাংবাদিকদের নৈতিক অধঃপতনের যে পর্যায় তাতে এটাকেই জামায়াত শিবিরের দ্বারা সংঘটিত নৃশংস দৃশ্য বলে প্রচার করবে। ফলে মার খেয়ে জান দিয়ে নিহত হয়েও জনগণ এবং আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে আসামি হিসাবে। তবে নকল বাপের প্রকাশভঙ্গি এবং তার শরীরের ভাষা দেখে বিশ্বাস করতে পারলাম না যে আসলে ঐ মিথ্যাবাদী লোকটি নিহতের পিতা।

এভাবে চার-পাঁচটি দৃশ্য দেখলাম। যে দৃশ্য দেখে কেউ সহ্য করতে পারে না। পৈশাচিক মানবতার করুণ আর্তনাদের যে দৃশ্য দেখলে পাষাণ গলে, আকাশ কান্দে, বাতাস কান্দে, আল্লাহর আরশ প্রকম্পিত হয়। কিন্তু দয়া মায়ার লেশমাত্র দেখলাম না শুধু ঐ নরপিশাচদের মধ্যে। কারণ ওরা বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, পেশাগতভাবে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য খুন খারাবি আর রক্তপাত হত্যা লুণ্ঠন যা কিছু দরকার তাই করার জন্য ওরা আধিপত্যবাদী এবং ইহুদি সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ভাড়ায় খাটে। আর এর জন্য ইসলাম ও ইসলামী সংগঠনের লোকজনের জানমাল ওদের কাছে খুব সস্তা। টেলিভিশনের ভিডিও ফুটেজে তাদের চিহ্নিত করা গেলেও সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা গোষ্ঠী এবং আধিপত্যবাদী শক্তিশালী

মুরুব্বি আছে তাদের, তারাই তাদের রক্ষাকর্তা। সরকারের কোন শক্তি নাই তাদের গায়ে হাত তোলে। জনগণ দেখলো- জামায়াতের শহীদ হাবিবুর রহমান, শহীদ জসিম উদ্দিন নামে দুজন, শিবিরের শহীদ মুজাহিদুল ইসলাম, হাফেজ কিবরিয়া, সাইফুল্লাহ, রফিকুল ইসলাম, মোঃ শাহজাহান, আব্দুল্লাহ আল-ফয়সালসহ এতগুলো প্রাণ ঝরে গেল প্রকাশ্য দিবালোকে। তাদের রাস্তার উপরে পিটিয়ে গুলি করে হত্যা করা হলো। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের উল্লেখ করার মতো কাউকেই গ্রেফতার করা হলো না।

আমি নিজ চোখে দেখলাম আওয়ামী লীগের একজন ধনী ব্যবসায়ী এবং সাবেক এমপি জনৈক ডাক্তার পিটিয়ে মানুষ মারার এবং লাশের উপর নাচানাচি করার পৈশাচিক কান্ডটি সম্পাদন করার পর সঙ্গী সাথীদের বা হাত দিয়ে ইশারা করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেলেন এমনভাবে, যেন "এখানে কাজ শেষ এখন অন্যত্র অভিযান পরিচালনা করতে হবে"। তাকে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর না চেনার কথা নয়।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ধরপাকড়, দুর্নীতি দমন অভিযান, জরুরি পরিস্থিতি, ছোট ছোট অপরাধের জন্য বিভিন্ন স্থানে গুরুদন্ড অথচ এমন একটি পৈশাচিক ঘটনা যা সেনাপ্রধান, আইন উপদেষ্টাসহ অনেকেই বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন কিন্তু খুনিদের গ্রেফতার করে শাস্তি দেয়ার কোন উদ্যোগ নেই। এসব দেখে আমার মনে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে, এগুলোর উত্তর চাই সুদহৃয় পাঠক সমাজ এবং বর্তমান ক্ষমতাধর সরকারের কাছে:

১. ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর দিন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ মন্ত্রী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকার পরও মন্ত্রীদের ঘোষিত কর্মসূচি বিশেষ করে জনসভার কর্মসূচি যা বানচাল করার জন্য রাজনৈতিক অন্যপক্ষ ঘোষণা দেয়ার পরও কোন প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়নি কেন? এমন সাধারণ অবস্থায় চলাফেরা করার সময় পূর্ণ মন্ত্রীরা যে নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন ঐদিন তারও কোন ব্যবস্থা কেনই বা করা হয়নি?

২. পল্টন ময়দান থেকে বিএনপি প্রোগ্রাম প্রত্যাহার করার পরও হাজার হাজার পুলিশ দিয়ে খালি মাঠ পাহারা দেয়া হয়েছিল কার নিরাপত্তার জন্য?

৩. আমি নিজে পুলিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি পর্যন্ত যোগাযোগ করেও কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপের আশ্বাস তো দূরের কথা বরং যারা খুন হচ্ছে লগি-বৈঠা ও পিস্তলধারীদের হাতে সেই নির্যাতিত মানুষগুলোকে অভিযুক্ত করা হচ্ছিল কেন?

৪. ঘটনাস্থলেই যেখানে ৭ জন জামায়াত ও শিবিরের কর্মী শহীদ হয়েছেন, শত শত আহত হয়ে কেউ হাসপাতালে কেউ রাস্তায় কাতরাচ্ছে, পিচঢালা পথে রক্ত প্রবাহিত

হচ্ছে, বহুতল ভবন বিশেষ করে বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে বহু মানুষ চিৎকার করছে, সেই চিৎকারে মানুষের কলিজা ছিদ্র হওয়ার উপক্রম হলেও বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা দীর্ঘ আট ঘন্টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চললেও আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কেন কোন দায়িত্ব পালন করল না? সন্ধ্যায় পৌনে ৭টায় বিডিআর না এলে শহীদের সংখ্যা কত হতো আল্লাহই জানেন-চিন্তা করলেও গা শিউরে উঠে।

৫. যারা জীবন দিল, আহত হলো তাদের পক্ষ থেকে মামলা দিতে গেলে মামলা গ্রহণে কর্তৃপক্ষের গড়িমসি ছিল কার নির্দেশে? অনেক পর একটি কাউন্টার মামলা নেয়া হলো কেন হত্যাকারীদের পক্ষ থেকে? জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আসামী করে যে মামলা দেয়া হলো মূল মামলা না ধরে প্রথমেই কাউন্টার মামলা ধরে আইনের স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করে জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে কোর্টে তলব করা হলো কেন?

৬. দুর্নীতি দমনের নামে গ্রামে-গঞ্জে দু'চারখানা টিন-কম্বলের জন্য বাঘা বাঘা লোককে আসামী করা হলেও ২৮ অক্টোবর এতবড় ঘটনার জন্য ভিডিও ফুটেজ দেখে কোনো আসামিকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন? আমীন বাজারের ইটের ভাটায় দুইজন র‍্যাব সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর মাত্র দু'তিন দিনের মাথায় ভোলা জেলা থেকে আসামি ধরে যেখানে আমাদের পুলিশ এবং র‍্যাব সদস্যরা যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতের অন্ধকারে ঘটনা ঘটলেও নামকরা ছাত্রনেতাদের যারা গ্রেফতার করতে পারেন, ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর আসামি ধরার ক্ষেত্রে তাদেরকে কেন সরকার ব্যবহার করছে না?

৭. সেনাবাহিনী প্রধান তার প্রথম নীতিনির্ধারণী ভাষণে যে ঘটনার ভয়াবহতা উল্লেখ করলেন মর্মস্পর্শী ভাষায়, এমনকি মানব সভ্যতার ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা বলে উল্লেখ করার পর সেই বিভাগের গোয়েন্দারাই বা কী দায়িত্ব পালন করলেন?

৮. ইদানীং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদীদের অর্থে ও আশীর্বাদে লালিত পালিতদের কর্তৃক বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত আমাদের প্রিয় নবীজীকে (সা.) নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার পর সেখানে বাংলাদেশের সাধারণ আইনের আওতায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে ডিক্লারেশন বাতিল করার চেষ্টা না করে দুইজন উপদেষ্টা সম্পাদককে পাহারা দিয়ে জাতীয় মসজিদের খতিবের কাছে মাফ চাওয়ার ব্যবস্থার জন্য এতটা উৎসাহী হলেন কেন? বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা তো পথে ঘাটে তাদেরকে হেনস্তা করেননি, শুধু আইনের মাধ্যমে তাদের শাস্তি ও পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল চেয়েছে। এ কাজটুকু করতে সরকারের এত ভয় কেন?

৯. ডেইলি স্টার গ্রুপের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকা পবিত্র এবং সম্মানিত মক্কা নগরীকে বেশ্যাখানার সাথে (নাউজুবিল্লাহ) তুলনা করে কুখ্যাত দাউদ হায়দারের লেখা ছাপার পরও পত্রিকার প্রকাশক সম্পাদকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এই ব্যক্তিই আইন, বিচার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার সামনে টেবিল চাপড়িয়ে জরুরি আইন আনার ব্যাপারে কৃতিত্ব দাবি করেন। স্বাধীনভাবে যা খুশি লেখার জন্য ধমকের সুরে কথা বলেন। ঐ সাহস পান কোথায়?

১০. সিপিডি নামক এনজিও যারা বাংলাদেশের স্বাধীনসত্তা, সীমানা ও মানচিত্র মুছে ফেলার জন্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এমন কোনো কাজ নেই যা করেননি, বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্র প্রমাণ করার জন্য যা যা করা দরকার সবই করেছে। তারপরও বাংলাদেশকে ধ্বংস করার এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য সবচাইতে করিতকর্মা লোকটাকেই কেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো? তার স্ত্রীও একজন বিদেশী নাগরিক। এমন ব্যক্তিরা দেশের জন্য প্রতিনিধিত্ব করলে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নয় কি?

যা হোক, লেখার কলেবর বৃদ্ধি না করে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সমন্বয় করলেই ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর ষড়যন্ত্র ধরা পড়বে বলে আমার বিশ্বাস। আর এর ফলে একজন সচেতন নাগরিকের মনে যে ভয়ভীতি বা আশঙ্কার উদ্রেক হয়, তা কতটা ভয়াবহ- তা ভেবে গা শিউরে ওঠে। আমরা কি ভয়াবহ এক নিরুদ্দেশ যাত্রা শুরু করেছি? এ যাত্রার শেষ কোথায়? আজ এ পর্যন্তই, আশায় রইলাম আমাদের সরকার, কেয়ারটেকার (অন্তর্বর্তীকালীন) সরকার ও সচেতন পাঠকসমাজ আমার প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত করবেন।

দলে গণতন্ত্র চর্চা: জামায়াতের কি হবে অন্যদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই

বর্তমানে বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা এত যে, কোন মানুষের পক্ষে সব পত্রিকা তো দূরের কথা সম্ভবত: জাতীয় দৈনিক নামে একমাত্র ঢাকা থেকেই যতগুলো প্রকাশিত হয় তার অর্ধেকও প্রতিদিন পাঠ করা অসম্ভব। তাই বাধ্য হয়ে নির্বাচিত কয়েকটি পত্রিকাই পড়তে হয়। তার সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। সে হিসেবে ইত্তেফাক, প্রথম আলো, নয়া দিগন্ত, যুগান্তরসহ প্রায় ১০/১২ টি বাংলা/ইংরেজি পত্রিকা তো পড়তেই হয়।

বিগত ২২ মে, ২০০৭ তারিখে প্রকাশিত প্রথম আলোর প্রথম উপসম্পাদকীয় 'দলে গণতন্ত্র চর্চা: জামায়াতের কি হবে?' শিরোনামে প্রকাশিত লেখাটির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। অনেক নামী-দামি, সুশীল (?) সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা আনয়নের জন্য যারা প্রশংসার দাবিদার এবং পুলকিত তাদের লেখাই বেশি ছাপা হয় বলে একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে প্রতিদিনের পাঠ্য তালিকার মধ্যে 'প্রথম আলো' থাকে। যে কয়েকজনের লেখা পড়ি তাদের মধ্যে জনাব আনিসুল হকও একজন। নিজেকে অসহায় ভেবে অরণ্যে রোদন করা একজন মযলুম (?) মানুষের আর্তনাদে কর্ণপাত করা তো মানবীয় দায়িত্বও বটে। তাই তার কান্নাকাটি আদ্যোপান্ত পড়লাম। কিন্তু শিরোনাম দেখে ভেতরে পড়তে পড়তে থমকে গেলাম বটে, কিন্তু অবাক হইনি। ভেবেছিলাম জামায়াতের ভেতর তো তার মতে গণতন্ত্র চর্চা নেই, এক ব্যক্তি আমীর বা সভাপতি স্বঘোষিতভাবে কোনক্রমে বসে গেলে তিনি আর বিদায় নেন না। উপরন্তু নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মামাতো, ফুফাতো ভাই, শালা-দুলাভাই দিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সারা দেশের প্রতিটি জেলায় এমনভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে

তোলেন যাতে নিজের মৃত্যু হলেও বংশপরম্পরা বা আত্মীয়-স্বজনরাই অনাগতকাল ধরে পার্টি পরিচালনা করতে পারে। অতএব, এই মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত জামায়াতে ইসলামীকে সংশোধনের উপায় কী? এটাই বোধ হয় লেখকের মূল চিন্তার বিষয়।

একসঙ্গে কয়েকজনের সাথে আলোচনায় শেষ পর্যন্ত প্রবীণ একজনে মত দিলেন যে, লেখক বেচারা জামায়াত সম্পর্কে তেমন কিছু না জানার কারণেই এমনটা লিখেছেন- তাই তার জানার জন্যেই কিছু লেখা দরকার। কারণ বর্তমানে জরুরি অবস্থায় সভা-সমাবেশ বা সেমিনার করার তো কোন সুযোগ নেই। বিশেষ করে সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশ এবং জাতীয় পার্টির জন্য সে সুযোগ বিশেষ ক্ষমতা বলে রহিত করে দেয়া হয়েছে। তবে বিগত সরকারের আমলে যারা বিরোধী দলে ছিলেন অথবা সরকারের বা তার আশেপাশে থেকে হালুয়া রুটি দিয়ে শুধু নিজের পেট নয়, ঘনিষ্ঠ ও দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজনের পেটও ভর্তি করেছেন অথবা যাদের লগি-বৈঠার তান্ডবে মানুষের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়েছে এবং বর্তমান সরকারের প্রেসনোট অনুযায়ী যারা রাষ্ট্র ও দেশের জন্য বিপদজ্জনক-তারা যা খুশি তাই বলতে পারেন, লিখতে পারেন। যারা হিংসাত্মক অভিযান চালিয়ে দেশকে ছারখার করার জঘন্য কাজ করেছেন, রাস্তার ওপর মানুষ হত্যা করে লাশের ওপর নাচানাচি অথবা তিলকে তাল করে খবর প্রকাশের মাধ্যমে জরুরি অবস্থা সৃষ্টির জন্য মহান (?) দায়িত্ব পালন করেছেন, জরুরি অবস্থার মধ্যে তারা যদি তথাকথিত সংস্কার কর্মসূচির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন, প্রবন্ধ লেখেন, অথবা ঘোষণা দিয়ে ঘরোয়া রাজনীতির সুবিধা ভোগ করেন তাদেরকে তো তা দিতেই হবে।

যা হোক কথায় কথা আসে। অভ্যাসগতভাবে গণমানুষের কাছে কমবেশী ছোটবড় সভা-সমাবেশের মাধ্যমে নিজ পার্টির আদর্শ-উদ্দেশ্য পৌঁছানোর চেষ্টা করা যাদের নিয়মিত অভ্যাস তাদের মুখ বন্ধ করে রাখা হলে অথবা এ ক্ষেত্রে দ্বৈতনীতি দেখলে কলমের খোঁচা এদিক সেদিক দুয়েকটু যাবে। এর জন্য কেউ দোষ ধরলে আমি দুঃখিত।

আনিসুল হক সাহেব তার প্রবন্ধে প্রথমে কিছু ভূমিকার পরেই জামায়াতে ইসলামীকে ধরেছেন। 'গভর্নমেন্ট বাই দি পিপল, ফর দি পিপল, অব দি পিপলের' বদলে নাকি জামায়াতের সংজ্ঞা অনুযায়ী "গভর্নমেন্ট বাই আল্লাহ, ফর আল্লাহ, অব আল্লাহ। আর মহান আল্লাহ তায়ালার নির্বাচিত কারা? জামায়াতে ইসলামী।" বেশ ভাল কথা। কিন্তু আমি বিনয়ের সাথে জনাব আনিসুল হককে জিজ্ঞেস করতে চাই তিনি জামায়াতের দেয়া এ সংজ্ঞার সন্ধান কোথায় পেলেন? জামায়াতে ইসলামীর পার্টির গঠনতন্ত্র অথবা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কোন আমীর এমন ধরনের কোন বক্তৃতা-বিবৃতি কখন দিলেন, তিনি তার দিনক্ষণ উল্লেখ করে কোন দলিল প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজনবোধ করেননি। শুধু এতটুকুতেই ছাড়েননি। জামায়াতে ইসলামী কেন

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হ্যারিকেন দিয়ে তালাশ করার চেষ্টা করেছেন এবং জামায়াতে ইসলামী একবার ক্ষমতায় গেলে গণতন্ত্র অথবা নির্বাচনের ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। তাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বা এমনি ধরনের দলের অস্তিত্ব থাকা উচিত কিনা- এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে একদলীয় বাকশাল গঠন করার কোন ম্যান্ডেট তৎকালীন আওয়ামী লীগ জনগণের কাছ থেকে নেয়নি। অথবা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের একচেটিয়া শাসন কায়েমের জন্য অনাগতকাল দেশ শাসন করার উদ্দেশ্যে বাকশাল গঠন করার জন্য জনগণের ম্যান্ডেট নেয়ার কোন ব্যবস্থা না করেই তৎকালীন পার্লামেন্টে মাত্র ১০/১২ মিনিটের মধ্যে বাকশাল গঠন করে সকলের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করলেন। এখন পর্যন্ড আওয়ামী লীগের লোকেরা বাকশাল গঠনের জন্য ভুল স্বীকার করেননি। বরং বাংলাদেশের সব মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যেই নাকি বাকশাল গঠন করা হয়েছিল। যদিও তাদের দলীয় গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে তারা বহুদলীয় গণতন্ত্রের সুযোগ পেয়ে আবার আওয়ামী লীগের নামে রাজনীতি করছেন। আনিসুল হক সাহেবের কি এমন বুকের পাটা আছে যে এতবড় অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ড করার জন্য আওয়ামী লীগের রাজনীতি বা নির্বাচন করার অধিকার নেই- এ কথা সাহস করে বলতে পারবেন? এমন কথা বললে বা লিখলে তার জবাব মুখ বা কলম দিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তাকে দৈহিকভাবেই নির্যাতন করার ক্ষমতা ও অভ্যাস দুটোই আওয়ামী লীগের আছে। তাই আনিসুল হক সাহেবের কাছে এমনি ধরনের দল সবই গণতান্ত্রিক। কারণ তাদের শক্তি আছে।

এরপর ফাতেমা জিন্নাহ ও আইয়ুব খানের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদী (রহ) আগে পরে মহিলা নেতৃত্বের বিরোধীতা করলেও ঐ সময় ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করে সুবিধাবাদীর পরিচয় দিয়েছেন বলেও তার অভিযোগ। কিন্তু লেখকের জানা থাকা উচিত যে, ঐ সময় বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীও শরিক ছিল এবং মাওলানা মওদূদী ছিলেন কারাগারে। বড় বড় আলেমদের প্রায় সকলেই ফাতেমা জিন্নাহকে তখন সমর্থন দিয়েছিলেন। তাদের সম্মিলিত বক্তব্যের সার কথা ছিল একজনের গণতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সকল যোগ্যতা আছে, শুধু প্রেসিডেন্ট আইয়ুবপন্থী আলেমদের মতে তার বড় দোষ তিনি মেয়ে মানুষ। আর স্বৈরাচারী ও একনায়ক হয়ে সকল অপকর্ম করেও জনাব আইয়ুব খানের একটাই গুণ যে, তিনি পুরুষ মানুষ। যদি মরহুম মাওলানা মওদূদীকে এ কারণে জনাব আনিসুল হক সুবিধাবাদী ও দোষী মনে করেন, তাহলে তো সকল আলেম ও প্রগতিশীল (?) নেতাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে।

এরপর তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে দরখাস্ত পেশ করেছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করার জন্য। এ ব্যাপারে আমি অনুরোধ করবো জনাব আনিসুল হক নিজে যেন দয়া করে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের গঠনতন্ত্রটা ভাল করে পড়েন। দীর্ঘদিন থেকে রাজনীতির ময়দানে কাজ করা একটি দল সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে অথবা সুহৃদ হিসেবে কোন ভাল পরামর্শ দিতে হলে ঐ দলের গঠনতন্ত্র, কর্মনীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে একটু পড়াশুনা করা দরকার। দুতিন জন লেখকের সনদপত্র অনুযায়ী কোন দলের খারাপ বা ভাল হওয়া নির্ভর করে না। এ ব্যাপারে নিজের প্রতি আস্থার অভাবেই তিনি আরো দুজন লেখকের বরাত দিতে বাধ্য হয়েছেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কোন সময়ই এমন কোন বক্তৃতা-বিবৃতি বা ফতোয়া দেননি যে জামায়াতে ইসলামীই ইসলাম বা গণতন্ত্রের সোল এজেন্ট। বরং বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলনে অনেক সাংবাদিক ফতোয়ার ভাষায় কোন কিছু জানতে চাইলে জামায়াত নেতৃবৃন্দ সব সময়ই বলেছেন জামায়াত ফতোয়ার কোন প্রতিষ্ঠান নয়, এমনকি জামায়াত ফতোয়ার ভাষায় কখনও বক্তৃতা বিবৃতি দেয় না। তারপরও জামায়াতের ওপর জনাব আনিসুল হক এ দোষ চাপানোর জন্য মরিয়া হয়ে লাগলেন কেন খু-উ-ব জানতে ইচ্ছে করে।

জনাব হকের পরবর্তী অভিযোগ, পাকিস্তান আমলে কাদিয়ানী বিরোধী দাঙ্গায় মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব নাকি উস্কানি দিয়েছিলেন, আর সেজন্যই কোর্ট তাকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন। তখনকার সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের একটি দৈনিক ঐ দাঙ্গায় শত শত লোকের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে খবর ছাপলেও পরবর্তী পর্যায়ে বিচারপতি মুনীরের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, কাদিয়ানি ও মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গায় উভয়পক্ষে নিহত হয়েছিল সর্বসাকুল্যে এগার জন। মাওলানা মওদূদীর কাদিয়ানী সমস্যা নামে সেই বইখানা এখনও বাজারে আছে। বইটিতে মাওলানা মওদূদী নিজের কথার চাইতে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বক্তৃতা-বিবৃতি এবং তাদের উপাসনালয়ে দেয়া বক্তৃতা বা খোতবার উল্লেখই বেশি। দয়া করে আনিসুল হক সাহেব বইখানা যোগাড় করে যদি উস্কানিমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই অভিযোগটি সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

আসলে আনিসুল হক সাহেব এবং তার মত তথাকথিত উদার মনের লোকেরা কাদিয়ানিদেরকে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন কিনা- এটাই একটা বড় প্রশ্ন? পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত দাঙ্গার এতকাল পরেও পাকিস্তানী আমলের রেফারেন্স টেনে কাদিয়ানিদের প্রতি দরদের প্রকাশ দেখে তার ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। সারা দুনিয়ার আলেমসমাজ এবং ওআইসির সম্মেলনে পর্যন্ত কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী অধিকাংশ মুসলিম দেশে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার

পর সেখানে এখন কাদিয়ানি সম্প্রদায় এবং মুসলমানেরা স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে শান্তিতে বসবাস করছেন। উল্লেখ্য ঐ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশও স্বাক্ষর করেছিল। আর মাওলানা মওদূদী (রহ) ফাঁসির কথা বলেছেন? ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীসহ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অনেক নেতা এবং উল্লেখযোগ্য আলেমদের প্রায় সকলেই বিবৃতি দিয়েছিলেন।

এরপর জনাব আনিসুল হক বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বুদ্ধিজীবী হত্যার দায় জামায়াতের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেছেন। ঐ সময় জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে একতরফা প্রায় ৭/৮ বছর পত্র-পত্রিকা, সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার চালানো হয়েছিল। বেআইনি থাকার কারণে কোন প্রতিবাদ করা বা নিজের অবস্থান পরিষ্কার করার কোন সুযোগ জামায়াতের জন্য ছিল না। ১৯৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে রাজনীতি করার পর প্রতিবছরই নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে এ চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছে যে, ঐ হত্যাকান্ডে জামায়াতের কোন লোক জড়িত থাকলে তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি? তখনতো জামায়াতের পক্ষে কথা বলার উকিল মোক্তার পাওয়াও কঠিন ছিল। একদল ফরাসি সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত করতে এসে কেন কোলকাতা থেকে ফেরত গিয়েছিলেন? সে সময় প্রতিবেশী ভারত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতা পূরণের জন্য কেনই বা আগ্রহ ভরে অধ্যাপক সরবরাহ করার প্রস্তাব দিয়েছিল? মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান কেনই বা সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি? স্বাধীন বাংলাদেশে জহির রায়হান হত্যার কোন ক্লু কেন আবিস্কার করা গেল না, তার বিচারও হোল না? শহিদুল্লাহ কায়সারের মৃত্যুর জন্য জনাব আব্দুল খালেক মজুমদারকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করে অমানুষিক নির্যাতনের পরে নিম্ন আদালতে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। পরে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর কোর্ট থেকে কেন তিনি বেকসুর খালাশ পেলেন? উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী প্রেসিডেন্ট পদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন। এসব কথার উত্তর আনিসুল হক সাহেবরা দিবেন কি? এসব তো প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা নয়। একেবারে তাজা ইতিহাস। আনিসুল হক সাহেবের না জানারও কোন কারণ নেই। তবে গরজ বড় বালাই। 'পারি তো মারি অরি যে কোন কৌশলে।'

শেষ পর্যন্ত এসে ঠেকেছেন ভদ্রলোক আমেরিকা ও পশ্চিমা জগতের ইস্যুতে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নাকি পশ্চিমা গণতন্ত্রকে হাজারটা গালি দিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য একেবারে কাছা খুলে লেগেছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে বা যারা বক্তব্য দিয়ে থাকেন তাদের কারো বক্তব্য থেকে আনিসুল হক সাহেবরা একটা লাইন বা শব্দ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তোয়াজ করার মত বের করতে পারবেন কি? বরং মার্কিন প্রশাসন বিশেষ করে বুশ প্রশাসনের অগণতান্ত্রিক, অমানবিক ও সাম্রজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও তার প্রয়োগের বিরুদ্ধে

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নিয়মতান্ত্রিকভাবে সব সময়ই প্রতিবাদ করে এসেছে।

এমনকি বিগত জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী স্বয়ং ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাকসহ দুনিয়ার যেখানে বুশ প্রশাসন চন্ডনীতি অবলম্বন করে চলেছে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তার সমালোচনার ভাষা এতটাই জোরালো ছিল যে, সুহৃদদের অনেকেই মন্ত্রী হয়ে এতটা কড়া বক্তব্যে কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে একটু নরম ভাষায় কথা বলার উপদেশ দিয়েছেন। এসবই বিগত পার্লামেন্টের কার্যবিরণীতে লিপিবদ্ধ আছে। অথচ আনিসুল হক এবং তার মত এমন মানসিকতার সুশীল (?) সমাজের সদস্যগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাওয়াত পেলে তো কথাই নেই, এমনকি এখানকার কোন প্রতিনিধি একটু হাসিমুখে করমর্দন করলে খুশিতে আটখানা হয়ে যান এবং ঐ খুশির শক্তির জোরে ইসলামী আদর্শ, ইসলামী দলসমূহ এবং মুসলিম জাতিসত্তার মুন্ডুপাত করার মত দম্ভোক্তি করেন, তারা হলেন স্বাধীনচেতনা উদারমনা গণতন্ত্রী আর জামায়াতে ইসলামী হোল মার্কিন প্রশাসন তোষণকারী। চাপা আর কলমে জোর যদি থাকে আর সেই সাথে যদি থাকে আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আশীর্বাদ, তাহলে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করার অপচেষ্টা যে কেউই করতে পারেন।

মধ্য বয়সী থেকে প্রবীণ সকলের জানা থাকলেও প্রয়োজনে লিখতেই হয়। পাকিস্তান আমল থেকে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ছিল সক্রিয় অংশগ্রহণ। এমনকি ভাষা আন্দোলনের শুরুতেই যে কয়জন জোরালো ভূমিকা পালন করেছিলেন, তৎকালীন দোর্দন্ড প্রতাপশালী প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সামনে ডাকসুর জিএস হিসেবে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি যিনি পাঠ করেছিলেন তিনি জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কালান্তরে যারা জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন সেই বোর্ডে অধ্যাপক গোলাম আযমের নামটা পর্যন্ত গায়েব করা হয়েছে। হুতুম প্যাচারা সূর্যের আলো দেখে চক্ষু বন্ধ করলেই কি সূর্যের আলো ছড়ানো বন্ধ থাকে? দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তো আর চক্ষু বন্ধ করে স্বেচ্ছায় অন্ধ হয়ে থাকে না।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আন্দোলন, আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলন, পিডিএম ও ডাকসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশের পর এরশাদ বিরোধী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন, কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলা প্রদান এবং এটাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলন, আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বলিষ্ঠ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, জেল-জুলুমের শিকার হয়েছে, জনাব আনিসুল হকের হলফ করে এসব অস্বীকার করতে পারবেন কি?

শেষের দিকে আরো একটা বহুল আলোচিত ব্যাপারে কথা বলতে হয়। রাজনৈতিক

পার্টির সংস্কার, গণতন্ত্রায়ন, পারিবারিকীকরণ, আত্মীয়করণ, ইত্যাদির ব্যাপারে যে কথা উঠেছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের এ ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা নেই। কারণ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্র থেকে সর্বস্তরে আমীর বা সভাপতি নির্বাচন বছরের পর বছর আটকে থাকে না। নির্দিষ্ট সময়ে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে দায়িত্বশীল নির্বাচিত হয়ে থাকে। নির্বাচনে কোন প্রার্থী থাকেন না। কোন সদস্য কারো পক্ষে বা বিপক্ষে ক্যানভাস করে না। নিজের ঢোল নিজে তো নয়ই অপরকে দিয়ে পরোক্ষভাবেও পেটানোর সুযোগ নেই। সদস্যরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যাকে খুশি ভোট দেয়। সর্বোচ্চ ভোট যিনি পান, তিনিই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা বা সদস্য সম্মেলনে বা নির্বাচনে মাথা ফাটাফাটি, শ্লোগান, পাল্টা শ্লোগান, চেয়ার টেবিল ছোড়াছুড়ির কোন কলঙ্কময় ইতিহাস নেই। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা মওদূদীর কোন ছেলে কোন সময়েই পার্টির বড় দায়িত্বে ছিলেন না। বাংলাদেশে মরহুম মাওলানা আব্দুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম বা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীও আত্মীয়করণ ব্যাধিতে আক্রান্ত নন।

জামায়াতের সংগঠনে অন্যান্য দলের মত কয়েকশত বা হাজার কাউন্সিলররা সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ করে শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ দায়িত্ব প্রাপ্ত আমীরের একক কর্তৃত্বে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যা কিছু সিদ্ধান্ত হয় বিস্তারিত আলোচনার পর সামষ্টিকভাবেই হয়। যে সব দল উপরোক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত তাদের জন্য 'সংস্কারের আলোচনা-সমালোচনা' মাথা ব্যথার কারণ হলেও আমাদের এ ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা নেই। পদ বা দায়িত্ব যেখানে লোভনীয়- বিপত্তি সেখানেই। আর পদ বা দায়িত্ব যেখানে দায়িত্ব তথা জবাবদিহিতা- সেখানে দায়িত্বের জন্য কেউ আকঙ্ক্ষিত থাকে না, দায়িত্ব এলে কর্তব্য পালনে ভীত হয়ে পালানোরও চেষ্টা করেন না। আমাদের দলে পূর্ণ গণতন্ত্র আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ। সময়ের প্রয়োজনে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের গন্ডির মধ্যে থেকে সংস্কারের পদ্ধতি আমাদের গঠনতন্ত্রেই বলে দেয়া আছে। সবশেষে আনিসুল হক সাহেবের কাছে এই অনুরোধ রইল যে, গালি-গালাজ না করে ভাল পরামর্শ থাকলে দেবেন, আমরা সে পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ
একটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের তেমন গুরুত্ব না থাকলেও যেহেতু বৃটিশ আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত চোখে দেখা এবং জীবন থেকে শিক্ষা নেয়ার কিছু লোক এখনও জীবিত আছেন, তাদের কাছে ইতিহাসের গুরুত্ব কম নয়। তাই বৃটিশ আমল থেকেই অতি সংক্ষেপে শুরু করছি।

বৃটিশ আমল

১৭৫৭ সালে মীর জাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ ও উমিচাঁদদের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাসহ সারাভারত বৃটিশদের অধীন হয়ে পড়ে। নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে শতশত বছরের মুসলিম শাসনের অবসান হয়। হতভম্ব মুসলিম উম্মাহ বিক্ষুব্ধ হলেও নেতৃত্বের অভাবে তাদের পক্ষে তেমন কিছুই করার ছিল না।

মুসলিমদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার পর বৃটিশরা মুসলিম জাতিকেই সর্বস্বান্ত করার টার্গেট নেয়। এ কাজে সহযোগী হিসাবে পায় হিন্দু জাতিকে। কারণ মুসলিমদের কাছে যা ছিল পরাধীনতার শিকল হিন্দুদের কাছে ছিল প্রভু বদলমাত্র। তাই খৃষ্টান ও হিন্দুরা মিলে শিক্ষা-দীক্ষা, ধন-দৌলতসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল কর্তৃত্ব থেকে ভারতবর্ষের মুসলিম উম্মাহকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করে।

বৃটিশ দখলের শত বছর পর একজন প্রখ্যাত ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী ও লেখক উইলিয়াম হান্টার ঠিকই বলেছিলেন, "একশত বছর আগে যেখানে অশিক্ষিত গরিব মুসলমান পাওয়া যে ভারতে অসম্ভব ছিল; আজ সেই ভারতে একজন শিক্ষিত সচ্ছল মুসলমান খুঁজে পাওয়া মুশকিল।"।

বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন

ভারত থেকে বৃটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন প্রথম শুরু করে বঞ্চিত মুসলমানরা। কিন্তু দক্ষ নেতৃত্ববিহীন এবং সমন্বিত না হওয়ার কারণে মুসলমানরা সকল ক্ষেত্রেই পরাজয় বরণ করে। ফলে বৃটিশরা মুসলমানদের প্রতি আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এই সুযোগ গ্রহণ করে হিন্দু সমাজ বিশেষ করে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষা, ধন-দৌলত, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্তৃত্বে আরো মজবুতভাবে শিকড় গেড়ে বসে। অন্য দিকে যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে হাজার হাজার মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্ক, দিনাজপুরের গোর এ শহীদ ময়দান- সেই সব মুসলিম বীরদের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

যা হোক বৃটিশ শাসন দীর্ঘায়িত হওয়ার সুযোগে হিন্দু নেতৃবৃন্দ যখন মনে করলেন যে বৃটিশদের হাত থেকে ভারতকে স্বাধীন করতে পারলে তারাই হবে পরবর্তী ভারতের শাসনকর্তা, মুসলমানরা হবে দয়ার পাত্র, তখন হিন্দু জাতিও স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় কংগ্রেস। বঞ্চিত মুসলমানরাও হিন্দুদের সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয়। কায়েদে আজম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর মত বিচক্ষণ ব্যক্তিও কংগ্রেসে যোগদান করেন। বহু জুলুম নির্যাতনের পরও যে যে গুটি কয়েক মুসলিম পরিবার শিক্ষা-দীক্ষায় মোটামুটি উন্নত ছিলেন-তারাও এই আন্দোলনে শামিল হন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম নেতৃবৃন্দ টের পান যে মুসলমানরা দীর্ঘদিন বৃটিশ ও হিন্দুদের অধীনে ডবল গোলামী করতে বাধ্য হয়েছে, বর্তমান নেতৃত্বের অধীনে বৃটিশদের হাত থেকে মুক্তি পেলেও ভবিষ্যতে হিন্দুদের গোলামী করতে হবে। আর হিন্দুদের গোলামী হবে বৃটিশদের চেয়েও মারাত্মক। কারণ তারা যে মুসলমানদের অধীনে শতশত বছর শাসিত হয়েছে হিন্দুরা তার প্রতিশোধ নিবে। কাশ্মীর-গুজরাট, বোম্বেসহ সারা ভারতে অর্ধশত বছরে কয়েক হাজার বার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় অগণিত মুসলমানের শাহাদাত আর মা-বোনের ইজ্জত আব্রু হরণের ইতিহাস সেই সময়ের মুসলিম নেতৃত্বের আশঙ্কা যে কত সঠিক ছিল তা প্রমাণ করেছে।

শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের যে সমস্ত এলাকা মুসলিমপ্রধান সেসব এলাকায় স্বায়ত্বশাসনের দাবি জোরদার হয় এবং এক পর্যায়ে বৃটিশ সরকার ভারতের পূর্বাঞ্চলে ১৯০৬ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব-বঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। স্থাপিত হয় ঢাকা হাইকোর্ট ও সেক্রেটারিয়েট। যে সেক্রেটারিয়েট ভবনটি এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মূলভবন। আর তার সামনের রাস্তাটি এখনও সেক্রেটারিয়েট রোড নামে পরিচিত। ১৯০৬ সালে ঢাকায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

পূর্ব-বঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশ দীর্ঘদিন কোলকাতার পশ্চাদভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হোত- সেই এলাকায় হিন্দুরা কোনক্রমেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমৃদ্ধ বাংলাকে মানতে রাজি হয়নি। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গিমচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদসহ কোন হিন্দু নেতাই এ বিভক্ত বাংলাকে গ্রহণ করেনি। দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুদেরকে অবিভক্ত বাংলায়

ক্ষমতায় উজ্জীবিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ শিরক মিশ্রিত যে গানটি রচনা করেছিলেন আজ তাই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। হিন্দুদের তীব্র আন্দোলনের মুখে দুই বাংলাকে আবার এক করে মুসলমানদের বঞ্চিত করার কারণে বৃটিশ রাজার প্রশংসা করে কবি রবীন্দ্রনাথ "জনগণ অধিনায়ক ও মহাভারত ভাগ্য বিধাতা" নামে গানটি রচনা করেছিলেন তা আজও ভারতের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত।

যা হোক শেষ পর্যন্ত কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ অনেক মুসলমানই হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের কারণে কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমির আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে এক পর্যায়ে বৃটিশ ও হিন্দুরা ভারতকে তিনটুকরা করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির বাস্তবতা স্বীকার করে এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ভারতের স্থায়ী মানসিক রোগ

মুসলমানদের তীব্র আন্দোলনের মুখে এবং সেই আন্দোলনের ফলে বৃটিশদের মনোভাবের কারণে পাকিস্তানের বাস্তবতা মেনে নিলেও মনে প্রাণে ভারতীয় হিন্দুরা কোনভাবেই খন্ডিত ভারতকে মেনে নেয়নি। তারা বিশ্বাস করে ভারত তাদের ভগবান বা দেবতার অবতার। যতদিন ঐক্যবদ্ধ ভারত প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন হিন্দুদের কোন পূজা-পার্বণই ভগবান কবুল করবে না। তাই তার প্রতিবেশী শাসককে গ্রাস করার মানসিকতা নিয়েই ভারতের সমস্ত পরিকল্পনা রচিত হয়। ইতোমধ্যেই স্বাধীন সিকিমকে তারা গ্রাস করে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করেছে। নেপাল ও ভুটানকে ভারতের আনুগত্য করেই চলতে হচ্ছে। যদিও চীনের সহযোগিতায় শ্রীলংকা আপাততঃ তামিলদের আন্দোলন দমন করেছে, কিন্তু হিন্দুস্তান আবার নতুন করে ষড়যন্ত্র করছে, কি করে নতুন সমস্যা তৈরি করা যায়।

পাকিস্তান তো অব্যাহতভাবে ভারতের ষড়যন্ত্রের শিকার। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, পশ্চিমা দেশগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে পাকিস্তানকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

বিশেষ করে পারমাণবিক শক্তি অর্জনের পর পশ্চিমাদের আশঙ্কা যে, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো বিশেষ করে সৌদি আরবে এই পারমাণবিক বোমা সাপ্লাই হলে ইসরাইলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তাই পাকিস্তানের পারমাণবিক প্লান্ট হয় ধ্বংস অথবা তাদের কব্জায় নিতেই যতসব আয়োজন। আর এই আয়োজন ও ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পাকিস্তানী শাসকেরা পা দেয়ার কারণে পাকিস্তানের বর্তমান পযুর্দস্ত অবস্থা। বর্তমান বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তার কারণ ভারতের আধিপত্যবাদী মনোভাব, বাংলাদেশের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করা, বাংলাদেশকে অধীনস্থ না করলেও ভারতের বাজার হিসেবে ব্যবহার করা, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। ভারতের এই মানসিকতার পরিবর্তন না হলে এই অঞ্চলে কেউ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না।

১৯৪৭-১৯৭১ সাল

ভারতের তৎকালীন নেতৃত্ব পাকিস্তানকে কিছু দিনের জন্য মেনে নিলেও তাদের ধারণা ছিল প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং অভাব-অনটন ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পাকিস্তান স্বাধীনতা হারাবে এবং অখন্ডভারত প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। ভারত বিভক্ত হওয়ার খবর শুনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আমরণ অনশন শুরু করলে জওয়াহারলাল নেহেরু এবং বল্লভভাই প্যাটেল তাকে পাকিস্তানের অস্তিত্ব সাময়িক বলে আশ্বস্ত করেন। মাত্র কয়েকবছর পরই আবার অখন্ডভারত প্রতিষ্ঠা হবে বলে মত প্রকাশ করলে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

ভারতের এক সময়ের Reserch & Analysis Wing (RAW) এর অন্যতম পরিচালক বি. রমণের 'র এর কাউবয়েরা' বইতে বিস্তারিত বিবরণে জানা যায় যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই দেশটির রাজনীতিবিদদের কেনাবেচা এবং সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের মধ্যে অনুপ্রবেশের কৌশলে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ভারত পাকিস্তানের দুই অংশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পাকিস্তানী শাসকের মধ্যে বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের প্রতি বিদ্বেষ বাড়তে থাকে। প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে বাংলার প্রতি এবং এই এলাকার প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের প্রতি উদাসীনতা এক পর্যায়ে স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনে রূপ নেয়। স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন জোরদার হয়ে প্রচন্ডরূপ ধারণ করে এবং শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অনেক বড় বড় নেতার অজান্তেই ভারত পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতার বীজবপন করে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ অত্যন্ত গোপনে কৌশলের সাথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ফলে আওয়ামী লীগ হয়ে উঠে সবচেয়ে জনপ্রিয় দল এবং শেখ মুজিব হয়ে উঠেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় যে, অন্যান্য রাজনৈতিক দল যে পাকিস্তানের মধ্যে থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার আদায় করে সমস্যার সমাধান হতে পারে, একথা বলার সুযোগও পায়নি। যেখানেই এ ধরণের জনসভা বা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে সেখানেই আওয়ামী লীগের গুন্ডাবাহিনী আক্রমণ করে তা পন্ড করে দেয়। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ এবং বর্তমান বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আচরণে একথা চিন্তা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের পিছনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাত ছিল।

১৯৭০ সালে নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শেখ মুজিব জয়লাভ করার পর তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করাটা ছিল মারাত্মক ভুল। প্রশাসন ও দেশ পরিচালনায় অদক্ষ আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অতি অল্প সময়ে ব্যর্থ হলে জনগণ মুখ ফিরিয়ে নিত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণই শেখ মুজিবের সরকার পতনের জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু অতিশয় ধূর্ত জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্বুদ্ধিতা ভুলের পর ভুল

করতে থাকে। ভুট্টো মনে করলেন পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাকে একটা পার্লামেন্ট সদস্যও দেয়নি। শুধু পূর্ব পাকিস্তানের পার্লামেন্ট সদস্য সংখ্যা দিয়েই পূর্ব পাকিস্তানীরা স্থায়ীভাবে পাকিস্তানকে শাসন করবে।

তার ভাগ্যে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ আর জুটবে না। তাই তিনিও পাকিস্তানকে এক রাখার পরিবর্তে ভেঙ্গে ফেলার ষড়যন্ত্রের পদক্ষেপ হিসেবে রাজনৈতিক আলোচনার পরিবর্তে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরীহ জনগণের উপর সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে সমঝোতার শেষ সম্ভাবনাটুকু শেষ করে দিলেন। শেখ মুজিব পাকিস্তান ভাঙ্গার দায়-দায়িত্ব তার ঘাড়ে যাতে না চাপে সেজন্য বন্দী হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেলেন। এক কোটিরও বেশি মানুষ সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে উপায়ান্তর না দেখে ভারতে পাড়ি জমাল। ভারতের জন্য মহাসুযোগ এসে গেল পাকিস্তান ভাঙ্গার। ভারত তার চিরশত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশীদের মধ্যে সমাজতন্ত্র ও সেক্যুলারপন্থীদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ গড়ার জন্য সুযোগটি পুরোপুরি কাজে লাগাতে থাকলো। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের পালিয়ে যাওয়া সৈনিক ও বিডিআরদের মাধ্যমে গঠিত হোল মুক্তিবাহিনী। ভারত থেকে ফেরত আসার রাস্তা না থাকায় দলে দলে যুবকরাও মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হল। সারা দুনিয়ার প্রচারমাধ্যমগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা শুরু করলো। পাক-বাহিনীর অস্ত্রের সাপ্লাই না থাকায় তারা ক্রমেই দুর্বল হতে থাকলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের অস্ত্রে সজ্জিত মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনী অর্থাৎ মিত্রবাহিনীর নিকট পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে স্বাধীন হয়ে গেল।

এখানে ১৯৭১ সালে ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের ভূমিকার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। বৃটিশ আমলের ইতিহাস যাদের জানা, কমপক্ষে বৃটিশ আমলের শেষ দিকে শিক্ষিত ও জমিদার হিন্দুদের মুসলিমদের প্রতি চরম সাম্প্রদায়িক আচরণ ও অসম্মান যারা দেখেছেন বা ভুক্তভোগী তারা পড়লেন মহা বেকায়দায়। কারণ পাকিস্তানের শাসকরা সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের মুসলমান রাষ্ট্রটির জন্মের ইতিহাস, ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল তার শিক্ষাব্যবস্থা, সাহিত্য-সাংস্কৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে কোন ধারণাই যুবসমাজকে দান করেনি। বৃটিশ আমলের ইংরেজ ও হিন্দুদের অধীনে ডাবল গোলামীর কথাও তুলে ধরেনি। যুবসমাজ ও প্রবীণদের মধ্যে রাজনৈতিক ধারণার বিরাট গ্যাপ। যে পাকিস্তানের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা অকাতরে জীবন দিয়েছেন, চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করেছেন, চোখের সামনে সেই পাকিস্তান ভেঙ্গে সমস্ত মুসলিম জাহান থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশের উপর যে হিন্দু শাসিত দিল্লীর গোলামীর জোয়াল চিরদিনের জন্য চেপে বসবে- এই আশঙ্কায় সমস্ত ইসলামী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী সংগঠন, ব্যক্তিত্ব, প্রতিষ্ঠানগুলো পাকিস্তানের সীমারেখার মধ্যেই সমাধান চাইলেন। এমনকি চীনপন্থী সমাজতন্ত্রীরাও পাকিস্তানের

পক্ষেই রয়ে গেল। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকদের আন্তরিকতার অভাব, সাধারণ মানুষের বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ, মহিলাদের উপর নির্যাতনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান টিকলো না। ফলে ইসলামপন্থী, মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে গেল স্বাধীনতার দুশমন ও পাকিস্তানের দালাল। আদর্শিক দিক থেকে সমাজতন্ত্র ও সেক্যুলারিজম দুটি কুফরি মতবাদ স্বাধীন বাংলাদেশে শ্লোগান হওয়ার কারণে সেদিন যেমন আলেম-উলামা, ইসলামপন্থীদল ও প্রতিষ্ঠান তা সমর্থন করতে পারেনি আজো তা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোন কারণ নেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষও তার পক্ষে নয়।

১৯৭১-১৯৭৫ সাল

শেখ মুজিব চেয়েছিলেন সর্বোচ্চ স্বায়ত্বশাসন পেয়ে পাকিস্তানের গৌরবান্বিত প্রধানমন্ত্রী হতে। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে ভারতে বসে তাজউদ্দিন আহমদ, ফজলুল হক মনি, আব্দুর রব, আব্দুর রাজ্জাকসহ সোভিয়েতপন্থী বাম নেতারা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং খোন্দকার মুশতাক আহমদসহ ডানপন্থী নেতারা ভারতের কাছে তেমন গুরুত্ব পাননি। ভারত চেয়েছিল পাকিস্তানের সামরিক সরকার শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিক। বাংলাদেশের মানুষদের পাকিস্তান বিরোধী ক্ষোভকে ইসলাম বিরোধী ক্ষোভে রূপান্তরিত করে স্বাধীন বাংলাদেশকে সমাজতন্ত্রঘেঁষা হিন্দু কালচারে পরিপুষ্ট ভারতের একটা অনুগত রাষ্ট্র হিসাবে স্থায়ীভাবে পাওয়া।

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় পাকিস্তান শেষ ভুলটা না করে শেখ মুজিবকে ঢাকায় আসার সুযোগ করে দেয়। শেখ মুজিবকে ভারত বিমান দিতে চাইলেও তিনি ইংল্যান্ডের রাজকীয় বিমানে লন্ডন হয়ে ঢাকায় আসেন। আসার আগে তিনি পশ্চিমা দেশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে আলাপ করে আসেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য সাহায্য চান। কারণ তা না পেলে সোভিয়েত-ভারত ব্লকের দেশের দয়ার পাত্র হতে হবে- যা হবে বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক। দেশে ফিরে তিনি তাজউদ্দিন সরকারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন সাহায্য না নেয়ার ঘোষণা রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক জনসভায় বাতিল করে দেন এবং বিশ্বের সবদেশ থেকে শর্তহীন সাহায্য নেয়ার ঘোষণা দেন। তখন থেকে ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে।

অহঙ্কারী ও কর্তৃত্ববাদী শেখ মুজিব কারো হুকুম মানতে রাজি হবেন না এমন আশংকা ভারত, রাশিয়া, আমেরিকাসহ অনেক রাষ্ট্রেরই ছিল। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের পছন্দের নেতা ছিল শেখ ফজলুল হক মনি। অনেকেরই ধারণা অবস্থার সুযোগ পেলে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় শেখ মুজিবকে হত্যা করে ফজলুল হক মনি দীর্ঘ দিনের জন্য সমাজতন্ত্রী ও সেক্যুলার বাংলাদেশের গদিতে বসে পড়তেন।

সীমাহীন দুর্নীতি, ভেঙ্গে পড়া প্রশাসন, ভারতের সীমাহীন লুণ্ঠন, দেশ পরিচালনায় শেখ মুজিবের চরম ব্যর্থতা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামহীন মূল্য, '৭৪ সালের চরম দুর্ভিক্ষ, ইত্যাদি কারণে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। আশে পাশের চাটুকারদের অযাচিত প্রশংসার কারণে অপেক্ষাকৃত কম দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শেখ মুজিব জনগণের ক্ষোভ বুঝতে সক্ষম হননি। বরং নিপীড়ণের মাধ্যমে জনরোষ দমন করে ক্ষমতায় আজীবন এবং বংশপরম্পরায় টিকে থাকার জন্য আগেই রক্ষীবাহিনী গঠন করে রেখেছিলেন। তারপর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে চিরতরে দমন করার জন্য রামপন্থী নেতাদের পরামর্শে একদলীয় শাসন 'বাকশাল' কায়েম করেন ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি। ফলে আওয়ামী দুঃশাসনের অবসান হবার কোন সম্ভাবনা আর রইল না।

অন্যদিকে সেনাবাহিনীর বিকল্প বাহিনী হিসাবে তৈরি করা রক্ষীবাহিনীকে সামরিক বাহিনী কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। কারণ রক্ষীবাহিনীর সুযোগ-সুবিধা ছিল অনেক বেশী। দেশের কয়েক স্থানে সেনা সদস্য ও অফিসাররা রক্ষী বাহিনীর দ্বারা অপদস্ত হওয়ার পরও কোন ন্যায়বিচার পায়নি। শেখ মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামালের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা দিনে দুপুরে ডাকাতি করে নেয়ার খবর পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার পরও তার কোন বিচার হয়নি। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ যারা অনাহারে মারা গেছে কয়েক লক্ষ, যাদের অনেকে কাফনের কাপড়ও পায়নি, ক্ষুধার্ত মানুষ অন্যের বমি খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে, মৃত মুরগির গোশত খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে, তাদের ক্ষোভ, সেনাবাহিনীর ক্রুদ্ধ মনোভাব, অন্যদিকে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের ভোগলালসাপূর্ণ জীবন দেখে রাতের আধারে জনগণের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে চোখের পানিতে অভিশাপ দেয়া ছাড়া আর কোন গতি ছিল না। ভারত ও রাশিয়ার চাপে সেক্যুলারিজম ও সমাজতন্ত্র পরিবর্তন করাও ছিল অসম্ভব। সেক্যুলারিজম ও সমাজতন্ত্র সংবিধান থেকে বাদ না দিলে সৌদি বাদশাহ ফয়সাল ইবনে আব্দুল আযীয রাহমাহুল্লাহ সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন ওটা না করলে সৌদি আরব স্বীকৃতি দিবে না এবং বাংলাদেশকে সহযোগিতাও প্রদান করা হবে না। দুর্নীতির কারণে ক্ষুধা ও দারিদ্রপীড়িত বাংলাদেশকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার বললেন তলাবিহীন ঝুড়ি। অন্যদিকে শেখ মুজিব বামপন্থী ও সেক্যুলারদের পরামর্শ মোতাবেক বাকশাল নামে এমন এক ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, যে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করা ছাড়া বাংলাদেশে কোন রাজনৈতিক ও আদর্শিক পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। এমন এক পরিস্থিতিতে কিছু সামরিক অফিসার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেষ রাতে সালাতুল ফজরের আযানের পূর্ব মুহূর্তে শেখ মুজিবকে হত্যা করে। অথচ বিশাল রক্ষী বাহিনী, পুলিশ, বিডিআরসহ কোন বাহিনী সেদিন প্রতিরোধ করেনি। আওয়ামী লীগ বা তার অঙ্গসংগঠনের পক্ষ থেকে সারা দেশের কোথাও কোন প্রতিবাদ হয়নি। লন্ডনের

ডেইলি টেলিগ্রাফ ও গার্ডিয়ান পত্রিকা খবর ছাপালো, "বাংলাদেশের মানুষ মসজিদে এতসংখ্যক লোক জুমুআর নামাজ আদায় করেছে যেন মনে হয় তারা ঈদের খুশি পালন করছে।" অথচ আজ সময়ের বিবর্তন ও ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসে ১৫ আগস্টের সকল বিপ্লবকে একটি খুনের ঘটনা বলে চালিয়ে দিচ্ছে আর সেই সামরিক অফিসারদেরকে ফাঁসিতে ঝুঁলিয়ে মারার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে।

শেখ মুজিবের হত্যার পর খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয় তা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পায়। বাংলাদেশের অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। মাত্র ৮৩ দিনের মাথায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফকে দিয়ে ভারত পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়। কিন্তু ৩রা নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থান মাত্র ৪ দিনের মাথায় অর্থাৎ ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে সিপাহি জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে তা ব্যর্থ হয়ে যায় বিপ্লবের নায়ক খালেদ মোশাররফের লাশের খবর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ৭ নভেম্বর রাত ১২টার পর সিপাহি জনতা নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার বলে রাজপথে নেমে পড়ে। বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে জিয়াউর রহমান আরো শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

তিনি সংবিধানে জয় বাংলার পরিবর্তে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম প্রতিস্থাপন করেন। সেক্যুলারিজম বাদ দিয়ে মহান আল্লাহর উপর অটুট আস্থা ও ঈমানকে সকল কাজের উৎস হিসাবে ঘোষণা করেন। সৌদি আরবসহ অনেক দেশ যারা এর আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি তারা স্বীকৃতি দিল ঝটপট করে। তলাবিহীন ঝুড়ির বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে থাকে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন চলতে থাকে। সমরাস্ত্র এবং ক্যান্টনমেন্টের উন্নতিসহ সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির খরচের সিংহভাগই প্রদান করে সৌদি আরব সরকার। এক্ষেত্রে চীন এবং পাকিস্তানের অবদান কম নয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকে। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালের আওয়ামী লীগ শাসনামলে কিছুটা স্থবিরতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নগতি ছাড়া বিভিন্ন পরিবর্তন হলেও অর্থনীতির চাকা কখনো থেমে থাকেনি- ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত।

পাঁচ বছরে ১৭৩ দিন হরতাল, জ্বালাও পোড়াওসহ অসহযোগ আন্দোলন সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ছিল শতকরা প্রায় ৮ ভাগ। এভাবে অগ্রগতি হলে মাত্র দুতিন বছরে এটা ডাবল ডিজিটে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখে বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক অর্থনীতিবিদদের মন্তব্য ছিল "Bangladesh is going to be emerging Tiger."

২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের আদর্শিক অবস্থান, অর্থনৈতিক মডেল এবং পররাষ্টনীতির যে ভিত্তি শহীদ জিয়াউর রহমান স্থাপন করেছিলেন মোটামুটি তাই চালু ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে যে বাংলাদেশ ছিল ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের

মুখাপেক্ষী একটি সেক্যুলার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, শহীদ জিয়া তাকে ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত করানোর ব্যবস্থা করেন। শেখ মুজিবের লাহোরে ওআইসিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে যে ধারা শুরু হয়েছিল জিয়া তা আরো বেগবান করে মুসলিম ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলোর সাথে বিশেষ সম্পর্কের ঘোষণা দেন। ফলে তিনি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চোখের কাঁটায় পরিণত হন।

এই কারণেই ১৯৮১ সালের মে মাসে অপেক্ষাকৃত তরুণ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কিছু সংখ্যক ভারতপন্থী বিভ্রান্ত সেনা অফিসার কর্তৃক চট্টগ্রামে শাহাদাত বরণ করেন।

অনেকেই মনে করেন লেঃ জেনারেল এরশাদও এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। লেঃ জেনারেল মীর শওকত যশোর থেকে পদ্মা নদীর ওপাড়ে রাজবাড়ী জেলার দৌলতদিয়া ফেরীঘাট পর্যন্ত এসেছিলেন। কারণ শহীদ জিয়ার হত্যাকারী মেজর জেনারেল মঞ্জুর তাকে সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ ঘোষণা করেছিলেন। ঢাকাসহ সারাদেশে ক্রুদ্ধ জনগণ ও সেনা সদস্যদের মনোভাব বুঝতে পেরে লেঃ জেনারেল ভোল পাল্টিয়ে শহীদ জিয়ার জন্য কান্নাকাটি শুরু করেন। মীর শওকত ও যশোরে চুপিসারে ফেরত যান। শহীদ জিয়াউর রহমানকে হত্যা করতে পারলেও বাংলাদেশকে আবার সেক্যুলার রাষ্ট্রে ফিরিয়ে নেয়ার ভারতীয় ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায়। ভারতের পরোক্ষ সমর্থনে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় থাকলেও জনগণ এবং সেনাবাহিনীর মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি ভারতের ইচ্ছা পূরণ করতে পারেননি।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দফা জোট এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোটের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী একক ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে বেশ মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জামায়াতের উত্থানে ভীত হয়ে ইসলামের চ্যাম্পিয়ন সেজে জামায়াতে ইসলামকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্য এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে তা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হন। ভারত অবশেষে প্রেসিডেন্ট এরশাদের দ্বারা বড় কিছু পাওয়ার আশা ত্যাগ করে তার পরোক্ষ সমর্থন প্রত্যাহার করে। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে সকল রাজনৈতিক দলের যৌথ আন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। জামায়াতের আবিষ্কৃত এবং ঘোষিত কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলার অধীনে ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সকল শাখার রিপোর্ট অনুযায়ী বিধ্বস্ত বিএনপি ৪০/৫০টির বেশী এমপি পাওয়ার কথা নয়, জামায়াতে ইসলামী ৩০/৩২টি পাবে আর বাকিগুলো আওয়ামী লীগ এবং তার সহযোগী বামপন্থী সংগঠনগুলো পেয়ে যাবে। নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ক্ষমতায় চলে যাবে নির্বিবাদে।

কিন্তু সকলকে হতবাক করে দিয়ে দেশের নীরব সাধারণ জনতা বিএনপিকে দিল ১৩৪ এমপি, জামায়াতকে দিল ১৮ এমপি আর বাকিগুলো আওয়ামী লীগ ও জাতীয়

পার্টি। ঐ সময় ইরাকের প্রেসিডেন্ট নির্বোধ সাদ্দাম কুয়েত আক্রমণ করে বসে। এই অন্যায় যুদ্ধে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আর কেউই কুয়েত-সৌদি আরবের পক্ষে টুঁশব্দটি পর্যন্ত করেনি। এমনকি বিএনপিও নয়। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ ব্যাপকভাবে সাদ্দামের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। অবস্থা বেগতিক দেখে আওয়ামী লীগ শেখ মুজিব ও সাদ্দামের সাথে মোলাকাতের ছবি দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনসহ পোস্টার লাগায়। বিএনপিও শহীদ জিয়া ও সাদ্দামের মোলাকাতের ছবির বিজ্ঞাপন-পোস্টার ছাপায়। জামায়াতে ইসলামী জনগণের বিপরীতে পড়ার কারণে যেসব এলাকায় সাপোর্টার বেশি সেসব এলাকায় অল্প ভোটের ব্যবধানে কমপক্ষে ৮ থেকে ১০টি এমপির সিট হারায় যেগুলো বিএনপি পেয়ে যায়। কারণ যারা সাদ্দামের পক্ষে ছিল তারা আবার সকলে আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে রাজি ছিল না।

১৯৯১ এর নির্বাচনোত্তর জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা

নির্বাচনে বিস্ময়কর ফলাফল অবস্থা এমন হোল যে জামায়াতে ইসলামীর ১৮ জন এমপি ছাড়া কেউ সরকার গঠন করতে পারে না। যে আওয়ামী লীগ আজ জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী সাজিয়ে বিচার করতে চায়, সেদিন সেই আওয়ামী লীগ কমপক্ষে ৫ জন মন্ত্রী এবং ৭টি মহিলা এমপি জামায়াতকে দিয়ে হলেও জামায়াতের সমর্থনে জাতীয় পার্টিসহ সরকার গঠনে সহযোগিতার জন্য ধরনা দেয়। এমনকি ভারতীয় দূতেরা জামায়াতের নিকট তদবির করতেও লজ্জাবোধ করেনি।

সকলকে অবাক করে দিয়ে সম্পূর্ণ নি:স্বার্থভাবে জামায়াত কোন রাজনৈতিক সুবিধা না দিয়ে বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন জানায়। ফলে আওয়ামী লীগ, ভারত এবং বামপন্থীরা টের পেল কোন লোভ-লালসার কাছে জামায়াতে ইসলামী বিক্রি হয় না। জামায়াত একটি মজবুত ইসলামী আন্দোলন। তারা ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়। দেশে-বিদেশে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে জামায়াতের ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। ভারত এবং আওয়ামী লীগসহ তাদের বিদেশী মিত্ররা নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করলো। ভারত এবং ভারতপন্থী দলগুলো বুঝে নিল বাংলাদেশে ইসলামের মুখপাত্র জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির মধ্যে ফাটল ধরাতে না পারলে ক্ষমতায় যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

ভারত ও আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ মদদে গঠিত হোল ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিসহ বিভিন্ন ইসলাম ও জামায়াত বিরোধী ফোরাম। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বিএনপির একটা অংশও এর সাথে জড়িত ছিল। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তাকে জেলে ঢুকালো বিএনপি সরকার। ইসলামী ছাত্রশিবিরের ২৪ জন এবং জামায়াতের ২জন নেতা-কর্মী শহীদ হোল বিএনপির ছাত্রদলের হাতে। ক্রমেই দূরত্ব বেড়ে চললো বিএনপি ও জামায়াতের। ১৯৯৬ সালে স্বতন্ত্রভাবে বিএনপি ও জামায়াত ইলেকশন করার কারণে আওয়ামী লীগ নির্বিবাদে ক্ষমতায়

গেল। তবে দুই-তৃতীয়াংশ এমপি না পাওয়ায় সংবিধান পাল্টাতে পারলো না।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসার কারণ

১৯৯১ সালের নির্বাচনোত্তর জামায়াতের ভূমিকায় ভারত ও ভারতপন্থী দল এবং বামপন্থীরা পরিষ্কার বুঝতে পারলো যে, জামায়াত ও বিএনপি'র বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরাতে না পারলে তাদের পক্ষে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব নয়। তাই শুরু হোল নতুন ষড়যন্ত্র। ভারত ও আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ মদদে গঠিত হল ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি (ঘাদানিক)। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এই ষড়যন্ত্রের সাথে বিএনপি'র মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা বামপন্থী এবং সেক্যুলার গ্রুপটি জড়িত ছিল। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাথে যোগ দিল ইসলাম বিরোধী সকল সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এবং বিএনপি'র একটি অংশ।

সারাদেশে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর আক্রমণ শুরু হলো। অফিসগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। এই আগুন থেকে পবিত্র কুরআন-হাদিসও রক্ষা পেল না। ক্ষমতার মোহে অন্ধ বিএনপি অধ্যাপক গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার যে ওয়াদা করেছিল তা শুধু ভঙ্গই করলো না, বরং অধ্যাপক সাহেবকে গ্রেফতারও করলো। কোর্টে চললো আইনী লড়াই আর রাস্তায় রাস্তায় শুরু হল জামায়াত-শিবিরের উপর আক্রমণ। প্রতিপক্ষের আক্রমণে শিবিরের ২৪ জন এবং জামায়াতে ইসলামীর ২ জন নেতা-কর্মী শাহাদত বরণ করলো। যে ঘনিষ্ঠতার কারণে জামায়াত বিএনপিকে নিঃশর্তভাবে ক্ষমতায় বসালো তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটলো চরমভাবে।

অন্যদিকে যে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ পেল, সেই বিধানটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে বিএনপি রাজী হল না। তাদের বন্ধু মহলের শত অনুরোধ-উপরোধ বিএনপি উপেক্ষা করেই চললো। রাজনৈতিক ময়দানে জামায়াত তার দাবির প্রতি অটল থেকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকলো। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ এবং দুর্নীতির দায়ে জেলে থাকা জেনারেল এরশাদ সাহেবের জাতীয় পার্টিও জামায়াতের দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলো।

সকল দলের আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে পবিত্র রমযান মাসে বিএনপি একটি প্রহসনের নির্বাচন করলো। সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচন বয়কট করলো। এককভাবে নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি পার্লামেন্টে কেয়ারটেকার সরকারের বিধান অন্তর্ভুক্ত করলো। বিধানটি সংবিধানে যুক্ত করার গৌরব বিএনপি নিল বটে, কিন্তু জনপ্রিয়তা যথেষ্ট হ্রাস পেল।

১৯৯৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হল জাতীয় নির্বাচন। নির্বাচনের আগে দেশী বিদেশী বন্ধুদের বিএনপি- জামায়াতকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে

নির্বাচনের চেষ্টা বিফল হল। কারণ দুই দলের দূরত্ব তখন এতটা বেশি যে তা জোড়া লাগানো অনেকটা অসম্ভব ছিল। উভয় দলের কর্মীদের মধ্যে মাঠে ময়দানে সংঘাতের কারণে যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছিল ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন হলে তেমন কোন ফায়দা পাওয়া যেত কিনা তাতেও সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির মধ্যে একটা গোপন বুঝাপড়া ছিল।

চতুর্মুখী লড়াইয়ে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেল ১৪৩, বিএনপি পেল ১১৬, জামায়াতে ইসলামী পেল ৩। আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার ভয়ে শেষ মুহূর্তে জামায়াতে ইসলামীর অনেক ভাসমান ভোট বিএনপি পেয়ে যাওয়ায় ক্ষমতায় না গেলেও একটা সম্মানজনক আসন পেল। নির্বাচন ঘনিয়ে আসলে সাধারণত ক্ষমতার লড়াইয়ে যারা মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের দিকেই নিরপেক্ষ সাধারণ ভোটাররা ঝুকে পড়ে। তাছাড়া জামায়াত সমর্থিত ভোটাররা আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াতের মিলে-মিশে আন্দোলন করাটা পছন্দ করেনি। ডানপন্থী ভোটারের বেনিফিটটা তাই বিএনপির পকেটেই চলে গেল। জাতীয় পার্টি ও বামপন্থীদের সমর্থনে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলো। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ আসনের অভাবে সংবিধান পরিবর্তন করতে না পারলেও দেশে জুলুম-নির্যাতন, অনৈসলামী কার্যকলাপ, আলেম-উলামা এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের উপর জুলুম নির্যাতনের কারণে পাঁচ বছরের শাসন আমলের শেষের দিকে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় ধস নামে। তাদের নির্যাতনের কারণে জামায়াত, বিএনপিসহ ইসলামী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়।

২০০১ সালের নির্বাচন এবং জোট সরকারের ক্ষমতায় আরোহণ

জামায়াত, বিএনপিসহ কয়েকটি ইসলামী দল এবং জাতীয় পার্টির একাংশের সমন্বয়ে ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী আসন পেয়ে সরকার গঠন করে, জামায়াতে ইসলামীকে দেয়া হয় দু'টি মন্ত্রীত্ব। কৃষি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। চারদলীয় জোটের প্রথম বছরটা ভালই চলে। পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল চমৎকার।

জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এক বছরে দুর্নীতিবিহীন এবং স্বচ্ছ ও নিষ্ঠাবান দক্ষ মন্ত্রণালয় হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এতে বিএনপির ভেতরের দুর্নীতিপরায়ণ সেক্যুলার-বামঘেষা কিছু মন্ত্রীও ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। তারা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কুমন্ত্রণা দেন যে, বাংলাদেশের জনগণের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী কৃষকদের মধ্যে নিজামী সাহেব জনপ্রিয় হয়ে গেলে বিএনপি'র ভোট শেষ পর্যন্ত জামায়াতের দিকে চলে যাবে। অতএব তাকে কৃষি থেকে এমন কোন মন্ত্রণালয় দেয়া হোক যেখানে সফল হওয়া খুবই কঠিন। তাদের পরামর্শ মোতাবেক বেগম খালেদা জিয়া মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মন্ত্রণালয় পরিবর্তন করে রুগ্ন মন্ত্রণালয় হিসাবে পরিচিত শিল্প

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন। এই মন্ত্রণালয়টি খুব কম সময়ই লাভের মুখ দেখেছে। বরং বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে অধিকাংশ সময়ই ভর্তুকি দিয়ে চালাতে হয়েছে। কিন্তু নিজামী সাহেবের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সেই মন্ত্রণালয়ে শতকরা ৬ ভাগের বেশী লাভের মুখ দেখতে পেয়েছে। এখানেও তাকে ব্যর্থ করার গোপন ষড়যন্ত্র কম চলেনি। কিন্তু মহান আল্লাহর মেহেরবানিতে সকল গোপন ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ও সৎ ও দুঃস্থ মানুষের জন্য সত্যিকার একটি কল্যাণকর মন্ত্রণালয় হিসাবে ব্যাপক সুনাম অর্জন করে। জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ সৎ ও পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান মন্ত্রী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠজন, আত্মীয়-স্বজন এবং অধিকাংশ মন্ত্রী ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। তবে প্রায় সকল ধরনের মিডিয়া ভারতীয় ও পশ্চিমা ঘেঁষা এবং ইসলামবিদ্বেষী হওয়ার কারণে দুর্নীতি যা হয়েছে তা অনেকগুণ বাড়িয়ে প্রচার করেছে। সরকারে থেকেও চারদলীয় জোট তার মোকাবেলা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি বিএনপির লোকেরা যেসব মিডিয়ার মালিক সেসব মিডিয়াও উপযুক্ত জবাব দেয়নি। এর অন্যতম কারণ ছিল ঐসব মিডিয়ায় আদর্শিক কমিটমেন্ট না দেখে আত্মীয়-স্বজন তা যতই মুসলিম ও ইসলামবিদ্বেষী এবং ভারতঘেঁষা হোক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। সময়মত তারা তাদের প্রভুদের খেদমত ঠিকমতই করেছে। সর্বনাশ হয়েছে চারদলীয় জোট সরকারের।

বড় সর্বনাশ হয়েছে বিভিন্ন প্রশাসনে। অর্থসম্পদের বিনিময়ে প্রমোশন এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রমোশন ও পোস্টিং পেয়েছে আওয়ামী ঘরানার অফিসাররা। ইসলামপন্থী ও জামায়াত সমর্থক প্রায় সকল অফিসারকেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আওয়ামী সমর্থক অফিসাররা পুলিশ প্রশাসনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে বসার পর অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলেছে। ক্ষমতার শেষের বছর সরকারের অধিকাংশ নির্দেশ ময়দানে পালন করা হয়নি।

সবচাইতে বড় সর্বনাশটি করলেন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল মঈন-উ-আহমদকে সেনা প্রধানের দায়িত্ব দিয়ে। ৮ জন জেনারেলকে ডিঙ্গিয়ে একাজ করাতে তারা হলেন ক্ষুব্ধ। সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ দেখা দিল। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় এ পদের জন্য জেনারেল মঈন অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন। যে অর্থের জোগান দিয়েছে ভারতের RAW এবং ইসরাইলের মোসাদ। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্য RAW এবং মোসাদ-এর মধ্যে প্রায় ১২/১৩ বছর আগে এক সমঝোতা চুক্তি হয়। সে চুক্তি মোতাবেক ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার অত্যন্ত চৌকস একটি বাহিনী ভারতে অবস্থান করছে। হেডকোয়ার্টার দিল্লি হলেও কার্যতঃ এখন তাদের হেডকোয়ার্টার কোলকাতায়। এজেন্ডা এখন বাংলাদেশ।

ষড়যন্ত্রের ১/১১ ও নির্বাচন এবং তার ফলাফল

ঘনবসতিপূর্ণ ছোট্ট অথচ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান বাংলাদেশকে যারা হিংসার চোখে দেখে তাদের কুদৃষ্টি পড়লো বাংলাদেশের উপর। এত হরতাল, অবরোধ, অস্থিরতার মধ্যেও যে দেশের অর্থনীতির চাকা শুধু সামনের দিকে, ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শ মজবুত হওয়ার দিকে, তারা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আর চলতে দিবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হলে যতদূর সম্ভব চারদলীয় জোটই ক্ষমতায় আসতো। আর তা না হলেও বিরোধী দলে যেতে হলে তারা জোটগতভাবে কমপক্ষে ১৩০/১৪০ সিট পেত। আওয়ামী জোট ১৬০/১৭০ সীট পেয়ে ক্ষমতায় গেলে সরকারি ও বিরোধীদল শক্তিশালী থাকলে পার্লামেন্ট ভারসাম্য পেত। গণতান্ত্রিক অবস্থা প্রাণবন্তভাবে অগ্রসর হতো।

কিন্তু ভারত ও পশ্চিমা দেশগুলোর অধিকাংশই বাংলাদেশকে একটি আলট্রা সেক্যুলার অস্থির দেশে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ব্যাপারে আমেরিকা ও ইউরোপে বহু সেমিনার-সিম্পোজিয়ম এবং পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও হয়েছে। আওয়ামী লীগ যেহেতু জন্ম থেকেই সেক্যুলার- বিশেষ করে বর্তমান নেতৃত্ব এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিতে আরো বেশী সেক্যুলার, তাই যে কোন মূল্যে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার জন্য সাময়িকভাবে জরুরি অবস্থার আড়ালে অঘোষিত সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে বিএনপি ও জামায়াতকে দুর্বল করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

নির্বাচনের ৬/৭ মাস আগ থেকেই বিদেশী রাষ্ট্রদূতেরা ভিয়েনা কনভেনশনের যাবতীয় নিয়মনীতি ভঙ্গ করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। Tuesday ক্লাবের নামে বাংলাদেশের ভবিষ্যত নিয়ে একসাথে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। কেয়ারটেকারের সরকারের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ বিচারপতিকে বিতর্কিত করার জন্য জঘন্য প্রচারণা চালায়। সহযোগী হিসাবে পায় এদেশের মিডিয়াগুলোর অধিকাংশকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে কেয়ারটেকার সরকারের দায়িত্ব না নেয়ার জন্য তার বাড়িতে গিয়ে শাসিয়ে আসে। যে অথর্ব কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হয় তারা কোন কাজ না করে ডায়ালগের প্রহসন চালাতে থাকে। নির্বাচন কমিশনকে দারুণভাবে বিব্রত ও অপদস্থ করা হয়। ফলে নির্বাচনের পরিবেশ ধ্বংস হয়। পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক জানুয়ারী মাসের ১১ তারিখ নির্বাচন স্থগিত করে জেনারেল মঈন-উ-আহমদের নেতৃত্বে তিনবাহিনী প্রধান জোরপূর্বক দুর্বল ও অসুস্থ প্রেসিডেন্টকে দিয়ে জরুরি অবস্থা জারী করায়। মূলত: ক্ষমতা থাকে জেনারেল মঈনের হাতে। প্রধান উপদেষ্টাসহ সব উপদেষ্টা নিয়োগ এবং নির্বাচন কমিশন তারই নির্দেশে পুনর্গঠিত হয়।

এরপর শুরু হয় ধরপাকড়। অর্থনীতি পঙ্গু করার জন্য ব্যবসায়ীদের উপর চলে জুলুম নির্যাতন। কোন কোন ব্যবসায়ী মোটা অংকের ঘুষ দিয়ে জরুরি সরকারের জুলুম থেকে কোনক্রমে রেহাই পান। কিন্তু যারা দিতে অস্বীকার করেন তাদের জেল থেকে

রিমান্ডে, রিমান্ড থেকে আবার জেলে-এভাবেই চলতে থাকে। বিএনপি আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। শত খোঁজাখুঁজি করেও যখন জামায়াতের দু'জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেল না, তখন ভারতপন্থী তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং জেনারেল মঈন নিজে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকে সামনে এনে এদের এবং অন্যান্য ইসলামী ব্যক্তিদের যুদ্ধাপরাধী বলে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। সেই থেকে ঐ অপপ্রচার এখনও চলছে। খালেদা-নিজামীসহ বিএনপি ও জামায়াত নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হয় ব্যক্তির ভাবমর্যাদা নষ্ট এবং পার্টিকে দুর্বল করার জন্য। আর হাসিনাকে একবার গ্রেফতার আবার ছেড়ে দেয়া, বিদেশে যেতে বাধা দেয়া, আবার যেতে দেয়া, আসতে বাধা দেয়া আবার আসতে দেয়া-এসব নাটক করা হয় তার ভাবমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

এতকিছু করেও আওয়ামী লীগকে সংবিধান পরিবর্তনের যোগ্য করে ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে শেষ পর্যন্ত শতকরা ২০ ভাগ ব্যালট অতিরিক্ত ছাপিয়ে তা আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যবহার করে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতাসহ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনা হয়। এ কাজ করতে গিয়ে কোন কোন ভোটকেন্দ্রে শতকরা একশত ভাগের বেশী ভোটও পড়ে। জেনারেল মঈন ভারত ও ইসরাইলের পক্ষ থেকে যে এজেন্ডা নিয়ে এসেছিলেন তা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়ে সার্থকভাবে বাস্তবায়ন করে বিনা বাধায় চলে গেলেন।

আওয়ামী শাসনের এক বছর

মেজর জেনারেল মঈন চার তারকাবিশিষ্ট জেনারেল হয়ে বিস্তর অর্থসম্পদ নিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়ে চলে গেলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলীয় নেতাদের অপদস্থ করলেও তিনি জেনারেল মঈন এবং তার সহযোগীদের বিচার করতে রাজি নয়। জরুরি আইনে দেয়া নিজের এবং দলের সকলের মামলা তুলে নিলেও সরকার বিএনপি এবং চারদলীয় জোটের কারো মামলা তুলতে রাজি নয়। এমনকি তিন তিনবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর মামলাও নয়। প্রশাসনে তাদের দলের অন্ধ সমর্থক ছাড়া বাকি অর্ধসহস্রাধিক অফিসারকে ওএসডি, অব্যাহতি অথবা কম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বদলি, বিচারব্যবস্থা থেকে সামরিক বাহিনীতে পর্যন্ত নির্লজ্জ দলীয়করণ এসবই এই সরকারের অবদান।

আইন-শৃংখলার চরম অবনতি, সকল রেকর্ডভঙ্গ করে একটি নির্বাচিত সরকারের লক্ষাধিক লোককে জেলে ঢুকানো, সরকারি নিয়মভঙ্গ করে কোটি কোটি টাকার কাজ টেন্ডার ছাড়াই দলীয় লোককে দেয়া, দলের মধ্যেও এ নিয়ে খুনাখুনি করে এ বছর প্রায় অর্ধশত নেতাকর্মী খুন হওয়া, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীদের উপর বেপরোয়া জুলুম-নির্যাতন, খুন, বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ সবই চলছে। এমনকি হিজাবধারী মহিলারা পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না। পিরোজপুর জেলার তিন মহিলা কর্মীর

উপর নির্যাতন, জেল ও রিমান্ডে নেয়া তার জঘন্য উদাহরণ।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম মানুষের নাগালের বাইরে। ১০ টাকায় খাওয়ানোর ওয়াদার চাল এখন ৩২ টাকা, ৫০ টাকার ডাল এখন ১৩৫ টাকা, পেঁয়াজ ৪০ টাকা, রসুন ১১০ টাকা, ১৮ টাকার আটা ৫০ টাকা, ৩৬ টাকার চিনি ৫৫ টাকা। সাধারণ জনগণ যে কি নিদারুণ কষ্টে আছে তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। এখন প্রচন্ড শীত। পুরানো গরম কাপড়ের দামও অন্য যে কোন বছরের চেয়ে বেশী। ইতোমধ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলে কিছু লোক শীতে মারা গেছে। শীত আরো বাড়লে কি হবে আল্লাহই জানেন।

ক্ষমতায় আসার আগে ১০ টাকায় চাল, বিনামূল্যে সার দেয়ার ওয়াদা ভুলে গিয়ে গোটা বছর বর্তমান সরকার শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন আর দলীয়করণের কাজেই কাটিয়ে দিল। নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করে আমাদের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরাপুরি ধর্মহীন করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কোন ধর্মীয় শিক্ষা থাকবে না। পরবর্তী পর্যায়ে ঐচ্ছিক। মাদ্রাসা শিক্ষায় কোরআন-হাদীস ফিকহ্ এর নম্বর কমিয়ে সাধারণ শিক্ষার বিষয়গুলিতে নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ স্কুলে শিশুদের জন্য অতি ভোরে সময় নির্ধারণ বাড়িতে সকালে কুরআন শিক্ষার যে ব্যবস্থা পারিবারিকভাবে অথবা মসজিদে চালু ছিল তাও শেষ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা কার্যকর হলে আগামী প্রজন্ম মাত্র ১০/১৫ বছর পর ইসলামের সাথে পুরাপুরি অপরিচিত হয়ে পড়বে। একটা জাতিকে আদর্শবিহীন করে ধ্বংস করার যে ষড়যন্ত্র তা আমাদেরকে চোখের সামনেই দেখতে হচ্ছে। প্রতিবাদ মিছিল করতে গেলে অমানসিকভাবে লাঠিপেটা করে তা ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হচ্ছে। এমনকি বড় কোন হলে সভাসমাবেশ করার অনুমতি পর্যন্ত মিলছে না।

এ সরকার সংবিধান সংশোধন করে তা পুরাপুরি সেক্যুলার করে ৭২ এ ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এটা করে ফেললে সংবিধানে বিসমিল্লাহ থাকবে না, আল্লাহর উপর অটল আস্থা ও ঈমান উঠে যাবে, রাষ্ট্রধর্ম সংবিধান থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ আবার সেই ৭২/৭৩ সালের অন্ধকারে আমাদেরকে জাতিগতভাবে ফিরে যেতে হবে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে সব ইসলামী রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডায়েরি পর্যন্ত করা হয়নি, স্বাধীনতা পরবর্তী সবচাইতে ক্ষমতাধর সরকারের আমলে যেসব নেতাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ তো দূরের কথা, মামলা পর্যন্ত করতে পারেনি, তাদেরকে এখন টার্গেট করা হয়েছে যুদ্ধাপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য। নতুন আইন তৈরি করা হচ্ছে, এমনকি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার করার জন্য স্থান পর্যন্ত ঠিক করা হয়েছে। জনগণের মাঝে কোন সাড়া না থাকায় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিকে আবার চাঙ্গা

করা হচ্ছে, তথাকথিত সেক্টর-কমান্ডারস ফোরাম তৈরি করা হয়েছে সরকারের প্রতি প্রেশার তৈরি করার জন্য যাতে মানুষকে দেখানো যায় এটা গণদাবী। এসবই করা হচ্ছে সরকারি ছত্রছায়ায় আর ভারতীয় এবং ইহুদিদের টাকায়। আর মিডিয়া তো আছেই প্রচারের জন্য। এসব কিছুর মূল টার্গেট হলো দেশকে ইসলামী নেতৃত্বশূন্য করা অর্থাৎ ইসলামশূন্য করা।

ভারতমুখী পররাষ্ট্রনীতির উপর চলার কারণে সরকার পুরাপুরি বন্ধুহীন হয়ে পড়েছে। এমনকি সরকারি অনেক অযৌক্তিক কর্মকান্ডে সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে আমেরিকা এবং ইউরোপেরও তেমন উৎসাহ নেই। নির্লজ্জ দলীয়করণ ও দুর্নীতির কারণে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফও সাহায্য দিতে অনীহা প্রকাশ করেছে। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড একদম বন্ধই হয়ে আছে।

সরকারের কথার সাথে কাজের এবং বাস্তবতার কোন মিল নেই। জনমনে ক্ষোভ বাড়ছে। জনগণের দুর্ভোগ আরো বাড়লে এবং ভারতের সাথে কোন চুক্তি যদি প্রধান মন্ত্রীর আসন্ন সফরে ভারতের সাথে সম্পাদিত হয় তাহলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে।

বাংলাদেশের উপর খবরদারি করতে করতে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দুর্বল করার ইচ্ছা ভারতের বরাবরই ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালে চাপের মুখে তৎকালীন প্রবাসী সরকারের সাথে যে ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তির খসড়া হয়েছিল তাতে বাংলাদেশের কোন সেনাবাহিনী এবং স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি না থাকার উল্লেখ ছিল। এই ধারা দুটো দেখে চুক্তিতে সই করতে গিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বেঁহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তা বাস্তবায়িত হয়নি। আওয়ামী লীগের মত একটি নতজানু দলের সরকার পেয়ে ভারত সেই আকাঙ্খা পূর্ণ করতে চাচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথমই ভারত টার্গেট নেয় আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল করার। এই হীন উদ্দেশ্যেই ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বিডিআর হেডকোয়ার্টারে তথাকথিত বিদ্রোহের নামে অনেক চৌকস সামরিক অফিসারকে হত্যা করা হয়। কয়েক দফায় খোঁজাখুঁজি করার পর এ পর্যন্ত ৬১ জনের লাশ পাওয়া গেছে। দুইদিন ধরে বিদ্রোহ চললেও তৎকালীন সেনাপ্রধান প্রধানমন্ত্রীর কাছেই উপস্থিত ছিলেন। সেনাসদরে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে যারা আবেগ জড়িত কণ্ঠে নিষ্ঠুর নির্যাতনের কথা এবং তাদের পরিবারের উপর পাশবিক নির্যাতন ও বর্ণনার করে তার উপযুক্ত বিচার চেয়েছিলেন তাদের প্রায় সকলেই হয় বরখাস্ত অথবা বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে যারা বাইরে থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, তাদের মধ্যেও অনেককে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে। শুনা যাচ্ছে ইসলামপন্থী বলে যারা পরিচিত তাদের সকলকেই সেনাবাহিনী থেকে বিদায় করার তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে।

এটা এখন বাংলাদেশের সচেতন নাগরিকদের কাছে পরিষ্কার যে, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একেবারে দুর্বল করার এই ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক ভারত। সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন সরকারের একটি অংশ। সামরিক কৌশলের সাথে জড়িত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকী এবং তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন উ আহমদ। এই জঘন্য হত্যাকান্ডের ফলে প্রতিরক্ষার জন্য অগ্রবর্তী বাহিনী বিডিআর এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে যে আস্থার সংকট ও দূরত্ব তৈরি হয়েছে তা সহজে দূর হওয়া কঠিন। এখন বিচারের নামে প্রহসন করে অপেক্ষাকৃত কমদোষী বা নির্দোষ বিডিআর সদস্যদের শাস্তি দিলে অবস্থার আরো অবনতি হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ ঘটনার মূল দোষী যেসব বিডিআর সদস্য এবং যারা জানতেন ঘটনার রহস্য তাদের প্রায় সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদের নামে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে।

পাকিস্তান ও চীনের ভূমিকা

পাকিস্তানের পক্ষে বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করা কঠিন। কারণ বিষয়টি স্পর্শকাতর। চীনের ভূমিকাটা অনেকটাই অভিমানসুলভ। কারণ চারদলীয় জোট সরকারের তৃতীয় বছরে তাইওয়ানকে ঢাকার গুলশান এলাকায় কনস্যুলেট খোলার সুযোগ দেয়ায় চীন বাংলাদেশের প্রতি ক্ষুব্ধ। বিগত সরকারের আমলের শেষের দিকে চীনের সাথে আগে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তাতে কিছুটা চিড় ধরে। আর বর্তমান সরকার তো ভারতপন্থী হওয়ার কারণে চীনের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার আশা কম। ইতিমধ্যে মিয়ানমারকে (বার্মা) দিয়ে বাংলাদেশকে একহাত দেখিয়ে দেয়ার পদক্ষেপ চীন প্রায় নিয়ে ফেলেছিল। কূটনৈতিক সূত্রে যতটা জানা যায় তাতে পাকিস্তানের অনুরোধে চীন মিয়ানমারকে সে পদক্ষেপ নিতে দেয়নি। কূটনৈতিক সূত্রে আরো জানা যায় যে পাকিস্তানকে দিয়ে একাজ করানোর ব্যাপারে সৌদি প্রিন্স His Royal Highness জনাব নায়েফের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

তাছাড়া চীন বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে নাক গলানোর পরিবর্তে নিজের অর্থনীতিকে মজবুত করার দিকেই বেশী নজর দিচ্ছে। বিশ্ববাজার দখল করাই তার মূল টার্গেট। সম্প্রতি দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থায় বিশ্বরাজনীতিতে অতিরিক্ত জড়িয়ে পড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিণতি দেখে চীন মনে করছে তার অর্থনীতি চাঙ্গা করাই প্রথম কাজ। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ আয়তনের দেশ রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রযুক্তিতে মজবুত হলে পরে স্বাভাবিকভাবেই তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

আমেরিকা ও ইউরোপের ভূমিকা

ইউরোপের বর্তমান ভূমিকা কিছুটা দুর্বল হলেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা বিশেষ করে বৃটিনের ভূমিকা ছিল খুবই শক্তিশালী। কিন্তু

মানবাধিকার লংঘন, পার্লামেন্টে বিরোধীদলকে মর্যাদা না দেয়া এবং বিরোধীদলের উপর দমননীতি চালানোর কারণে বর্তমান সরকারকে অন্ধভাবে সমর্থন দান তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকা অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের বন্ধুত্ব গভীর থাকলেও একটা বিশেষ ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো আছে। তা হলো চীনকে মোকাবিলা করার জন্য ভারতের শক্তিশালী হওয়া দরকার, কিন্তু এতটা শক্তিশালী যাতে হয়ে না পড়ে তাতে খোদ যুক্তরাষ্ট্রকেই চ্যালেঞ্জ করে বসে এমন অবস্থায় যেতে দিতে নারাজ।

তাই বাংলাদেশে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকে দুর্বল করে ভারতের ইচ্ছা পূরণ করা, বাংলাদেশের উপর দিয়ে করিডোর পেয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করার সহজ রাস্তা পাওয়া, ইত্যাদি ব্যাপারে মনে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৃদু আপত্তি আছে, তবে খোলাখুলি বাধা দেয়ার মত অবস্থানে নেই। আর বাংলাদেশের মত একটি নতজানু সরকার এই বিরোধ কাজে লাগিয়ে নিজের দেশের অবস্থান মজবুত করার যোগ্যতা রাখে না। বিশেষ করে কূটনৈতিক দক্ষতা ও যোগ্যতায় একেবারেই অযোগ্য একজন মহিলা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সরকার দায়িত্ব দিলে একাজ করা আরও সম্ভবপর নয়।

সৌদি আরবসহ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা

বিশ্ব দরবারে ইসলামের শত্রুরা কিছু বিতর্কের সৃষ্টি করলেও মুসলিম উম্মাহ এখন মক্কাকে তাদের আধ্যাত্মিক রাজধানী মনে করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সাদা-মাটা দিলের মুসলমানগণ সৌদি আরব আর ইসলামকে এখনও এক করেই দেখে। এই আধ্যাত্মিক যোগসূত্র ছিন্ন করার জন্য ভারত ও বর্তমান সরকার অব্যাহতভাবে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। আল্লাহ না করুন তাদের এই ষড়যন্ত্র সফল হলে মুসলিম দুনিয়া থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ১৫ কোটি মানুষের একটি দেশ যার চার দিকে শক্তিশালী মুশরিক রাষ্ট্র-তার অবস্থা কি হবে আল্লাহই জানেন।

সৌদি আরব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে পাকিস্তান, চীন, মিয়ানমার, উত্তর কোরিয়া এবং বাংলাদেশকে নিয়ে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় নিয়ে আসতে পারলে এখানকার মুসলমানরা কিছুটা নিরাপদবোধ করতে পারে। আর যদি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যকে আলাদা করতে পারা যায় তাহলে ভারতের সাথে আমাদের শত্রু-সীমানা অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও আমাদের কিছুটা স্বস্তি আসতে পারে। ভারতের ৭টি রাজ্য সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে সংগত কারণেই ভারতের সাথে তাদের সম্পর্ক ভাল থাকবে না। তাদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থেই বাংলাদেশের সাথে অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ভাল সম্পর্ক গড়তে হবে। বাংলাদেশের জন্য উত্তম বিনিয়োগের ক্ষেত্র হবে ঐ নতুন রাষ্ট্রটি। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি অতি দ্রুত উন্নতিলাভ

করবে। আর এখানে সৌদি আরবসহ ধনী মুসলিম রাষ্ট্রগুলি যদি ইসলামের মহানবাণী আর সেবামূলক কাজে বিনিয়োগ করে তা হবে ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী সমাধান।

আরেকটি কাজে সৌদি আরব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে। সৌদি আরবে শিক্ষিত যেসব নির্ভেজাল সহীহ তৌহিদপন্থী আলেম এখানে আছেন, যাদের সংখ্যা অর্ধ সহস্রেরও বেশী। তাদের মধ্যে যারা দ্বীনের দাওয়াতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন তাদের মধ্য থেকে কমপক্ষে দুই ডজন মেধাবী আলেমকে দেশের সেরা আলেমে পরিণত করার জন্য সহযোগিতা করা। তৌহীদপন্থী আলেম হিসেবে কমপক্ষে ইসলামের নাম নিয়ে যারা এ দেশের মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলার চেষ্টা করছে সেই ফিতনা থেকে জাতিকে উদ্ধার করার কাজে ঐসব আলেমগণ যোগ্য আলেম গড়তে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

ভারত দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে বুদ্ধিজীবী, চৌকস সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশায় এ ধরনের লোক তৈরি করেছে। তারা এখন অতি বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার সাথে ভারতের পক্ষে দালালি করছে। এ ক্ষেত্রে সৌদি আরব এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের একটি বিকল্প গোষ্ঠী তৈরি করা দরকার।

সাংস্কৃতিক বা কালচারাল অঙ্গনে ভারতীয় হিন্দু ও মোশরেকি কালচারের প্রচারণা বিভিন্ন নোভেল- নাটক, সিনেমা, গানসহ নানা ক্ষেত্রে অত্যন্ত জোরদার। এ ক্ষেত্রে বিকল্প শক্তি না তৈরি করলে বাংলাদেশের মুসলিম স্বাতন্ত্র রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ওআইসি একটি শক্তিশালী মিডিয়া তৈরি করে মুসলিম উম্মাহর মহান খেদমত করার উদ্যোগ নিতে পারে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই দুর্বল। মিয়ানমারের মাত্র ২৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার যে সমরশক্তি সে তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পেছনে। এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের সহযোগিতা না করলে অন্যদেশের আক্রমণ তো দূরের কথা নিজ দেশে শত্রুদের দ্বারা সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ চরম বিশৃঙ্খলা দমন করাও কঠিন হবে। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা গৃহযুদ্ধে রূপ নিলে দেশ মহাসঙ্কটে পতিত হবে। তখন অস্তিত্ব নিয়েই টান পড়বে।

ঝুলিও কুড়ি

দৈনিক সংগ্রাম, ৮ মার্চ, ১৯৮০

বেশ কয়েক বৎসর আগের কথা। ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে। চারিদিকে বেশ ধূমধামের সাথে শোষিতের গণতন্ত্র কায়েম করার পায়তারা চলছে। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাবের ব্যক্তিত্বের প্রচারণা তখন চরমে।

হবু গভর্ণরদের ঢাকায় ভীষণ আনাগোনা। আমিও ভাবছিলাম শোষিতের গণতন্ত্র কায়েমের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবে অংশগ্রহণ করার জন্যে। বেশ কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকে অনুরোধও পেলাম জনগণের খেদমত করার। অপূর্ব সুযোগটা যেন হাতছাড়া না হয় তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

একদিন নাজিরাবাজার মোড়ের ছোট্ট একটি রেষ্টুরেন্টে বসে কয়েক বন্ধু মিলে চা খাচ্ছিলাম। দেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী চায়ের রেষ্টুরেন্টগুলোই রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার জন্য উত্তম জায়গা। আমরাও সে সুযোগ হাত ছাড়া না করে দু'-এক মিনিটেই রাজনৈতিক আলাপে মনোযোগ দিলাম। পাশের বন্ধুটি বললো, "দেখ, আর ইতস্তত করে লাভ নেই। দ্বিতীয় বিপ্লবে মহান নেতার নেতৃত্বে শোষিতের গণতন্ত্র কায়েমে লেগে পড়। বিশ্বশান্তি পরিষদ যাকে জুলিওকুরি উপাধিতে ভূষিত করেছে তার নেতৃত্বে শান্তি কায়েম হওয়ার ব্যাপারে আর সন্দেহ কেন?" উত্তরে আমিও জুলিওকুরি উপাধি সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলাম। বন্ধু জুলিওকুরি পুরষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা শুরু করলো। পাশে পুরানা ঢাকার অধিবাসীদের দু'জন বসে চা পান করছিলেন। দু'জনই বেশ বয়স্ক লোক। আমাদের আলাপ-আলোচনা শুনেই তাদের হাসি-তামাসা বন্ধ হয়ে গেল। একজন আমাদের দিকে ঘুরে একটু মৃদু হেসে বললো,

"ছাব, রাজনীতি তো করেননি- বি-আলায়, জুলিওকুরির অর্থ-ভি জানেন না। আমরা ছোজা বুঝ বুঝি। জুলিওকুরির মানে অইল, 'ঝুলিওকুড়ি।' লাফঝাঁপ যাই কর না কেন, ইন্দিরা কইছে, কুড়ি বৎসর ঝুইলা থাকবি। চুক্তি করছি পঁচিশ বছরের, আলায় গেছে মোটে পাঁচ বছর। এখনও কুড়ি বছর বাকী।"

বৃদ্ধের কথার সাথে সাথে রেষ্টুরেন্টে হাসির রোল পড়ে গেল। বন্ধুটির তো হাসতে গিয়ে চা তালুতে উঠে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। আমাদের হাসিতে শুধু একজন মধ্যবয়সী লোক অংশগ্রহণ করলেন না। তিনি বেশ ধীর গতিতে রেষ্টুরেন্টের এক কোণা থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। স্বরটা একটু গম্ভীর করে বললেন, "আপনারা এ সমস্ত কথা যেখানে সেখানে আলাপ করবেন না, বিপদে পড়বেন। দেশটা কোনদিকে যাচ্ছে একটু খেয়াল করে কথা বলবেন।" বলেই ভদ্রলোক রেস্তোরা থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। রেস্তোরার ম্যানেজার বললেন, "ছার উনি আইবির লোক।"

তারপর অনেকদিন গত হোল। দেশে ক্ষমতারই শুধু হাত বদল হয়নি, বরং শোষিতের গণতন্ত্রের স্বাদ তিলে তিলে ভক্ষণ করে সেদিনের মহাক্ষমতাধর ব্যক্তি তার অতি নিকটাত্মীয় সহ নিহত হয়েছেন। তারপর তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ছিলেন তারাও নিহত হয়েছেন। কিন্তু সেই পঁচিশ বছরে দাসখতের কোন পরিবর্তন হয়নি। চুক্তির একটা বিরাট অংশ নাকি গোপনে সম্পাদিত হয়েছে। তারও কোন হদিস জনগণের জানা নেই। শেখ মুজিবের নিহত হওয়ার অব্যবহিত আগে নোয়াখালী জেলার সীমান্তে একখানা ভারতীয় বিমান বিধ্বস্ত হয়। সেই বিমানে নাকি ভারতের কাছে চূড়ান্তভাবে দাসখতের সমস্ত গোপন কাগজপত্র ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের পর এ গুজবটি প্রায় মুখে মুখে উচ্চারিত হতো।

ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে চুক্তি রয়েছে অনুরূপ চুক্তির বলেই সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করে নিলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইচ্ছা করলে ভারতের কোন স্বল্পকালীন ক্ষমতা দখলকারীর ডাকেও অনুরূপ সাড়া দিতে পারে। অনুরূপভাবে ভারতও বাংলাদেশের উপর যেকোন সময় চড়াও হতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তো কোন সুযোগকেই কখনও হাতছাড়া করেনি। চেকোশ্লোভাকিয়া হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার আগ্রাসী অভিযান চালিয়ে সে দেশের জনগণের উপর চিরদিনের গোলামীর পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় ষ্ট্যাটেজী হোল পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কিছু বরকন্দাজ সৃষ্টি করা যাতে এ বরকন্দাজই তার পক্ষ থেকে ছোট ছোট আগ্রাসী ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। কিউবার মত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জন্যও তার কমপক্ষে দুটো বরকন্দাজ প্রয়োজন। এ অঞ্চলে যতগুলো রাষ্ট্র আছে তার মধ্যে পরাশক্তির বরকন্দাজ হওয়ার দৃঢ় আকাংখা রয়েছে ভারতের। তাছাড়া জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে সে ভূমিকা পালন করার মত সুবর্ণ সুযোগ তার রয়েছে।

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সিকিম হজম করে সে তার নগ্নপরিচিতি বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করেছে। এখন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে কোন গ্রুপ বা দল একটু আনুষ্ঠানিক অনুরোধের ব্যবস্থা করলেই তিনি অন্যের স্বাধীনতা (?) রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। ডাক দেওয়ার লোকেরও অভাব নেই। শুধু সময় ও সুযোগের ব্যাপার মাত্র।

আশেপাশের ঘটনাপ্রবাহ দেখেও কি আমাদের টনক নড়বে না? এখনও কি ব্যাপারটা গভীরভাবে তলিয়ে দেখার অবকাশ হয়নি? একদিকে সরকারী দলের মন্ত্রী, উপমন্ত্রী প্রমুখ সবাই প্রকাশ্য জনসভায় রুশ ভারতের দালালদের উৎখাত করার গলাবাজীতে সকলকে হার মানাচ্ছেন। অপরদিকে সে সমস্ত দেশের মহারথীর আগমন করলে তাদের মনোযোগের জন্য রাজপথে টাঙ্গানো কোরানের আয়াত অপসারণ করছেন। এই বিস্ময়কর বৈপরিত্যের মর্ম জনগণ বুঝার জন্য আজ বড়ই ব্যাকুল। ব্যাকুল এই জন্য যে, তারা জানতে চায় লম্ফঝম্ফ যতই করি আরও ষোল বৎসর কি ঝুলেই থাকতে হবে?

"ইয়ে ভি বাংলাদেশ তরীকা হ্যায়"

দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ মার্চ, ১৯৮০

গত জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাসের দিকে বায়তুল মোকাররম থেকে সরদঘাট যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। খোঁজ করছিলাম রিকশার। হঠাৎ পেছন থেকে এক তরুণ রিকশাওয়ালা এসে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন স্যার? বললাম সদরঘাট। ছেলেটি বললো, চলেন স্যার। জিজ্ঞেস করলাম ভাড়া কত উত্তরে বললো যেমন দিয়ে থাকেন। কথাবার্তার ধরনে মনে হোল ছেলেটি কিছু লেখাপড়া জানে। সুতরাং ভাড়া নিয়ে পরে গোলমাল করবে বলে তেমন একটা আশংকা হোল না। মোটামুটি দুই আড়াই টাকায় চুকানো যাবে বলে মনে করে রিকশায় উঠে পড়লাম।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখি একটি সিনেমার পোষ্টার। সিনোমার নাম 'পাগলা রাজা।' ছবিতে রাজার পায়ের কাছে রাণী বসে মন যোগানোর চেষ্টা করছে। আমি সহাস্যে বললাম 'তোমরা তো প্রায়ই সিনেমা দেখে থাকো। পাগলা রাজা বইটি দেখেছ? ছেলেটি বললো স্যার সিনেমা বিশেষ দেখি টেকি না। তবে বোধ হয় অতিসত্বর একটি সিনেমার পোষ্টার দেখতে পাব। সেটা হোল পাগলা সরকার। পাগলা সরকার বেরুলেই দেখতে যাব বলে ভাবছি।' জিজ্ঞেস করলাম, "পাগলা সরকার সিনেমা বের হবে কিভাবে?" ছেলেটি বললো, "স্যার আগামীতে কোন সরকার বর্তমান সরকারের জায়গায় এলেই তারা হয়তো এমনি ধরনের কোন বই বের করে ফেলবে।" জিজ্ঞেস করলাম, বর্তমান সরকারের দোষ ত্রুটি কোথায় দেখলে? উত্তরে ছেলেটি বললো, স্যার আপনি কি লেখাপড়া শিখে একেবারে বোকা হয়ে গেছেন? বললাম কেন? ছেলেটি বলতে থাকলো, "গরীব দেশের সরকার সাহায্য

পেলে কল-কারখানা বানায় যাতে গরীব বেকার মানুষ চাকুরী পায় দেশে উৎপাদন বাড়ে। সারের দাম কমায় যাতে কৃষকেরা বেশী করে সার কিনে ব্যবহার করে। বেশী কারিগরি শিক্ষা দেয়, যাতে লোকেরা তাড়াতাড়ি চাকুরী পায়। কোন চাকুরীর জায়গা খালি হলে এমন লোককে চাকুরী দেয় যাতে বেশী বেশী কাজ পাওয়া যায়। আমাদের সরকার মিল কল-কারখানার পরিবর্তে ফুটপাত বানায় যাতে অনাহারে থাকা গরীব লোকেরা আরামে ঘুমাতে পারে। সারের দাম বাড়ায়, যাতে কৃষকেরা সার ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন না বাড়িয়ে ধনী বন্ধু দেশকে খাদ্য রফতানী করার সুযোগ দেয়। ঘনঘন বিশ্ববিদ্যালয় বানায়, যাতে শিক্ষিত, বেকার লোকেরা আরামে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আর সুযোগমত হাইজ্যাক করে। খালি পোষ্টে বেশী করে মহিলা নিয়োগ করে, যাতে অফিসের ভিতরেই জীবনসঙ্গিনী জুটানোর ফয়সালাটা হয়ে যায়। এমনি সদাশয় দয়ালু সরকারের গুণের কথা এক মুখে আর কত বলবো?"

জিজ্ঞেস করলাম, "কথা শুনে তো মনে হয় লেখাপড়া বেশ জানো তবে রিকশা না চালিয়ে একটা চাকুরী কর না কেন? উত্তরে ছেলেটি বললো, "স্যার এইচএসসি পাস করেছি, তারপর পয়সা কড়ির অভাবে বি,এ-তে ভর্তি হয়েও পড়াশূনা চালাতে পারিনি। পরে অনেকের বুদ্ধিমত টাইপ শিখলাম, যাতে সহজে চাকুরী পাওয়া যায়। কিন্তু বিধি বাম। যেখানেই আবেদন করি, সেখানেই টাইপিষ্ট হিসেবে কিছু মহিলা প্রার্থীও থাকেন। তারা থাকলে আর আমাদের চাকুরী কেমন করে হয় বলুন তো। সমাজ এবং রাষ্ট্র তো তাদেরকে টেনে উপরে উঠানোর জন্য অস্থির। আমাদের দিকে কে তাকায়? তাই চাকুরীর আশা করে লাভ নেই। তাছাড়া হিসেব করে দেখলাম টাইপিষ্টের চাকুরীতে কিছু এদিক সেদিক না করলে মাসে পাঁচশ' টাকার বেশী আর কে দিবে? অথচ রিকশা চালালে মাসে কমপক্ষে এক হাজার টাকা রোজগার করতে পারব।"

এ বছর সেই ছেলেটির সাথে হঠাৎ নিউ মার্কেটের কাছে দেখা। আমি তো চিনতেই পারিনি। সে গড়গড় করে গতবারের ঘটনার কিছু দূর বর্ণনা করতেই চিনে ফেললাম। বললাম কেমন আছ? আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর মর্জি ভাল আছি স্যার। ছেলেটার সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপের পরই মার্কেটে ঢুকে পড়লাম কিছু কেনাটার জন্য। অনেকদিন যাবৎ বাড়ীতে যেতে পারিনি। তাই আব্বা আম্মার সাথে দেখা করতে বাড়ী যাওয়ার আগের কেনাকাটা আর কি!

গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে আমি যে স্কুল হতে এসএসসি পাস করেছি সেই স্কুলে গেলাম পুরানা শিক্ষকদের সাথে দেখা করতে। আমার যারা শিক্ষক ছিলেন তাদের অনেকেই নেই। সহকারী শিক্ষকের একজন এখন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বললেন আগামীকাল স্কুলে একটু আসতে পার। বললাম জি স্যার তবে কেন? তিনি বললেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের উদ্বোধন উপলক্ষে আগামীকাল স্কুলে মহাকুমা প্রশাসক আসার কথা আছে। তাছাড়া থানার সিও সাহেব এবং থানা শিক্ষা অফিসার এরা সকলেই থাকবেন। আমাকে বলেছেন স্থানীয় গণ্যমান্য দু'চারজন

লোককে অনুষ্ঠানে রাখবেন। তাই তুমি যদি আস তাহলে একটু ভাল হয়।

অনুষ্ঠান যথারীতি হোল। কাজের চাপে মহাকুমা প্রশাসক আসতে পারেনি। তাই সিও সাহেবেরও আসার তেমন দরকার হয়নি। শুধু থানা শিক্ষা অফিসার এসেছিলেন। বক্তৃতায় বললেন, সরকার বহু লোককে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজের জন্য চাকুরী দিবেন। তবে তাদের স্বেচ্ছাশ্রমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। বেতন যেটা দেওয়া হবে সেটা তেমন বেশী কিছু নয়। বেশ কিছু বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রও খোলা হবে, যাতে লোকদের মধ্য থেকে আগামী দু'এক বছরের মধ্যেই নিরক্ষরতার অভিশাপ চিরতরে দূর করা যায়। কথাগুলো শুনতে বেশ চমকপ্রদ মনে হোল। সুন্দর বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। কার্যকরী করতে শুধু একটু অসুবিধা। কথাগুলোর এদিক সেদিক চিন্তা করার অবকাশ তখন পাইনি। যথারীতি বাড়ী থেকে আবার শহরে ফিরে এলাম। শহরে এসে দেখি নিরক্ষরতা দূরীকরণের পোষ্টারে সারা শহর ছেয়ে গেছে। শান্তির প্রতীক কবুতর শোভা পাচ্ছে এক পোষ্টারে, অন্য পোষ্টারে একজন সাহেব মানুষ নিরক্ষর বৃদ্ধকে হ্যারিকেনের আলোতে শিক্ষা দিচ্ছেন গভীর মনোনিবেশ সহকারে। হাবভাব দেখে মনে হয় শহর থেকে নিরক্ষতা দূর করতে মাত্র কয়েকটা মাস দরকার। কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যই শুধু কাগজে কলমে সম্ভব?

এত নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র খুলে বেশ কিছু লোককে আধা নিয়োগ করে এ সমস্যার কি সমাধান হবে? যে পরিমাণ টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে, সে টাকা কি অন্য কায়দায় খরচ করলে বেশী কাজ হতো না? দেশে অসংখ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। গড়ে প্রতি দু'টি গ্রামে কমপক্ষে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় তো আছেই। এরপরও আবার কেন্দ্র খুলতে পয়সা খরচ করা হবে কেন? যে সমস্ত শিক্ষক স্কুলে চাকুরী করেন অভাবের তাড়নায় তাদের জীবনই প্রায় ওষ্ঠাগত। যদি তাদের প্রতিজনকে একশত টাকা অতিরিক্ত বেতন দিয়ে রাতের বেলায় এই সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাতে অসুবিধা কিসের? আর শিক্ষক হিসেবে তো যে কোন নতুন লোকের চাইতে তাদের তাদেরই অভিজ্ঞতা বেশী। তাদেরকে অল্পমাত্রায় প্রশিক্ষণ দিলেই তো নিরক্ষরতা দূরীকরণে তারা সার্থক ভূমিকা পালন করতে পারেন। শিক্ষক হিসাবে তাদের মর্যাদা গ্রামবাসীদের কাছে অন্য যে কোন লোকের চাইতে বেশী। তাছাড়া যে লোকদের জন্য এত পরিকল্পনা তাদের ছেলে-মেয়েরাই দিনের বেলা এই শিক্ষকদের কাছে পড়াশুনা করে থাকে। ফলে এই শিক্ষকদের সাথে পূর্ব থেকেই তাদের একটা যোগাযোগের সূত্র আছে। সুতরাং এই শিক্ষকদের দ্বারা নিরক্ষরতা দূর করার অভিযান পরিচালনা করলেই বেশী সাফল্য আশা করা যায়। সব ব্যাপারে নতুন চিন্তা করার খাতিরেই উল্টো চিন্তা করতে হবে, বাকী রাস্তায় চলতে হবে। অথবা কমিশন গঠন করে টাকা খরচের প্লান করতে হবে, যার মাথায় যে বুদ্ধি খেলে না তাকে দিয়ে সে কাজ করানো হবে, হেলিকপ্টারের তেল পুড়িয়ে

প্রেসিডেন্টকে খালে নৌকা ভাসাতে হবে, শ্রমমন্ত্রীকে শিক্ষা সেমিনার উদ্বোধন করতে হবে, পাটমন্ত্রীকে পররাষ্ট্র নীতির উপর কথা বলতে হবে, সামরিক বাহিনী থেকে অবসরের সময়ের পূর্বেই অবসর গ্রহণ করিয়ে যুগ্মসচিব বানাতে হবে, দেশের সামর্থ্য না থাকলেও কমপক্ষে পাঁচ ডজনেরও অধিক মন্ত্রী পুষতে হবে, এ সবের অর্থ কি? যাদের রক্তমাংসে দাগ লাগানো পয়সা দিয়ে এমন নির্ভুলভাবে ভুল পরিকল্পনায় দেশ চালানো হচ্ছে তাদের কি প্রশ্ন করার কোনই অধিকার নেই? অথবা ক্ষমতার দাপটে সাহেব সুবারা কি কোন ব্যাপার চিন্তা করারও সময় পাচ্ছেন না? দেশের সব ব্যাপারেই বারটা বাজতে আর কত দেরী, একথা সবিনয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে আজকে রিকসায় যাচ্ছিলাম বাসার দিকে। সাথে কেউ নেই। তাই চিন্তা করতে করতে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি রিকশাওয়ালা সোজা রাস্তা ছেড়ে কমপক্ষে আধমাইল রাস্তা অতিরিক্ত ঘুরার ব্যবস্থা করেছে। জিজ্ঞেস করলাম, সোজা রাস্তা ছেড়ে এতদূর ঘুরে আসলে কেন? রসিকতাভরে উত্তর দিল, "স্যার, ইয়ে ভি বাংলাদেশী তরীকা হায়।" বাসায় ফিরার সাথে সাথে গিন্নী জিজ্ঞেস করলো, "বুড়ো মানুষের জন্য এমন শাড়ী কিনেছ কেন?" উত্তরে বললাম, "ইয়ে বাংলাদেশী তরীকা হায়।"

আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্মেলন একটি পর্যালোচনা

দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ মার্চ, ১৯৮০

আগেকার রাজা-বাদশাহদের কাহিনীগুলো আজও আমরা বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলি আর মজা করে শুনি। তারা নাকি জনগণকে বোকা বানানোর জন্য বিভিন্ন দফতরে বিভিন্ন বিষয়ে বেশ পারদর্শী মন্ত্রী রাখতেন। মন্ত্রীদের উপস্থিত বুদ্ধি ছিল খুবই প্রখর। সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিতে তাদের জুড়ি ছিল না। মানব সভ্যতার আদিকাল থেকেই মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ বেশ প্রভাব বিস্তার করে আসছে। তাই এই ব্যাপারে জনগণের কাছে ধর্মীয় চরিত্র প্রকাশের বিচিত্র ব্যবস্থা করা হোত রাজ-রাজাদের পক্ষ হতে। আজ কালকার ক্ষমতাধররা কি সে ব্যবস্থা তুলে দিয়েছেন? হাবভাবে তো তা মনে হয় না। যে কোন দেশের সরকারই নাকি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করার সময় সেই দেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেন, না পারলেও খাপ খাওয়ানোর ভাল অভিনয় করতে পারেন এমন লোককে নিয়োগ করে থাকেন। উদ্দেশ্য, বিদেশের লোকদেরকেও সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলা।

যাক গে, সেসব কথা। অভ্যাস বড় খারাপ হয়ে গেছে। এক কথা বলতে অন্য কথা বলে ফেলি। লিখতে বসেছিলাম আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্মেলন সম্পর্কে। মূল কথায়ই ফিরে আসা যাক। গত ২২ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ, ঢাকায় মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলনে বাংলাদেশসহ পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জর্দান, সৌদি আরব, তুরস্ক, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন। সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ

কুতুব। জেদ্দা আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের জন্য স্থান ঠিক করা হয়েছিল হোটেল পূর্বাণীতে। বাংলাদেশ থেকে লোকজন ঠিক করার দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশ সরকারের।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার সবদিক সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে স্থান এবং বাংলাদেশের ডেলিগেট নির্বাচনের ব্যাপারে আমার কিছু কথা বলার আছে। প্রথমত: স্থান সম্পর্কেই কথা বলতে হয়। শিক্ষা সম্পর্কিত কোন সম্মেলন শিক্ষার সাথে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই হওয়া উচিত। সে হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনই ছিল উত্তম স্থান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে নিঃসন্দেহে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কি হওয়া উচিত, আমাদের সংস্কৃতির উপাদান কি, অন্য জাতি থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্য কোথায়, এ সমস্ত কথাগুলো আলোচনার উপযুক্ত জায়গা তো ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কোন দেশের ছাত্র সমাজই তার ভবিষ্যৎ। বিশেষ করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন, তারা অতিসত্বরই দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হবেন। কথাবার্তায় তো আমাদের সরকার প্রায়ই দেশকে ইসলামাইজেশনের কথা বলে থাকেন। এর জন্য তো প্রথম মটিভেশনের প্রয়োজন হোল শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ভাবী দায়িত্বশীলদের। এই মটিভেশনের কাজ ত্বরান্বিত হোত যদি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হোত।

অনেক যুক্তি দেখাতে পারেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় খুবই সেনসিটিভ এরিয়া তাই সেখানে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হতে গেলে অসুবিধা ছিল। কিন্তু সেনসিটিভ এরিয়া হলেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের দিয়ে কি এতটুকুও ভরসা করা যায় না যে, একটা আন্তর্জাতিক একাডেমিক সেমিনারে তারা অপ্রীতিকর কোন কিছু করবেন না। আসলে কি হোটেল পূর্বাণীতে আবদ্ধ কক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠান সরকারের জন্য বেশি প্রয়োজন ছিল, না দেশবাসীর জন্য বেশি প্রয়োজন ছিল, না সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বেশি প্রয়োজন ছিল? কমপক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে হতে কি অসুবিধা ছিল? তাহলে কি জনগণকে বিশেষ করে শিক্ষিত মহলকে ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণায় প্রভাবিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর সুকৌশল ব্যবস্থা করা হয়েছিল? ইতোপূর্বে আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব শিবিরের ব্যাপারেও আমরা এমনি মনোভাব লক্ষ্য করেছি।

দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশী ডেলিগেট নির্বাচন সংক্রান্ত। খোঁজ নিলে দেখা যাবে ডেলিগেট এবং অবজারভারদের বেশ সংখ্যক সরকারী কর্মচারী অথবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে যারা শিক্ষাবিদ হিসাবে পরিচিত তাদেরই বেশি সংখ্যায় স্থান পাওয়া উচিত ছিল। যারা

শিক্ষার সাথে সরাসরি জড়িত, সিলেবাস কারিকুলাম তৈরির সাথে যারা জড়িত, বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষায় ব্যাপারে শিক্ষাবিদদের মধ্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করেন তাদের অনেকেই বাদ পড়েছেন। একটু উদারভাবে চিন্তা করলেই আরও অনেককে ডেলিগেট অথবা অবজারভার হিসেবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া যেত। অবজারভারদের তালিকায় তো প্রথমে মাত্র ত্রিশ জনের নাম ছিল। পরে আরও কয়েকজনকে ঢোকানো হয়েছে তাও ছিল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার অনেকটা বিরুদ্ধে। শুধুমাত্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়া বাকী অনুষ্ঠানগুলো মনে হয় ফাঁকা ফাঁকা। একেতো নির্দিষ্ট সময়ে সেশনগুলো প্রায়ই শুরু হয়নি। তাছাড়া অবজারভার হিসেবে যাদের নাম তালিকাভুক্ত ছিল তাদের অনেকেই ছিলেন অনুপস্থিত। অবজারভারের তালিকায় আরো বিশ ত্রিশ জন লোকের নাম দিলে এমন কি পাপের কাজ হোত? তাদেরকে তো কোন টি,এ বা ডি,এ দেয়ার ব্যাপারে আগেই অপারগতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শেষ দিনের অধিবেশনগুলোর কথা না বলে পারছি না। সকালের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ভাষণ দিবেন তা যথারীতি জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। সময়মত তিনি এসে গেলেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। তিনি বরাবরই একজন নামকরা অরেটর হিসেবে পরিচিত। তাছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড থাকার কারণে বক্তৃতার মধ্যে কিছুক্ষণ পরপরই কোরআন ও হাদীস থেকে কোট করতে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী। বিদেশীরা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তার জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনছিলেন আর আমরা বাংলাদেশীরা উপভোগ করছিলাম। উপভোগের কথাটা বলছি এজন্য যে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ত্রিমূর্তি শোভা পাচ্ছে, গানবাজনার চর্চা অবশ্য-পাঠ্য হিসাবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে, হাদীসের বিকৃত অর্থ করে রাস্তা-ঘাটে সন্তান কমানোর জন্যে মটিভেশনের কাজ চলছে, অপরদিকে ইসলাম সম্পর্কে এত সুন্দর ওয়াজ নছিহত মন্ত্রীদের মুখে শুনলে ব্যাপারটা উপভোগ করার মতই বটে। তারপর অপ্রাসঙ্গিকভাবে হলেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা থেকে বহু দূরে স্থাপনের যুক্তি দেখানো হোল। আশা করে থাকলাম পরে আলোচনা হলে আমরাও আমাদের কথা বলবো। কিন্তু সে সুযোগ হলো না। যাক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে লিখতে গেলে সে সম্পর্কে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরার ব্যবস্থা করবো ইনশাআল্লাহ।

বিকাল বেলায় শেষ অধিবেশনে ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আরও বেশী অবাক করেছেন। তিনি ইসলামিক কালচার সম্পর্কে এত আবেগপ্রবণ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল তারা ইসলামিক কালচার প্রতিষ্ঠায় এতটা বেশী ব্যস্ত যে শুধুমাত্র কিছু দুষ্কৃতিকারীর জন্যই সেটা সম্ভব হচ্ছে না। নইলে এখনই এই জাতিকে ইসলামিক কালচারে পুরোপুরি অভ্যস্ত করিয়ে ছাড়তেন। অথচ জানা যায়, ঐদিনই পর্দার অন্তরালে তিনি সম্মেলনের মূল সুপারিশগুলোর গলায় ছুরি চালাতে দ্বিধা করেননি। মূল ড্রাফটে নগ্নছবি আমদানী বন্ধ, গণমাধ্যমগুলোকে অনৈসলামী

কর্মকলাপের হাত থেকে উদ্ধার, মিশনারী স্কুল বন্ধ সহ অনেক শক্তিশালী সুপারিশ ছিল। কিন্তু ইসলামী কালচারপ্রিয় মন্ত্রীর ছাড়পত্র না পাওয়াতে সেগুলো আর কখনও আলোর মুখ দেখবে না। অবজারভারদের জন্য এই সেশনে কোন মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল না। সুতরাং অবজারভারদের পক্ষে আর মুখ খোলার কোন সুযোগ নেই। বিদেশী মেহমান যারা এসেছিলেন তারা আর কি করবেন। ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ সাহেব কিছুটা বুঝাতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ইসলামের 'মহান' খেদমতগাররা অপরের বুদ্ধি নিবেন কেন?

সম্মেলন কক্ষ থেকে বের হতে হতে নানা কথা মনে পড়ছিলো। যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে তাদের অভ্যাস অনেকটা যেন কাকের মত হয়ে যায়। কাক নাকি কোন জিনিস লুকানোর সময় চক্ষু বন্ধ করে লুকিয়ে রাখে আর ভাবে দুনিয়ার অন্যান্য সকলে আমারই মত চক্ষু বন্ধ করে রেখেছে। পরে যখন নিজের জিনিসের খোঁজে আসে, তখন নিজেই নিজের জিনিসটি আর খুঁজে পায় না। সেটা অন্যের হাতেই পড়ে যায়। কাকের তো বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত হওয়ার কোন সুযোগ নাই বলে অভিজ্ঞতা থেকে শেখার সুযোগ নাই। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির এত উন্নতি হওয়ার পরও তার শিক্ষা হয় না কেন? রাজনীতিতে নাকি একটা কথা আছে, "কিছু লোককে কিছুক্ষণ বোকা বানানো সম্ভব, কিন্তু সবলোককে সর্বক্ষণ বোকা বানানো অসম্ভব।" এভাবে কতদিন আর ইসলামের নামে ধোঁকা দেয়া সম্ভব হবে? ধর্ম নিয়ে কারা রাজনীতি করে? জনগণ, না সরকার? ভাবতে ভাবতে কখন যে রাস্তায় নেমে পড়েছি ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। হঠাৎ ক্যাঁচ করে একটা গাড়ির শব্দে হতচকিত হয়ে লাফ দিয়ে সরে গেলাম। চেয়ে দেখি গাড়িতে জনৈক বিদেশী বসা। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। বিদেশীর গাড়ীর সামনে পড়েছি বলে রেহাই। আমাদের দেশের কোন সমাজতান্ত্রিক সরকারী উপরওয়ালার গাড়ীর সামনে পড়লে তো বাপের কালের প্রাণটাই হারাতে হোত।

ব্যাপারটাকে মানবীয় দৃষ্টিতে বিচার করুন

দৈনিক সংগ্রাম, ০২ এপ্রিল, ১৯৮০

গত ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মুক্তিপ্রাপ্তদের তালিকা দেখলাম। কয়েকজন জাতীয় রাজনৈতিক নেতাসহ বহু লোক মুক্তি পেয়েছে। সরকারের এ পদক্ষেপের জন্য অনেকেই মোবারকবাদ জানিয়েছেন। কেউ বলেছেন, 'শুভ সিদ্ধান্ত', কেউ বলেছেন, 'গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে।' কথাগুলো অবশ্যই ঠিক। কিন্তু এই শুভ সিদ্ধান্তের তালিকা একটু দীর্ঘ হলে হয়তো আরো অনেকের মুখে হাসি ফুটতো। অনেক ধ্বংসোন্মুখ পরিবার রক্ষা পেত।

তালিকা দেখে কয়েকজন বন্দীর কথা ভাবছিলাম। তাদের মধ্যে একজন হলো মোমেনশাহী জেলার অষ্টগ্রামের আমিনুল হক। সে বন্দী হয়েছে দালাল আইনে, শাস্তি হয়েছে বেশ দীর্ঘ। তার নিকট আত্মীয়ের অনেকেই নিহত হয়েছে। শেষ অবলম্বন হিসেবে বৃদ্ধ মাতা আমিনুল হকের মুক্তির জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন করেছিলেন। তাতেও কোন ফল হয়নি। সন্তানের শোকে বৃদ্ধ মাতাও সংসারের মায়া ত্যাগ করে ধুঁকে ধুঁকে শেষ পর্যন্ত বিদায় নিয়েছেন। কোন কোর্টেই তার জন্য আপীল করা হয়নি। আর আসল কথা হোল আপীল করার কেউ নেই। যখন সে বন্দী হয় তখন তার বয়স ছিল সতের কি আঠার বছরের মত। একটি তরুণ জীবনের প্রায় দশ বৎসর অতিক্রান্ত হতে চললো বন্দী অবস্থায়। কিন্তু তার প্রতি কোন দয়া, কোন সাধারণ ক্ষমার আদেশই প্রযোজ্য হয়নি।

আরেক যুবকের কথা ভাবছিলাম। নাম আব্দুর রশীদ, বাড়ী কিশোরগঞ্জ। সেও একই কারণে বন্দী হয়েছে। তারও জীবনের একটা দীর্ঘ সময় বন্দীদশায়ই চলে গেল। তার

জন্যেও বলার কেউ নেই। কোন মন্ত্রীর আত্মীয় হয়তো সে নয়। অথবা কোন উপরওয়ালা হয়তো তার মামা নয়। সুতরাং কারাগারের নিরন্ধ্র অন্ধকারে এদের কেউ ঢুকলে আর বের হবার সম্ভাবনা নেই।

এমনি আরেক দুর্ভাগা ব্যক্তি হচ্ছেন জামালউদ্দিন। বাড়ী নলিতাবাড়ী। বয়স পঞ্চাশেরও উর্ধ্বে। তার অভাবের সংসার। বেশ কয়েকটি ছেলে সন্তানসহ তার স্ত্রী আজ পথে বসেছে। ছোট্ট সন্তানটি তার আব্বা আছে বলে তার মার কাছে শুনলেও এই মাসুম বাচ্চাটি তার পিতাকে একবার দেখেও প্রাণের জ্বালা জুড়াতে পারেনি। আব্বু বলে গরীব পিতার গলা জড়িয়ে ধরে এক মুহূর্তে বেহেশতী আনন্দ লাভ করার সুযোগ পায়নি। অপরাধ সে একজন সাধারণ রাজাকারের ছেলে। রাজাকার কমান্ডারের বা কোন রাজনৈতিক নেতার ছেলে হলে তার জন্য এ দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির কোন কারণ ছিল না।

দালাল আইন তুলে দেয়া হয়েছে। তাদের অনেককেই মুক্তি দেয়া হয়েছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফজল দালাল আইনকে বলেছিলেন বেআইনী আইন। আইনের মূলসূত্র অনুযায়ী আগে অপরাধ সংঘটিত হলে পরে সেই অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্য কোন আইন তৈরি হতে পারে না। দেশে আইন প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, জনগণকে আইন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করবেন সরকার। অতঃপর সেই আইন অনুযায়ী কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তার জন্য শাস্তি বিধান করা হবে। শুধুমাত্র কোন বিশেষ অপরাধীকে শাস্তির জন্য আইন প্রণয়ন করা আইনের দৃষ্টিতে আসলেই বেআইনী। শ্রদ্ধেয় আবুল ফজল ঠিকই বলেছেন।

দালাল আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকেই যদি মুক্তি না দেয়া হোত তাহলে হয়তো ব্যাপারটা নিয়ে তো কিছু বলার অবকাশ ছিল না। বর্তমানে পার্লামেন্টে জনগণের দাবীতে সবচেয়ে সোচ্চার কণ্ঠ হচ্ছে জনাব এ এস এম সোলায়মানের। পার্লামেন্টে অধিবেশন চলাকালে প্রায় প্রতিদিনই তার কোন না কোন বক্তব্য খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। দালাল আইনে তাকে সর্বোচ্চ মেয়াদের শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু মুক্তি পাওয়ায় দেখা গেল তিনি দালাল তো ননই বরং জনগণের নেতা যাকে জনগণ তাদের এলাকার প্রতিনিধি করে পার্লামেন্টে পাঠালেন। এখন কি ঐ এলাকার সমস্ত জনগণকেই দালাল বলে গালি দিতে হবে? কিন্তু এতবড় দুঃসাহস কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক করবেন বলেতো মনে হয় না।

এবার আসা যাক জনগণের আরেক নেতা খান এ সবুরের কথায়। তিনি গত ইলেকশনে তিনটি আসনেই বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। সরকারী দলের অঢেল অর্থ, অন্যান্য বিরোধীদলের হুংকার এবং তর্জন-গর্জনকে উপেক্ষা করে জনগণ এই অশীতিপর বৃদ্ধকেই তিন তিনটি আসন থেকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছে। পার্লামেন্টে তিনি প্রায়ই মুরুব্বীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। আইন

সংক্রান্ত কোন জটিল সমস্যা দেখা দিলে, অধিকার সংক্রান্ত কোন সমস্যার জট পাকিয়ে গেলে অনেক সময়ই দেখা গিয়েছে যে দালাল আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত এ অশীতিপর বৃদ্ধ প্রবীণ রাজনীতিবিদকেই তার ফয়সালা দিতে হয়। কিন্তু তাকেই তো সেই কুখ্যাত দালাল আইনের কবলে পড়তে হয়েছিল।

জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের কথাই ধরা যাক। পাকিস্তান ও ইসলাম সমর্থন করার কারণে তার নাগরিকত্ব পর্যন্ত হরণ করা হয়েছিল। কিন্তু আজ তিনি পার্লামেন্টে তার এলাকার জনগণের প্রতিনিধি। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী পঁচিশ বছরের দাসখতের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের প্রশংসা একমাত্র ভারত-সোভিয়েত ঘেঁষা কিছু বিভ্রান্ত লোক ছাড়া সকলেই করেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শাহ আজিজুর রহমানকেও তো দালাল আইন কমে ছাড়েনি। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে আজ তার ভূমিকাকে খাটো করে দেখার দুঃসাহস কার আছে? তিনি এখন সংসদের নেতা এবং বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বেশ দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছেন। শিক্ষা বিভাগের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তার হাতেই অর্পণ করা হয়েছে। এই সব দৃষ্টান্তগুলো এত দীর্ঘ করে তুলে ধরার হয়তা প্রয়োজন হোত না, যদি সরকার সব অপরাধীর ব্যাপারে একই রকম আচরণ করতেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক ও দেশদ্রোহী শব্দ দু'টো অনেকেই নিজেদের পক্ষে জনমত সংগ্রহ করার জন্য যা শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে রায় পেশ করার সর্বোচ্চ দায়িত্ব জনগণের। সুতরাং রাজনৈতিক কারণে কারো জন্মগত অধিকার নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা বা কাউকে কারাগারের বন্দী জীবন যাপনে বাধ্য করার মত অন্যায় অধিকার কোন সরকারেরই নেই।

দালাল আইনে যারা শাস্তিপ্রাপ্ত ছিলেন অথচ মুক্তি পেয়ে এখন সরকারী অথবা বিরোধী দলে থেকে সংসদের বাইরে অথবা ভিতরে জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন তাদের প্রতি আমাদের কিছু বলার আছে। যারা বন্দী অবস্থায় বিভিন্ন কারাগারে মানবেতর জীবন যাপন করছে তাদের প্রতি কি আপনাদের কিছুই করণীয় নেই? তারা কেউ আল বদর ছিল, কেউ রাজাকার ছিল, কেউ বা ছিল মুজাহিদ বাহিনীর লোক। তারা কি এই সমস্ত কাজ আপনাদের মত যারা ছিলেন তাদের দৃষ্টান্ত সামনে রেখেই কি করেনি?

আজ আপনারা মুক্ত বাতাসে মুক্ত মানুষ হিসেবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেউবা সরকারী দলের সাথে বিদেশে ঘুরার সুযোগ পর্যন্ত লাভ করেছেন। আপনাদের কি সেই সমস্ত অনুসারীদের প্রতি কোনই দায়-দায়িত্ব নেই? আপনাদের পারিবারিক পরিবেশে যখন হাস্যোজ্জ্বল পরিবেশে স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকেন তখন কি একবার ভুলেও আমিনুল হকদের মত কিশোরদের ছল ছল আঁখি আপনাদের হৃদয় মনে কোন

আবেদন সৃষ্টি করে না? আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে একবার আপনার সন্তানদেরকে আমিনুল হক, আব্দুর রশীদের জায়গায় রেখে চিন্তা করুন তো! একজন বাপ হয়ে জামাল উদ্দিনের পথে বসা মাসুম বাচ্চাদের দিকে তাকানোর কোন অবসর কি আপনাদের মোটেই নেই? আপনারা কি রাষ্ট্র আর জনগণের চিন্তায় এতই অস্থির? হয়তো বলবেন অবশ্যই মনে আছে, চিন্তা করি, কিন্তু করার কিছু নেই। পার্লামেন্টে তো অনেক কথাই বলেন অথচ এই সারা দেশে দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত শতাধিক লোকের ব্যাপারে আপনারা কোন কথা বলেন না কেন? মহামান্য প্রেসিডেন্টের সাথে তো আপনাদের নিজেদের ও পার্টির প্রয়োজনে বহুবার সাক্ষাৎ করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে সাক্ষী করে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন কতবার এই শতাধিক মাসুমের কথা তুলেছেন? যদি এই ব্যাপারে আপনারা যথাযথ ভূমিকা পালন করে না থাকেন, আর এখনও পালন করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে রাজী না হন, তাহলে এক চূড়ান্ত শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকুন। এই পৃথিবীতে এর জন্য কতটা ভুগতে হবে সে ব্যাপারে আমার কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। কিন্তু মহান আল্লাহর দরবারে এই সমস্ত মজলুমরা যখন আপনাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করবে তখন কোন ধরনের সাফাই গেয়ে সেখানে মুক্তি পাওয়ার আশা রাখেন? সেখানে আপনাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, আত্মীয়-পুত্র-পরিজন কোন উপকার করতে পারবে কি?

সর্বশেষ আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একই আইনের আওতায় দুই ধরনের বিচার কোন ধরনের মানবতা? উচুদরের বড় আলীরা মুক্তি পেয়ে মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস ফেলছে আর শুধুমাত্র ছোট আলীদের ব্যাপারে এই নিষ্ঠুর আচরণ কেন? আমাদের প্রতিটি কাজের ব্যাপারেই দেশে দুইটি আইন চালু আছে বলে ধরে নিতে হবে? একটি হোল বড় বড় নেতা এবং সাহেব-সুবাদের জন্য, আর একটি গরীব নিরীহ মানুষদের জন্য? তাহলে কি সেই চিরাচরিত প্রবাদটি, 'দেবতার বেলায় লীলাখেলা আর পাপ শুধু মানুষের বেলায়' বাংলাদেশ সরকারের বিচারবোধ ও ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে? যেখানে অর্ধ ডজনেরও অধিক খুনের অপরাধী রাজনৈতিক কারণে ছাড়া পায় যেখানে প্রকাশ্য ভাবে নারী অপহরণ করেও বিচারের সম্মুখীন হতে হয় না, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেও শাস্তির মেয়াদ পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করার প্রয়োজন হয় না, যেখানে নাকের ডগার উপর সরকারী প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার সময় আইনের কোন পরোয়াই করে না, সেখানে এই শতাধিক লোক কি তাদের জীবনের স্বর্ণোজ্জল দিনগুলোকে জাতির কর্মের ক্ষেত্রে উপহার দেয়ার সুযোগ থেকে আজীবন বঞ্চিতই থেকে যাবে? বৃদ্ধ মাতার অশ্রু দিয়ে লেখা আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হওয়ার পর সন্তানের শোকে মুখ থুবড়ে মৃত্যুবরণ করেও সরকারের কাছে করুণার আশা করতে পারবে না? ছোট্ট মাসুম বাচ্চার 'আব্বু আব্বু' আর্তনাদ আকাশে বাতাসে কাঁপন তুললেও ক্ষমতাধরদের মন কি এতটুকুও টলবে না? নববিবাহিত বধূর বিরহজ্বালা কি আমাদের সদাশয়

সরকারের মনে এতটুকু দয়ার উদ্রেক করবে না? বৃদ্ধ পিতার সন্তানের সাথে সাক্ষাতের আশায় অপেক্ষমাণ প্রহরগুলো কি কোনই বিবেচনার দাবী রাখে না? এদের জেলে থাকার কারণে এদের আত্মীয়-স্বজনকেও কি অনবরত পুলিশী নির্যাতনের শিকার হতে হবে?

এদের সমস্যাটা আরো একটু মানবীয় দৃষ্টিতে বিচার করতে অসুবিধা কোথায়? যাদের জন্য বলার কেউ নেই তারাই কি চিরকাল দয়ার সীমার বাইরে অবস্থান করবে? তদবীরের জন্য যাদের কোন উপরওয়ালা নেই তাদের ব্যাপারে বিবেচনা করাকে কর্তৃপক্ষ কি পাপ বলে মনে করেন? যাদের কোন মামু মন্ত্রী নেই, কোন দুলাভাই সরকারী বড় চাকুরীতে নেই, যাদের খালু ঘন ঘন মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের বাসায় যাতায়াত করে না এগুলোই কি তাদের অপরাধ? আপনাদের বিবেককে একটু নীরবে ঠান্ডা মাথায় জিজ্ঞেস করে দেখুন আইনের এই দ্বিবিধ প্রয়োগ জনগণের অভিভাবক হিসেবে আপনাদের জন্য কতটা বৈধ? আপনাদের বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ঐ নিরীহ ব্যক্তিদের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে দেখুন আপনারা আপনাদের সরকারের কাছে কি প্রত্যাশা করতেন? আপনারা যা প্রত্যাশা করতেন আপনাদের আচরণ কি এই নিরীহ অথচ অপরের দ্বারা প্রেরণাপ্রাপ্ত ছোটখাট অপরাধীদের ব্যাপারে তাই হচ্ছে? যদি না হয় তাহলে আপনাদের বিবেককে জিজ্ঞেস করুন আপনারা কতখানি জাষ্টিফাইড? উত্তর যদি না বোধক হয় তাহলে এর পরিণাম শুধু আদালতে আখেরাতেই ভোগ করতে হবে না, এই বাস্তব দুনিয়ায়ও এর মূল্য অবশ্যই দিতে হবে। অন্তত: স্মরণকালের ইতিহাসের বহু ঘটনা আমাদেরকে তো তাই শিক্ষা দেয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন ঢাকায় চাই

দৈনিক সংগ্রাম, ০৯ এপ্রিল, ১৯৮০

বেশ কিছুদিন যাবত ভাবছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু লিখব। বিশেষ করে কয়েকদিন আগে মাননীয় পাঠক সমাজের কাছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর যুক্তিগুলোর উত্তর দিয়ে লিখব বলে ওয়াদা করেছিলাম। কিন্তু লিখে আর কোন উৎসাহ পাই না। আমি নয়, অন্যান্য বহু নামকরা কলামিষ্টরাও তো অনেক লিখেছেন। কিন্তু কোনটার কিছু হয়েছে কি? মরহুম আবুল মনসুর আহমদের মত লোক পাট শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কত লিখে গিয়েছেন। তাতেও কিছুই হয়নি। বরং পাটশিল্পের আজ বারটা বাজছে। অবস্থা যা তাতে আগামী আর মাত্র দু'তিন বছরে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত বৃহত্তর পাট উৎপাদনের দেশ হিসাবে বিশ্বের বাজারে পরিচিত হবে।

যাক অন্য কথা। এবার আসল কথা অর্থাৎ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে আসা যাক। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার বাইরে অর্থাৎ বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত করার যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন আমরা প্রথমে তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করব এবং পরে আরও কিছু কারণ উল্লেখ করে বলব যে, আমরা কেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় চাই?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকার বাদশাহ ফয়সাল ইনস্টিটিউটে ভাষণের সময় বলেছিলেন, "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যে গ্রামে অবস্থিত তার নাম হরিনারায়ণপুর, গ্রামটিকে ইসলামপুর করতে হবে। সে জন্যেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে স্থাপিত হচ্ছে।" কিন্তু একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা একটা গ্রামের নাম পরিবর্তনের যুক্তি কোথায়?

যদি তাই হয় তবে বাংলাদেশে আরও বহু গ্রাম আছে যেগুলোর নাম কোন হিন্দু বা খৃষ্টানদের নামের অনুকরণে রাখা হয়েছে। তাহলে কি ঐসব গ্রামগুলোর প্রতিটিতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে ছাড়তে হবে? একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরের জন্য একজন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এত ফালতু যুক্তি শুনতে হবে এটা জাতির জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

অতঃপর তিনি যে যুক্তিটি পেশ করেছেন তাহলো বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) কে কেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের লন্ডনে না পাঠিয়ে মক্কার মত অনুন্নত জায়গায় পাঠানো হয়েছিল? এ প্রসঙ্গে আমি এতটুকুই বলব যে, যখন রসূল (সা) পৃথিবীতে আগমন করেন তখন আমেরিকা মহাদেশটি আবিষ্কৃতই হয়নি। সেখানে তখনও কোন লোক বসতি গড়ে ওঠেনি। সুতরাং নবুয়তীর দায়িত্ব পালনের জন্য জনমানবশূন্য দ্বীপে কাউকে পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না। কেননা নবুয়তীর দায়িত্বতো পালন করতে হয় মানবসমাজে, কোন নির্জন স্থানে নয়। অপর দিকে বৃটেনের লন্ডন শহর তখন মক্কা শহরের তুলনায় কোন উন্নততর শহর ছিল না। মক্কা থেকে বিভিন্ন স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থাও সহজতর ছিল। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পর্যটকদের ভিড় লন্ডনের তুলনায় মক্কাতেই অনেক বেশী ছিল। একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নিয়ে এতসব কথার উদ্দেশ্য সহজে আমাদের বুঝে আসে না। নবী আগমন এবং একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারটা সমার্থক নয়। সুতরাং এ ধরনের কোন যুক্তি তুলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি রাজধানীর বাইরে প্রতিষ্ঠার কোন অর্থই হয় না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম যুক্তি হোল, ঢাকায় লুট, হাইজ্যাক, গণঅসন্তোষ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতিসহ পরিবেশ এতটা খারাপ যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটা পুত-পবিত্র জায়গার অন্বেষণে তাদেরকে ঢাকা ছেড়ে বাংলাদেশের সীমান্তে যেতে হয়েছে। এই বক্তব্য মন্ত্রী মহোদয়ের নিজের বক্তব্যের প্রথম অংশের সাথেই সাংঘর্ষিক। একদিকে তৎকালীন মক্কার দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য নবী পাঠানোর কথা তুলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্বাচন জায়েজ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, অপর দিকে ঢাকার অনৈসলামী পরিবেশে অস্থির হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে তা ঢাকার বাইরে নির্মাণ করার অপূর্ব যুক্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে। বক্তব্যের প্রকাশ ভঙ্গিতে আর্ট থাকলেও পরস্পর বিরোধীতা নিঃসন্দেহে শ্রোতাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে বৈকি!

ঢাকায় যদি পড়াশুনার পরিবেশ না-ই থাকে তবে দেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় অন্য কোথাও স্থানান্তরের মহাপরিকল্পনা সরকারের অবশ্যই হাতে নেয়া উচিত। অথবা লেখাপড়ার কোন পরিবেশ না থাকলে কেন প্রতি বছর জাতির রক্ত পানি করা কোটি কোটি টাকা গচ্ছা দেয়া হচ্ছে? এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য কেন সরকার জনসম্মুখে

পেশ করেন না? তাহলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে কি তার জন্য বাৎসরিক মঞ্জুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশী হবে? অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি বন্ধ হয়ে যাবে বা তার আদৌ প্রয়োজনই থাকবে না?

রাজধানীর পরিবেশ এত বিষাক্ত হলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট কেন ঢাকার বাইরে স্থানান্তরের চেষ্টা করা হচ্ছে না? বিচারের জন্য তো নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশের প্রয়োজন। অথচ এই যুক্তি প্রদর্শন করা হলে সাথে সাথেই উত্তর আসবে একমাত্র সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান কি করে রাজধানী ছাড়া বাইরে থাকতে পারে? তেমনি যদি প্রশ্ন করা যায় দেশের একমাত্র সচিবালয় যা সবসময়ই কর্মব্যস্ত তা ঢাকায় কেন? বঙ্গভবন, গণভবন, মন্ত্রীদের কার্যালয় এবং সুরম্য অট্টালিকাগুলো সবই ঢাকায় অবস্থিত কেন? এ সমস্ত কেন্দ্রীয় অফিস আদালত স্থাপনের সময় ডিসেন্ট্রালাইজেশনের প্রশ্ন উঠে না কেন? আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর যার জন্য আরও প্রশস্ত জায়গার প্রয়োজন তা ঢাকায় কেন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরও বোধ হয় মন্ত্রী মহোদয়রা আগের মতই দিবেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ছাড়া অন্য কোন জায়গায় স্থাপনের হাকিকত এই সমস্ত খোঁড়া অজুহাতের মধ্যে নয়, বরং অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে। যে কারণে আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব সেমিনার ঢাকায় না হয়ে রাজধানী থেকে দূরে মৌচাকে অনুষ্ঠিত হোল, যে কারণে আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় না হয়ে হোটেল পূর্বাণীতে অনুষ্ঠিত হোল, সেই একই কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা থেকে সুদূর কুষ্টিয়া এবং যশোর সীমান্তে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম চাই জনগণকে বোকা বানানোর জন্য ইসলাম চাই মুসলিম বিশ্বকে বোকা বানানোর জন্য, ইসলাম চাই ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য। কিন্তু ইসলামের প্রভাব থেকে জনগণকে বিশেষ করে যুবসমাজকে সযত্নে দূরে রাখতে হবে, যাতে ইসলাম কোনক্রমেই পাশ্চাত্য জীবন যাপন পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়াতে না পারে। তাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বড় মাদ্রাসা তৈরির পরিকল্পনা চলছে সুকৌশলে।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কেন ঢাকায় চাই, তার কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করছি :

এক: বাংলাদেশে একটিই মাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী ছিল দীর্ঘদিনের। কোন দেশে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানই যদি স্থাপন করতে হয় তা সাধারণত রাজধানী শহরেই করতে হয়। কেননা, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজনের যাতায়াত প্রধানত রাজধানীতেই বেশী থাকে।

দুই: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চাইলে তা ঢাকায় হওয়া প্রয়োজন। কেননা মুসলিম বিশ্বের ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক প্রতীক হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ই ভূমিকা পালন করবে। সুতরাং বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করার জন্যই

তা ঢাকায় হওয়া দরকার।

তিন: বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার যথোপযুক্ত পরিবেশ নেই। এই অব্যবস্থা এবং অনাকাঙ্খিত পরিবেশের প্রধানত: শিকার দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং পাশাপাশি কোন স্থানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে এবং সেখানকার আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শিক্ষা প্রশাসন এবং পরিবেশ অপরের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

চার: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী শিক্ষাবিদদের বেশ কিছু লোককে শিক্ষকতার জন্য আহ্বান করা প্রয়োজন হবে। বিদেশের উন্নত পরিবেশ থেকে তাদের অনেকেই সেই অজপাড়াগাঁয়ে যেতে চাইবেন না। ফলে ইচ্ছা থাকলেও অনেক শিক্ষাবিদেরই শেষ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

পাঁচ: একটি আদর্শ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে বহু দেশ থেকেই লোকজন তার সিলেবাস, কারিকুলাম, গবেষণা পদ্ধতি, প্রশাসন পদ্ধতি সরেজমিনে দেখার জন্য বাংলাদেশে আসতে থাকবেন। রাজধানীতে বা তার নিকটবর্তী কোন স্থানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলেই আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য সুবিধা হবে।

ছয়: একটা নতুন পরীক্ষামূলক কারিকুলাম এবং সিলেবাস চালু হওয়ার পর তার অনবরত মূল্যায়নের দরকার হবে। আর এই মূল্যায়নের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করারও প্রয়োজন হবে। কমিটি মাঝে মাঝেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যনিষ্ঠা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন এবং উন্নয়ন বা পরিবর্তনের জন্য সম্ভাব্য যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এই কাজের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় স্থাপন করাই উত্তম।

সাত: বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে শুধু আমাদের দেশ থেকে নয়, অন্যান্য বহু দেশ থেকে ছাত্ররা অধ্যয়ন করতে আসবে। তাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হলেও রাজধানী শহর বা তার নিকটবর্তী কোন স্থানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করাই বেশী যুক্তিযুক্ত।

আট: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ এবং পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সম্ভবত: উপরোক্ত কারণগুলো বিবেচনা করেই উক্ত কমিটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঢাকা, জয়দেবপুর বা সাভারের নিকটবর্তী যে কোন স্থানের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। অথচ কমিটির পরামর্শকে উপেক্ষা করে কুষ্টিয়া সীমান্তকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই খামখেয়ালী এবং ইসলামের প্রভাবভীতি থেকে মুক্ত হয়ে সরকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জনগণ আশা করে। জনগণের এটাই দাবী।

সময় থাকতেই চিকিৎসা করুন

দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ এপ্রিল ১৯৮০ ইং

গত সপ্তাহে এক জরুরী কাজে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলাম। তাই পাঠকদের সামনে উপস্থিত হতে পারিনি। ঢাকায় ফিরে পরের দিন একটা বিশেষ কাজে বাংলাবাজার যেতে হলো। ফেরার সময় টেম্পোতে চড়ে গুলিস্তান আসছিলাম। নবাবপুর রোড থেকে পশ্চিমে নয়াবাজারের দিকে মোড় ফিরতেই হাতের ডানে দেখি দুটো পতাকা উড়ছে। বেশ কিছু লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আর ঐ পতাকা থেকে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে খুব বেশী হলে দেড়শ গজ দুরে দু'টি মসজিদের সুউচ্চ মিনার শোভা পাচ্ছে। আশেপাশেই দেখলাম পুলিশ ভাইয়েরা দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। তারই পাশে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রাবাস। দক্ষিণ দিকে একটা সিনেমা হল। হলের সামনে প্রায় অর্ধনগ্ন নারীচিত্র শোভা পাচ্ছে।

কৌতুহলবশত: পতাকাওয়ালা জায়গাটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সাথীদের একজন বললেন, "কেন, আপনি কি ঢাকায় নূতন এসেছেন ?" আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "আমি তো গত প্রায় এগার বছর যাবত ঢাকা আছি।" সাথী বললো, "ভাই, আপনারা তো দেখছি অন্য জগতের মানুষ। এটা হলো একটা বৈধ পতিতালয়।" অবাক বিস্ময়ে বৈধ পতিতালয় শুনে হেসে বললাম, "হালাল মদ কি রকম।" লোকটি বললো, "আপনি তো বেশ রসিক লোক দেখছি। বৈধ মানে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পতিতালয়।"

কথাটা শুনে বুকটার ভেতর ব্যথায় টনটন করে উঠলো। যে দেশের শতকরা নব্বইজন লোকই মুসলমান, সেখানে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পতিতালয় কিভাবে?

শাসনতন্ত্রের প্রথম মৌলনীতিতে আল্লাহর উপর সর্বাত্মক ঈমানকে সকল কাজের ভিত্তি হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে যে দেশের প্রেসিডেন্ট পরম করুণাময় আল্লাহর নামে সকল কাজের সূচনা করেন সেখানে এই অবস্থা মেনে নেই কি করে ? এই অপূর্ব সমন্বয় কেমন করে সম্ভব হলো ? দুইদিকে দুটি মসজিদ, দক্ষিণে সিনেমা হল, মাঝখানে পতিতালয়। পাশেই ছাত্রাবাস। তাইতো শুক্রবারে মসজিদেও পার্ট টাইম মুসল্লীদের ভীড়ে জায়গা পাওয়া দুষ্কর, আবার গুলিস্তান সিনেমা হলে "ওনলি ফর এ্যাডালটস" মার্কা সিনেমা আসলে জনতার ভীড়ে রাস্তা বন্ধ হবার উপক্রম, টিভিতে বিশেষ কায়দায় নৃত্য পরিবেশিত হলে দর্শকদের অপূর্ব সমাগম, গভীর রজনীতে শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণকালে মা-বোনদের ইজ্জতের উপর হামলা, গ্রামে গ্রামে কৃষি প্রদর্শনীর নামে লাকী খানের মনমাতানো নাচ, পত্রিকায় প্রকাশিত খবর "ধর্ষণের পরে নারী হত্যা" ইত্যাদির এমন গভীর সমন্বয় অনায়াসেই সম্ভব। কেননা, অত্যন্ত সুচতুর কায়দায় জাতিকে দশ গ্লাস মদের পরে এক গ্লাস দুধ খাওয়ানোর তালিম দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের জীবনে এমনি বিপরীত জিনিসের সমন্বয় আর কতদিন চলবে? একদিকে নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়ের জন্য প্রতিদিন উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে সকল ব্যক্তির আহাজারী, অন্যদিকে নৈতিকতা ধ্বংসের জন্য এমন আকর্ষণীয় ফাঁদ পাতার জন্য লক্ষ কোটি টাকার পরিকল্পনা। এ কেমন করে চলে? আমরা কোনটা চাই তাই আগে ঠিক করা দরকার। কথায় একরকম, আর কাজে তার ষোল আনাই উল্টো।

জাতির ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগরদের অর্থাৎ উঠতি বয়সের ছেলেদের একটি ছাত্রাবাস, তার পাশেই পতিতালয়। এ দৃশ্য দেখে যেকোন অভিভাককের হৃদয় প্রকম্পিত হওয়া ছাড়া উপায় আছে কি ? অথচ এ ব্যাপারেও আমরা নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছি। বেতন বৃদ্ধির জন্য মিছিল করি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতির জন্য নিয়ন লাইট ভেঙ্গে চুরমার করি, এলাকার পুল তৈরীর জন্য মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন পাঠাই কিন্তু সমাজের এই মারাত্মক ক্যান্সারের বিরুদ্ধে তেমন কোন টুঁশব্দই নাই। মাঝে মাঝে দু'চারটে সীরাতুন্নবী সেমিনার করে এ ব্যবস্থার মোকাবিলা করা কি করে সম্ভব ? একদিকে সুউচ্চ পাহাড় থেকে লক্ষ লক্ষ টন বরফ গলে নদী-সাগর জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। আর আমরা কিছু সংখ্যক লোক ভাটিতে দাঁড়িয়ে বালতি দিয়ে সেচে নদী পরিস্কার করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।

রাস্তায় বের হলেই ফুটপাতে যত বই, পত্র-পত্রিকা দেখা যায় তার শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী পর্ণগ্রাফীর পর্যায়ভুক্ত। একটু দাঁড়ালেই দেখা যাবে, উঠতি বয়সের যুবকেরা দু'চারখানা করে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির ছাত্রদের বালিশ ও তোষকের তলায় খুঁজলে প্রায় জনের কাছেই আপটুডেট পর্ণগ্রাফীর ম্যাগাজিন পাওয়া যাবে। বিলাস দ্রব্যের মার্কেটে গেলে আশেপাশে দেখা যাবে মা-বোনদের পর্ণগ্রাফী মার্কা পোশাকের বাহার। এখন কথা হলো, সবদিক দিয়ে মানুষকে নৈতিকভাবে দেউলিয়া করে দুর্বল ইন্দ্রিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে তত্ত্বগত জ্ঞানার্জন করিয়ে

ছেড়ে দিলে তার ডিমন্‌স্ট্রেশান ক্লাশ শুরু হলে আমরা চিৎকার করি কেন? তখন কেন জাতির মান-ইজ্জত গেল বলে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতির পর বিবৃতি দিতে থাকি? আমাদের এই স্ববিরোধীতাপূর্ণ কাজ-কারবারের আজ অবশ্যই মূল্যায়ন দরকার।

সমাজে যত খুন, রাহাজানি, হত্যা, আত্মহত্যা ইত্যাদি সব ধরনের অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এর শতকরা আশি ভাগই যৌন অপরাধের সাথে জড়িত। নারী-পুরুষের অবাধ সম্পর্কের সাথে সাথে পর্ণগ্রাফী, কুরুচিপূর্ণ সিনেমা, যেখানে সেখানে পতিতালয়, লাইট ক্লাব ইত্যাদি অপরাধকে আরও দ্রুতগতিতে বর্ধিত হতে সাহায্য করছে। এভাবে চলতে থাকলে সমাজ আর মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই নৈতিকভাবে জীবন-যাপনের অযোগ্য হয়ে পড়বে। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই ঘটাতে হবে যদি আমাদের সমাজ, দেশ এবং জাতিকে রক্ষা করতে চাই। এর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অতিসত্বর গ্রহণ করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

এক: সমাজের পতিতালয়গুলো উচ্ছেদের জন্য পরিকল্পনা নিতে হবে। এ ব্যবস্থা রাতারাতি সম্ভব নয়, এটা আমরা জানি। পতিতাদের খবর নিলে জানা যাবে, এদের অধিকাংশ সমাজের বঞ্চিতা, নির্যাতিতা, সহায়সম্বলহীনাদের অন্তর্ভুক্ত। অনেকে আবার টাউটদের খপ্পরে পড়ে এ পথে পা বাড়িয়েছে। এ ক্ষতকে সমাজ থেকে উৎখাত করতে হলে এদের সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এদের জন্য ছোটখাট কুটির শিল্প, গামেন্টস ইত্যাদির ব্যবস্থা করে জীবিকার্জনের পথকে সুগম করতে হবে। উপরন্তু এদের বিবাহের সুবন্দোবস্ত করতে হবে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায়। আর বর্তমান ভাসমান নারী গোষ্ঠীর জন্যও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে নূতন করে কোন মহিলাকে এই জঘন্য পথে পা না বাড়াতে হয়।

দুই: কুরুচিপূর্ণ সিনেমা, পত্র-পত্রিকা, সাহিত্য ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। কেননা, পত্র-পত্রিকা এবং অশ্লীল সাহিত্য ও সিনেমা দ্বারা খারাপ কাজের প্রতি যে মটিভেশন সৃষ্টি হয় তা বন্ধ না করলে কোনক্রমেই অপরাধ দমন সম্ভব নয়।

তিন: শিক্ষার ফর্মাল ইনফর্মাল এবং ননফর্মাল সমস্ত মাধ্যমকেই নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত করার আশু ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। দ্রুত ফল পেতে হলে গণমাধ্যমগুলোকে (রেডিও, টিভি, সিনেমা) জরুরী ভিত্তিতে প্রোগ্রাম নিতে হবে। নৈতিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে বক্স করে সুন্দর সুন্দর কথা, কোরআনের আয়াত, হাদীস ইত্যাদি ছাপিয়েও এ ব্যাপারে আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে।

চার: আমাদের মা-বোনদের চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গীতে শালীনতার ব্যাঘাত ঘটে এমন কিছু করা মোটেই উচিত নয়। স্ত্রীলোকদেরকে প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ সম্মান করতে চায়। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চাল-চলনে যখন তাদেরকে বারবনিতাদের

চাইতেও অশালীন অবস্থায় পায় তখন তাদের প্রতি সম্মান দেখাবে কোন কারণে? এ ব্যাপারে নারীদের পক্ষ থেকে ব্যাপক আন্দোলন হওয়া দরকার। এরজন্য নারী সমাজ অগ্রণী ভূমিকা নিলেই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া সম্ভব।

পাঁচ: বিবাহ ব্যবস্থাকে সহজ করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যৌতুক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন এ ব্যাপারে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ইসলামের আইন অনুযায়ী বিবাহ-ব্যবস্থা অতি সাধারণ এবং সামর্থ্যের মধ্যে। সামাজিক ট্র্যাডিশনের নামে অযথা অর্থ ব্যয় করে বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে বিয়ের নামে কর্পদকশূন্য হওয়া নিতান্তভাবে অন্যায় এবং পাপ।

হয়তো কথা উঠবে, এই সমস্ত করতে গেলে তো বেশ পয়সা-কড়ি খরচের প্রয়োজন। আমরা বলতে চাই যে, কত টাকা দরকার ? বহু বাজে কাজে, সাহেবদের গাড়ির তেলে, প্লেজার ট্যুরে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তো কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। তাহলে জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে কেন টাকা খরচে আমাদের এত আপত্তি? এই জাতিকে মারাত্মক পরিণতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। নইলে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আপনাদেরকে যাবতীয় কলংকের জন্য দায়ী করবে। সমাজের ক্যান্সারকে মহামারী আকারে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনারা যে বিস্তৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, এর জন্য কি ইতিহাসের কাছে জবাবদিহি ছাড়াই রেহাই পাবেন ? আল্লাহর মসজিদ যেখান থেকে প্রতিদিন পাঁচবার তাঁরই সার্বভৌমত্বের ঘোষণা মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, তারই পাশে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারীদের সামনে আপনারা আমার মায়ের জাতির একটা বিরাট অংশের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে আপনার আমার ভাই এবং সন্তানেরা। এর বিরুদ্ধে নীরব সাক্ষী মসজিদের সুউচ্চ মিনারগুলো যেদিন আদালতে আখেরাতে আমাদের সকলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে সেদিন কোন সাফাই গেয়ে রক্ষা পাওয়া যাবে কি? অতএব সময় থাকতেই এই সামাজিক ক্যান্সার নিরাময়ের ব্যবস্থা করুন।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আমাদের রাজনীতি-১

দৈনিক সংগ্রাম, ২২ মে ১৯৮০ ইং

অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনীতি সম্পর্কে পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোতে প্রচুর বদনাম আছে। আমাদের এখানে নাকি রাজনৈতিক পোলারাইজেশন নেই, দলের সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না, রাজনৈতিক অনুসারীদের চাইতে রাজনৈতিক নেতার সংখ্যা বেশী ইত্যাদি। তাছাড়া স্থিতিশীলতা নাকি মোটেই নেই। এ বছর কেউ জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে ক্ষমতায় আসীন হলেন, পরে জনগণের আস্থা হারানোর লক্ষণ দেখা দিলে ডান্ডাবাজী করে আরও এক টার্ম থাকলেন। কিছুদিন পরেই শুরু হলো গণবিদ্রোহ। এক সময় সরকার তার সমস্ত মেশিনারীসহ বিদ্রোহের জোয়ারে খড়কুটোর মত ভেসে গেলেন। নতুন যিনি ক্ষমতায় আসলেন তারও জনপ্রিয়তা পূর্বের মতই বরং কোথাও কোথাও তার চেয়েও বেশী। এইভাবে উঠা-নামা চলতে থাকে। পরাজয় যার ঘাড়ে সওয়ার হয় তিনি আর দ্বিতীয়বারে আসার সুযোগ খুব কমই পান। কোন কোন ক্ষেত্রে তো একেবারে সপরিবারে বা অনুসারীসহ শহীদের (?) মর্যাদা লাভ করেন। জীবিত নেতা-উপনেতারা কবরী নেতার নামে বহু কল্প-কাহিনী প্রচার করে জনপ্রিয়তা হাসিলের চেষ্টা করতে থাকেন।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন এই অস্থিরতা? বৃটেনের মত দেশে যে দল ক্ষমতায় যায়, তারা হয় তো পার্লামেন্টে আসন পায় শতকরা ষাট ভাগ, বিরোধীদলগুলো পায় চল্লিশভাগ। আমাদের দেশে কেন শতকরা নব্বই ইজ টু দশ, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশী? কেনই বা ক্ষমতাসীনদের বিদায় এত নিষ্ঠুরভাবে হয়ে থাকে?

প্রথমত : এর জন্য প্রথম দায়ী হলো যারা আমাদের নামে বদনাম দিয়ে থাকেন

তারাই। অনুন্নত দেশের অধিকাংশ দেশই দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের কলোনীর আওতায় ছিল। তারা এই সমস্ত দেশের জনগণকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করেননি। বরং নিজেদের জাতির মধ্যে অহেতুক শোবা-সন্দেহের জাল বিস্তার করে গিয়েছেন। তাদের প্রচারমাধ্যমগুলো কোন ভবিষ্যত নেতার নামে এমনভাবে প্রচার শুরু করে যাতে জনগণের মধ্যে তার গুনের চাইতে ক্যারিশমার প্রভাব বেশী হয়ে পড়ে। বিদেশী সংবাদমাধ্যম পর্যন্ত তাদের নেতাকে শ্রদ্ধা করে। এই কথা জানার পর অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত জনগণের তো আর হুঁশ থাকে না। ফলে তারা পারসোনালিটি কাল্টের শিকার হয়ে পড়ে। ক্ষমতায় বসানোর পর নেতার মধ্যে আকাংখিত গুণের অনুপস্থিতিতে বিস্মিত হতে হয়। পরে পিছনের ভুলকে শোধরানোর জন্য পূর্বের তুলনায় ক্ষিপ্র গতিতে একদিনের মাথায় মণিকে পায়ের তলায় ফেলতেও দ্বিধা করে না। তাছাড়া রাজনীতিতে তাদের পছন্দসই লোককে উঠানো নামানোর মহান কাজে তাদের দূতাবাসগুলো সদা তৎপর থাকে। যে দেবতা যে ভোগ পছন্দ করে তাকে তাই দিয়ে ক্রয় করার পবিত্র কাজের ব্যাপারেও তাদের কোন লজ্জা নেই।

দ্বিতীয়ত : যারাই একবার জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসেন, এরপর আর জনগণের তোয়াক্কা করেন না। ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার নানা কৌশল এবং বাহানা খুঁজতে থাকেন। যেখানে কোন বাহানায় কাজ হয় না সেখানে ডান্ডাবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিরোধীদলগুলোকে ঢালাওভাবে দেশদ্রোহী বলে গালি না দিলে তো মন্ত্রীদের পেটের ভাত হজম হয় না। কে দেশপ্রেমিক আর কে দেশদ্রোহী এই রায় দেয়ার মালিক জনগণ। সরকারের গদি ঠিক রাখার তাগিদে অপরকে দেশদ্রোহী বলে গালি দেয়ার মত আহাম্মকি আর নেই। জনমতের যে সিঁড়ি দিয়ে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সেই সিঁড়িটিকেই তারা প্রথমে নষ্ট করেন। ফলে নামার মত কোন রাস্তাই আর থাকে না। শুধু উপরে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা-চরিত্র চলতে থাকে। অবশেষে একদিন নামতে হয় ঠিকই, কিন্তু অবস্থা হয় বড় করুণ। কেননা সিঁড়ি ছাড়া অপরের খোঁচায় গাছের উপর থেকে পড়লে হাত-পা-মাথা ইত্যাদি ভাঙ্গাই তো স্বাভাবিক।

তৃতীয়ত : রাজনীতির কোন নির্দিষ্ট গোল বা টার্গেট নেই। যেটা আছে সেটা হলো শুধু ক্ষমতা। আদর্শের কথা যা বলা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। একেতো দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ষড়যন্ত্রে মৌলিক মানবীয় গুণাবলী এবং চরিত্রের অনেক কিছুই আমাদের চরিত্রে নেই, তদুপরি আদর্শিক শূন্যতা। যেমন আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শের কোন সুস্পষ্ট রূপরেখা আজও নেই। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, আল্লার উপর ঈমান এই সবকিছুর জগাখিঁচুড়ি এক হাস্যাস্পদ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেরই এই অবস্থা। একদল যে আদর্শের কথা বলে তাদের ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার পর নতুন আরেক দল এসে বলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কথা। ফলে জনগণ নানা সন্দেহে নিপতিত হওয়ার পর আদর্শিক

বুলির কচকচানির প্রতি তাদের আর কোন আগ্রহ থাকে না। ফলে জনগণ তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য কোন আদর্শিক মানদন্ডের প্রয়োজনবোধ না করেই নেতা নির্বাচন করে থাকেন। এরই পরিণতি খুব দ্রুত নেতৃত্বের পরিবর্তন বা অপসারণ। জনগণকে এ ব্যাপারে শিক্ষিত করার দায়িত্ব ছিল সরকারের। সরকার এ ব্যাপারে মারাত্মকভাবে ফেল করেছেন।

চতুর্থত : এই সমস্ত দেশের সরকার যে মহান কাজটা করে থাকেন তা হলো ষড়যন্ত্র করে বিরোধী দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি। কোন বিশেষ গ্রুপকে বিশেষ সুযোগের আশ্বাস দিয়ে অথবা সেলামী দিয়ে দলের অন্যদের কাছ থেকে নেতৃত্ব কুক্ষিগত করার উস্কানি দিতে থাকেন। ফলে প্রায় রাজনৈতিক দলগুলোই নানাভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অপরের ঘরে সিঁদ কাটতে গেলে নিজের ঘরতো খালি রেখেই যেতে হয়। তাই নিজের ঘরেও অনেক সময় অজান্তেই ভাঙ্গার আওয়াজ উঠতে থাকে। এভাবে একদল বহুদলে বিভক্ত হওয়ার পর অবস্থা এমন হয় যে, মোকতাদী ছাড়াই ইমামগণ দাঁড়িয়ে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এই বাক্যই সান্ত্বনা যে, 'তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে তবে একলা চলরে।'

পঞ্চমত : রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন স্বীকৃত মূল্য নেই। যেমন পার্লামেন্টের ভূমিকা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতারই কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। প্রকাশ্য দিনের আলোকে তারা পার্লামেন্টকে শুয়োরের খোঁয়াড় বলে গালি দেয়, সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলে। এ ব্যাপারে প্রায় সময়ই পার্লামেন্টের মর্যাদা ভঙ্গ শুরু হয় সরকারের কাছ থেকে। এরও কারণ আছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ ক্ষমতাসীনরাই সামরিক বাহিনীর লোক। তাঁরা গায়ের জোরেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতা দখল করেছেন। তাদের স্বাভাবিক মানসিক মেকআপ হোল কোন সমস্যার সমাধানের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা। রাজনৈতিক সমাধানের কোন ধারই তারা ধারেন না। তাছাড়া অনেক সময়ই নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কম থাকাতে নিজেদের মধ্যে থাকে ইনফেরিওরিটি কমপ্লেক্স। কাছাকাছি কোন বুদ্ধিমান বা রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকের অস্তিত্ব থাকলে তারা নিজেদেরকে মোটেই নিরাপদ করেন করেন না। তাই দেশ থেকে বেছে বেছে 'হিজ মাস্টার ভয়েস' মার্কা কিছু লোককে মন্ত্রী-মিনিস্টার নিয়োগ করে থাকেন। তারা রাজনৈতিক সমাধানে পার্লামেন্টের গুরুত্ব কি অনুধাবন করবেন? বরং তারা তো 'রাজা যত পরিষদ দলে বলে তার শতগুন'-এর সার্থক প্রতিনিধিত্ব করবেন।

ষষ্ঠত : রাজনৈতিক পোলারাইজেশনের দোহাই দিয়ে যে মোর্চা বা ফ্রন্ট গঠন করা হয়, তা আরেকটা ভুল পদক্ষেপ। একটা সাময়িক ইস্যুতে বৃহত্তর শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য দু'চারটে দলকে একত্রিত হতে দেখলেও তাদের পক্ষে দীর্ঘদিন একসাথে কাজ করা অসম্ভব। কারণ ভিন্ন ভিন্ন দলের কর্মীদের টেম্পারমেন্ট ভিন্ন। সর্বোপরি স্বার্থের কোন্দল, বৃহত্তর শত্রুর অনুপস্থিতি অথবা ক্ষমতার ভাগাভাগিতে গরমিল হওয়া ইত্যাদি কারণে ঐক্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ আমাদের দেশের ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট ও ভারতের জনতা সরকার। বৃটেনের মত গণতান্ত্রিক দেশেও কোয়ালিশন সরকার ভালমত কাজ করতে পারেনি। সুতরাং মোর্চা বা ফ্রন্ট কোন সমাধান নয়।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আমাদের রাজনীতি-২

দৈনিক সংগ্রাম, ০৪ জুন ১৯৮০

গত ২২শে মে 'রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আমাদের রাজনীতি' শিরোনামে লেখাটির ১ম অংশ প্রকাশিত হয়। বলেছিলাম, পরের বুধবারে অর্থাৎ ২৮শে মে বাকী অংশ সমাপ্ত করবো। কিন্তু বিশেষ কারণে ঢাকার বাইরে অবস্থান করার কারণে সে ওয়াদা পালন করতে পারিনি। আজ আমার বাকী অংশ নিয়ে পাঠক সমাজের কাছে হাজির হচ্ছি।

ইতোমধ্যে অনেক কান্ডকীর্তিই ঘটেছে। কোন একটি রাজনৈতিক দলের জনসভায় ভুট্টো মার্কা স্টাইলে সাপ চালান দিয়ে বোমা ফাটিয়ে যে নজীরবিহীন পাশবিকতা প্রকাশ করা হয়েছে তা নিয়েও কিছু লেখার প্রয়োজন ছিল। অনেকে ইতিমধ্যেই অনেক কিছু লিখেও ফেলেছেন। এ ধারা বেশ কিছুদিন চলবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কেননা এত বড় জঘন্য কারবারকে এতটুকুতেই ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। তবে আজকে শুধু আমার বাকী অংশটুকু লিখেই আপাততঃ শেষ করছি।

গত লেখাতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য আমরা ছয়টি বড় বড় কারণ উল্লেখ করেছিলাম। আজ উক্ত কারণগুলো দূর করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করবো।

প্রথমতঃ দেশের রাজনীতিকে অযথা আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথে জড়িত করে পরাশক্তির লেজুড়বৃত্তি করার হীন মানসিকতা পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বের কোথায় কি ঘটেছে রাজনৈতিক নেতাদের অবশ্যই তার খোঁজ-খবর নিতে হবে, ভিয়েতনামে বৃষ্টি হলে বাংলাদেশে ছাতা মাথায় দিতে হবে, ওয়াশিংটনের খরায়

ঢাকার রাজপথে ঘর্মাক্ত কলেবরে পাখার বাতাসের প্রয়োজন দেখা দিবে, এই হীন মানসিকতায় আমরা কেন ভুগছি? ইউরোপের কমিউনিস্টরা তো সোভিয়েত-রাশিয়ার অনেক ভূমিকা সমর্থন করে না, ইউরোপের বহু দেশ তো আমেরিকার বিরোধিতা করলেও তাদের গণতান্ত্রিক সনদপত্র বাতিল হয় না। তবে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কেন সেবাদাসগিরি করার জন্য এই প্রতিযোগিতা? এ কারণ কি তাহলে অন্য কিছু? 'যাদের নুন খাই তাদের গুণ গাই' এমন কোন হেতু কি অন্ধ দালালির মাঝে লুকিয়ে আছে?

এই ঘৃণ্য মানসিকতা পরিহার করতেই হবে। সকল রাজনৈতিক নেতাদেরকেই এই ব্যাপারে একমত হওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক সুস্থ কার্যকলাপের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন একটা মূল্যবোধই প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে যে কোন দলের অন্ধ লেজুড়বৃত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ার সাথে সাথে জনগণ তাদেরকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। আমাদের দেশের নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে পরাশক্তির অযথা নাক গলানোর ব্যাপারে সকলকে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ ক্ষমতা পাওয়ার সমস্ত চোরাগলিকে পরিহার করতে হবে এবং জনগণের রায়ের প্রতি থাকতে হবে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। এ ব্যাপারে যারা ক্ষমতায় আছেন তাঁদের দায়িত্ব যেমন, যারা বিরোধী দলের ভূমিকায় কাজ করছেন তাদের ভূমিকাও তেমন। একবার জনমতের বলে ক্ষমতা পেলে এরপর জনগণেকে এ ক্ষমতাও দিতে হবে, যাতে তাদের অপছন্দের সরকারকে তাঁরা ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন। জনগণের নতুন চিন্তার ফলে ক্ষমতা হাতছাড়া হতে পারে এরূপ আশংকায় জনগণের ক্ষমতাকে কাটছাঁট করার মত আহাম্মকি কোনক্রমেই করা উচিত নয়। অপরদিকে বিরোধী দলগুলোকেও পরবর্তী রায়ের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার মত ধৈর্যধারণ করা উচিত। অযথা ক্ষমতার লোভে অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই।

তৃতীয়তঃ রাজনীতির জন্য একটা নির্দিষ্ট টার্গেট বা গোল নির্ধারণ করতে হবে। 'যখন যেমন তখন তেমন হায় হোসেন' এই ফালতু নীতি পরিত্যাগ করতে হবে। নিজের আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হোক আর না হোক, ক্ষমতা লাভের জন্য যা বিশ্বাস করি না তাই বলে জনসমর্থনকে নিজের দিকে পাওয়ার মত মোনাফেকী আচরণ সকলের জন্য পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত। জনগণের মানসিকতা ভারতবিরোধী হলে ভারতের বিরুদ্ধে অযথা হলেও গালি দিতে হবে, আবার সদ্য ভাদ্র মাসের কইমাছ ভাজার মত গদির চেয়ারের লোভ সামলাতে না পেরে ভারতপন্থীদের সাথে ঐক্যের ডামাডোল বাজানোর জন্য নির্লজ্জ অভিনয় করার মত ভন্ডামি করতে হবে, এ কেমন কথা? এ সুবিধাবাদী চরিত্রের রাজনীতিতে জনগণের কি মঙ্গল আছে?

চতুর্থতঃ ষড়যন্ত্র করে অপরের দলে অনুপ্রবেশ করে তাদের কিছু নেতাকে প্রয়োজন বোধে টাকা দিয়ে ক্রয় করে দল ভাঙ্গার মত মহান (?) কাজে শরীক হতে হবে এমন

চিন্তা করাকেও অন্যায় মনে করা উচিত। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সরকারকে উন্নত নৈতিকতার নিদর্শন স্থাপন করতে হবে। এই মারাত্মক খেলায় অবতীর্ণ হয়ে আপাততঃ যে সুফল পাওয়া যায়, তার পরিণাম ফল ভাল নয়। সরকারের এই জঘন্য চরিত্রের প্রভাব তার সমস্ত মেশিনারীর উপর পড়ে। ফলে জাতির মধ্যে অযথা শোবা-সন্দেহের সৃষ্টি করা হয়। এমনকি নিজের দলে ঐক্য রাখাও শেষ পর্যন্ত দায় হয়ে পড়ে।

পঞ্চমতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মর্যাদার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিত। দেশের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তকারী সংস্থাকে পাশ কাটিয়ে সুবিধামত আইন করে পরে শুধু নিজের দলের লোকদের হাত উচুঁ করার জন্য পরিষদে বিল পেশ করে বিল পাস করানোর প্রহসন অবশ্যই পরিত্যাজ্য। সরকার নিজেই যদি সংসদের মর্যাদা রক্ষায় ব্যর্থ হন তাহলে বিরোধী দল সংসদের মর্যাদা রাখবে কিভাবে ?

অপর রাজনৈতিক দলের সভা, মিছিল, মিটিং-এ গুন্ডামি করাকে সর্বসম্মতভাবে ঘৃণা করতে হবে। মানুষের অধিকারের ভিত্তিতে তাদের নিজেদেরকেই সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দিতে হবে। তাদের চিন্তা ভাবনা, স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি হস্তক্ষেপ করাকে গুরুতর অন্যায় বলে বিবেচনা করতে হবে।

অপর দলের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা, অপবাদ, ফাহেশা গালি-গালাজকে রাজনৈতিক ক্রাইম বলে গণ্য করা উচিত। এমনকি এমন ঘৃণ্য কাজে জড়িত ব্যক্তির কোর্টে বিচার হওয়ার জন্য আইন পাস করা একান্ত কর্তব্য। অপরের সমালোচনা করার মধ্যেও একটা শালীনতা বা ভদ্রতা বজায় রাখার ব্যাপারে সবাইকেই দায়িত্বশীলের ভূমিকা পালন করতে হবে।

ষষ্ঠত: রাজনৈতিক মোর্চা বা ফ্রন্ট গঠন রাজনৈতিক সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান নয়। বরং কয়েকদিন যাওয়ার পর এই ধরনের মোর্চা বা ফ্রন্ট এমন লজ্জাস্কর কাজের প্রদর্শনী করতে থাকে, যাতে দেশের জনসাধারণ তাদের নেতাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আস্থা এবং মর্যাদা হারায়। কোন একটা বিশেষ ইস্যুকে নিয়ে ফ্রন্ট গঠন করার পর সে কারণ দূরীভূত হলে আবার যার যার সংগঠনের প্রোগ্রাম অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে কাজ করা উচিত।

রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পন্থায় অগ্রসর না হয়ে ষড়যন্ত্র করে, রাইফেল দেখিয়ে অথবা গায়ের জোরে ক্ষমতা বেশীদিন আঁকড়ে রাখা যায় না। ইতিহাস এ সাক্ষ্য অনেক নির্মমভাবে অসংখ্যবার করেছে। তবুও আমাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। বরং অবস্থার চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত পরবর্তী উত্তরাধিকারীর জন্য আমরা শুধু ইনভেলপ বানিয়ে চলেছি। ইনভেলপের কথা মনে উঠতেই একটা গল্প মনে পড়ে গেল। এ গল্পের মাধ্যমেই আজকের লেখার ইতি টানতে চাই।

কোন প্রবল ক্ষমতাসীন রাজাকে প্রচন্ড গণবিস্ফোরণের মুখে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তাঁর উত্তরাধিকারী এসে প্রবীণের কাছে কিছু পরামর্শ চাইলেন। বিদায়ী রাজা

তাকে বললেন, 'যতদিন পার নিজের বুদ্ধিতে চালাও। আমি তোমাকে তিনটা ইনভেলপ দিয়ে যাচ্ছি। বিপদে পড়লে প্রথম নম্বর ইনভেলপটা খুলবে। ওটার নির্দেশমত কাজ করলে আর কিছুদিন চলবে। এরপর বিপদে পড়লে দ্বিতীয় নম্বরটা খুলবে। সেই অনুযায়ী কাজ করলে আরও কিছুদিন চলবে। এরপরও বিদ্রোহ অব্যাহত থাকলে তৃতীয় ইনভেলপ মত কাজ করবে।

যথারীতি দু'এক বছর স্বাভাবিকভাবে চললো। জনগণ নতুন রাজার কাজের ভাল ফলের আশায় দিন গুনছে। কিন্তু অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন না দেখে বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্যায় শুরু হলো। তখন রাজা প্রথম নম্বর ইনভেলপ খুলে দেখলেন, 'যাবতীয় অসুবিধার জন্য পূর্বের ব্যবস্থাপনাকে দায়ী করতে থাক।' যথা উপদেশ তথা কাজ। কিন্তু অপরকে গালি দিয়ে বেশীদিন নিজের ত্রুটি ঢাকা যায় না। ফলে বছরখানেকের মধ্যে দ্বিতীয় ইনভেলপ খুলতে হলো। খুলে দেখলেন, 'প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করতে হবে।' উপদেশ মত কাজ চললো, জনগণ কিছুটা আশ্বস্ত হলো যে এইবারে বোধহয় কিছু কাজ হবে। কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরং।

এরপর বিদ্রোহ এমন প্রচন্ড আকার ধারণ করলো যে, তা দমন করার কোন যোগ্যতা রাজার নাই। জনগণ কয়েকবার ধোঁকা খেয়ে এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে যে তারা আর কোন ভাঁওতায়ই ভুলতে রাজী নয়। নিরুপায় হয়ে রাজা তৃতীয় ইনভেলপ খুললেন। খুলে দেখেন, 'এখনই হলো তোমার পরবর্তী রাজার জন্য আর তিনটি ইনভেলপ তৈরী করার উপযুক্ত সময়।'

একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে

দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১

বেশ কিছুদিন আগের একটা পুরানো গল্প দিয়েই শুরু করছি। গল্পটি এই কলামেই ভিন্ন প্রসঙ্গে অবতারণা করা হয়েছিল। আজকের বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য থাকায় পুনরুল্লেখ করতে হচ্ছে। কোন এক স্বৈরাচারী শাসক প্রবল গণবিরোধের মুখে গদীচ্যুত হোল। তারই এক সুচতুর অনুসারী ভিন্ন মতালম্বীদের দলের নেতা হয়ে ক্ষমতা দখল করে নিল। রাতের অন্ধকারে কোন এক গোপন আস্তানায় গদীচ্যুত মুরুব্বীর সাথে শিষ্যের দেখা হলে শিষ্য কিছু পরামর্শ চাইল। ক্ষমতাচ্যুত ওস্তাদ শিষ্যকে তিনটি ইনভেলাপ দিয়ে বললো, "প্রথমে নিজের বুদ্ধিমত চালাবে। অসুবিধায় পড়লে প্রথম ইনভেলাপ খুলবে। তাতেও বেশ কিছুদিন চলবে। এরপর অসুবিধায় পড়লে দ্বিতীয় ইনভেলাপ খুলবে। তাতেও বেশ কিছুদিন নির্বিঘ্নে চলতে পারবে। এরপরও অবস্থা বেগতিক দেখলে তৃতীয় ইনভেলাপ খুলবে। এবং এটাই শেষ পরামর্শ।"

বেশ কিছুদিন ভালমত বিপ্লবী জনতার অন্ধ সমর্থনে চললো। কিন্তু জনগণ তাদের আশা-আকাংখার বাস্তবায়ন না দেখে ক্রমে ক্রমে ক্ষিপ্ত হতে থাকলো। তখন নিরুপায় হয়ে নতুন শাসক ওস্তাদের দেয়া প্রথম ইনভেলাপ খুলে দেখলো, "বর্তমানের পরিস্থিতির জন্য পেছনের শাসককে যত পার গালিগালাজ কর।" তাতেও গেল বছর খানেক। কিন্তু শুধু গালিগালাজে বেশী দিন চলে না। তাই পরিস্থিতির চাপে পড়ে দ্বিতীয় ইনভেলাপ খুলতে হোল। সেখানে লেখা আছে, "প্রশাসনকে পুনর্গঠিত কর।

নতুন নতুন বিপ্লবের ডাক দাও।" কথামত কাজ হোল। তাতেও বেশ কিছুদিন কাটলো। কিন্তু ভন্ডামি আর প্রতারণা করে তো বেশীদিন চলে না। তাই এবারে প্রবল গণজোয়ারের উত্তাল তরঙ্গের সর্বগ্রাসী রূপ দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তৃতীয় ইনভেলাপ খুলে দেখলো, "পরবর্তী ব্যক্তির জন্য তুমিও তিন খানা ইনভেলাপ তৈরী কর।"

বাংলাদেশে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের শিখন্ডী সরকারের কক্ষচ্যুতির পর জনতার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ক্ষমতাসীন হলেন বর্তমান সরকার। কিছু রদবদল আর ষড়যন্ত্রের পর নভেম্বরে সিপাহী জনতার বিপ্লবের পর আসন আরো পাকাপোক্ত হোল। কিন্তু জনগণের অবস্থার কী উন্নতি হোল? অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগেই বা আকাংখিত কি পরিবর্তন হোল? সমস্ত দোষ দায়দায়িত্ব বাকশালীদের ঘাড়ে চাপানো হোল। তারা দোষের ভাগী নি:সন্দেহে। কিন্তু কোন স্বৈরশাসন সেই বাকশালী জুজুর ভয় দেখিয়ে জাতির ঘাড়ে স্থায়ীভাবে চেপে বসার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে আমাদের আপত্তি সেখানেই।

প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে। এখন বাকশালী আমলের মহাকুমা গভর্ণরদের পরিবর্তে প্রতি গ্রামেই গ্রাম সরকার গঠিত হয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদ থেকে নির্বাচনের পর মন্ত্রী পরিষদ। তারপর তাতেও রদবদল। আবার শুনছি, নতুন করে আরেক দফা রদবদল আসন্ন। হয়তো দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে দুয়েকজনকে বাদ দিয়ে শেষবারের মত মুখ রক্ষা করার প্রচেষ্টা চলবে। নারীদের ব্যাপারে কর্তা ব্যক্তিদের কৃপা দৃষ্টি পড়েছে সবচেয়ে বেশী। তাদের অবলা অবস্থা থেকে পুলিশে ভর্তি করা হয়েছে। নারী হাতের রিভলবার আর রাইফেলের কতটা সদ্ব্যবহার হয়েছে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। বিগত পার্লামেন্টে দায়িত্বশীল মন্ত্রীর রিপোর্ট থেকেও স্পষ্ট বুঝা যায়, এ পদক্ষেপ মোটেই সার্থক হয়নি। অস্ত্রপাতিসহ মহিলা পুলিশরা যে নিরাপদ নয় তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তাদের হোস্টেলের সেন্ট্রিতে পুরুষ পুলিশ নিয়োগের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তবুও চেষ্টার ত্রুটি নেই মায়ের জাতিকে বাপের জাতি বানানোর। ইদানীং রাষ্ট্রপ্রধান একটি উক্তি করেছেন মহিলাদের মহাসম্মেলনে। তাহলো, মহিলারা বাইরের কাজে অংশগ্রহণ না করায় নাকি বছরে ৪০ কোটি কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। ফলে জাতি দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। তাদের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করা নাকি একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এমনকি তাদেরকে বিদ্রোহ করার উস্কানীও দেয়া হয়েছে।

পরিসংখ্যানের হিসেবে সব কিছু বিচার করা এক কথা। আর বাস্তবতা অন্য কথা। আমাদের দেশের মহিলারা যে কাজগুলো করেন তার মর্যাদা কম কোন যুক্তিতে? সন্তান প্রতিপালন ও প্রাথমিক শিক্ষাদান, বাড়ীর রান্নাবান্না, সাংসারিক অন্যান্য কাজ-কারবার যেমন হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে কিছু অর্থ উপার্জন- এ কাজগুলো ছেড়ে মহিলারা রাস্তায় নামলে এগুলো কারা করবে? হয়তো বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলবেন, ঝি এবং চাকরানীরা করবে। এখন মুশকিল হোল তারাও তো মহিলা। উপরন্তু মায়ের বিকল্প ঝি-চাকরানী একথা মস্তিস্কে বিকৃতি ঘটার আগে কেউ স্বীকার করতে রাজী হবেন

বলে তো মনে হয় না। এরপর রান্না-বান্নার কাজগুলো কে করবে? চাকর অথবা চাকরানী সে হয় পুরুষ না হয় মহিলা। তাদের কর্মঘণ্টা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কি? এসব হিসেবের গোলমালের উৎস কোথায়?

আসলে গোলমাল অন্যখানে। যারা পরিকল্পনাকারী অথবা তথ্য সরবরাহকারী গোলমাল হলো তাদের মাথায়। তারা এ দেশীয় লোক বলে ঠিক মনে হয় না। অথবা কিছুদিন ধরে লিপিস্টিক মার্কা স্ত্রী আর হিপ্পি মার্কা সন্তান সন্ততিসহ শহরে জীবন-যাপন করার পর পেছনের সবকিছু কি ভুলে গেছেন। বেগম সাহেবার ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে ক্লাব আর সমিতিতে যাতায়াত দেখে তারা কি ভুলে গেছেন যে, গ্রামের মায়েরা ভোরে আযানের সময় সকলের আগে ঘুম থেকে উঠেন আর রাত্রিতে সকলের শোয়ার পর ঘুমাতে যান। নিজের বাড়ীতে সরকারী সাহায্যে অথবা বাম হাতের আয়ে ডজন খানেক চাকর চাকরানী রেখে নিজেদের কোন কাজ নেই বলে সারা গ্রাম বাংলায় কি এই অবস্থাই বিরাজমান ? তারা তো নিজেদের বাড়ীতে দেখেন বেগম সাহেবাদের কাজ হলো কাঁটায় দুয়েকটু উল বুনানো আর সারাদিন গল্প-গুজব, খাওয়া-দাওয়া, দুপুরে লম্বা সময়ের জন্য সুখ নিদ্রা, রাত্রে টিভি দেখার পর শুয়ে পড়লে কমপক্ষে পরের দিন সকাল নয়টা পর্যন্ত ঘুমানো। তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়েই দাস-দাসীদের তৈরী বেড-টি সেবন। এহেন অবস্থায় যারা ধানমন্ডি, ইস্কাটন আর গুলশানের তিনতলা বাড়িতেই স্থায়ী নিবাস করে নিয়েছেন তাদের পরিকল্পনায় দেশ চললে অবস্থার কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। মাননীয় প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুরোধ, অনুগ্রহ করে এই সমস্ত বাংগালী সাহেবদেরকে টি-এ, ডি-এ, ছাড়া একবার মাস তিনেকের জন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিন জমি-জমা চাষ করার জন্য। পরীক্ষামূলকভাবে বাড়ী থেকে চাকর চাকরানীগুলো বিদায় করে দিন। বেগম সাহেবাদের জন্যও ভিন্ন কোন ব্যবস্থার দরকার নেই। এরপর তাদের কাছ থেকে কর্মঘণ্টা নষ্টের হিসেব নিন। তাহলে আশা করা যায় এই ভদ্রলোকেরা সঠিক হিসেব দিতে সক্ষম হবেন। মাটির সাথে যোগাযোগ বিহীন এই পরগাছা সম্প্রদায় প্রত্যেক শাসককেই বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে রেখে নিজেদের সুবিধা আদায় করে। শেষ মুহূর্তে সুবিধা বুঝে উঠতি শক্তির সাথে গোপনে আঁতাত করে আখের গোছানোর পাকা ব্যবস্থা আগেই করে নেয়।

কর্মঘণ্টা নষ্টের হিসেব ধরলে বরং পুরুষদের নষ্ট হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। আনএমপ্লয়মেন্ট এবং আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট এক সাথে যোগ করলে সত্যিকার অর্থে পুরুষদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি দেশে প্রায় প্রতিটি পুরুষ নাগরিকই ছয় ঘণ্টা বা আট ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের পর হালকা পরিশ্রমের এবং কিছুটা ভিন্নধর্মী কাজ করেন। আমাদের দেশে সেরুপ কোন ব্যবস্থা তো মোটেই নেই। পুরুষদেরই যেখানে কর্মসংস্থান নেই সেখানে মহিলাদেরকে নিয়ে এত হৈচৈ-এর অর্থ কি ?

তারপরও প্রয়োজনে মহিলাদেরকে অবশ্যই বাইরের কাজ করতে হবে। এতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। মহিলাদের জন্য ভিন্ন ব্যাংকিং সার্ভিস চালু করে, শিশু শিক্ষায় তাদেরকে দক্ষ শিক্ষিকা হিসেবে গড়ে তুলে, নানা ধরনের কুটির শিল্পে মহিলাদের নিয়োগ করে, মহিলাদের জন্য ভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খুলে চাকুরীর ব্যবস্থা করে এ কাজ সমাধা করা সম্ভব। বিসিকের আওতাধীনে প্রতি জেলায়ই ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট নামে বেশ কিছু জায়গা-জমি পড়ে আছে। এ পর্যন্ত শতকরা ১৮ থেকে ২০ ভাগের বেশী কোথাও কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। এই সমস্ত জায়গা-জমির সঠিক ব্যবহার হলে শুধু দালান-কোঠার বেগম সাহেবাদেরই শুধু নয়, রাস্তার দুস্থা মহিলা এবং পতিতাদের বিরাট একটা অংশকেও পুনর্বাসিত করার স্থায়ী ব্যবস্থা করা যায়। আমাদের পরিকল্পনাবিদদের অত সূক্ষ মাথায় এই মোটা বুদ্ধির পরামর্শগুলো ঢুকবে কি'না জানি না। তবে সনির্বন্ধ অনুরোধ হাওয়াই পরিকল্পনায় শ্লোগান না তুলে দয়া করে বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। আপনাদের বিভিন্ন ধরনের বিপ্লব আর মুক্তি আন্দোলনে আমরা বেচারা জনগণের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। আপনাদের যে বুদ্ধিমত্তা আর আধুনিকীকরণের কৌশলে নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামে পরিণত করছেন, অনুগ্রহ করে ঐ যাদুর কাঠির স্পর্শ দিয়ে দেশের নয় কোটি মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করবেন না।

সমস্যা সমাধানের রাস্তার জন্য দেশের গণমানুষের সাথে সংযোগ অপরিহার্য। বাংলাদেশী চেহারায় পাশ্চাত্য অথবা অন্য কোন মস্তিস্ক খুবই বেমানান। অন্যান্য দেশে যা করা হয় আমরা জাতি হিসেবে ভিন্ন হওয়ার কারণেই এখানে হুবহু তা অচল। ধনী ভদ্রলোকদের মুখে রুমাল দিয়ে হাসতে দেখে গরীব বৈরাগীর একমাত্র লুঙ্গি খুলে মুখে দিলে দর্শকমন্ডলীর শুধু হাসির খোরাকই হবে না। বৈরাগীর মর্যাদা ও আসন নিয়ে টান পড়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।

শিক্ষিতের অযৌক্তিক সংলাপ

দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ ১৯৮১

অশিক্ষিত বা সমাজের নীচের তলার লোকেরা মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল দু'চার কথা বললে অনেকেই হজম করে নেয়। কারণ তারা তো আধুনিক যুগের মহান (?) শিক্ষার সাথে পরিচিত নন। আবার ধানমন্ডি, গুলশানের প্রগতিবাদীদের মত মডার্ণ কালচারের সংস্পর্শও পাননি। ফলে কথা-বার্তায়, চলনে-বলনে তাদের বেশ কিছু ফাউল কর্মকান্ডের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিয়ে বিবেচনা করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু যারা গণতন্ত্রের কথা বলতে বলতে মুখ দিয়ে ফেনা নির্গত করেন, প্রগতির কথা বলতে বলতে গর্তে পড়লেও সামনে গতি অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর, সর্বহারার প্রেমে যাদের এয়ারকন্ডিশন রুমে চোখে ঘুম আসে না, স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে বিদেশী মিশনের বিভাগীয় শাখায় চব্বিশ ঘণ্টায় কমপক্ষে একবার নতজানু হয়ে সবক নিতে না গেলে পেটের ভাত হজম হয় না, একা শিক্ষাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ফেডারেশন গঠন করে শিক্ষাকে উদ্ধারের মহান প্রচেষ্টায় রত, এমন কি সেখানেও দেশী লোকের দ্বারা সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা না দেখে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে বুদ্ধিজীবী ভাড়ার কাজে দৌড়াদৌড়িতে পায়ে ফোসকা ফেলেছেন, তারা যদি বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে আবোল-তাবোল বলতে থাকেন তাহলে আমাদের মত বিদ্যাবুদ্ধিহীন লোকদের অবস্থা কি !

যাদেরকে নিয়ে আমরা দেশের ভবিষ্যত কল্পনা করি, যাদের মহান পেশায় আমরা গৌরবে আর অহংকারে মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক সেমিনারে বুক ফুলিয়ে কথা বলি, তাদের বুদ্ধির ডিগবাজী দেখলে তো আর ভরসা পাই না। আজ এমনি একজন

ব্যক্তির শিক্ষা সম্পর্কিত একটি ভাষণ নিয়ে কিছু লিখব বলে কয়েকদিন আগে থেকেই ভাবছিলাম।

বিগত ২৫ থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন কর্তৃক "শিক্ষা ও পরিকল্পনা সেমিনার" অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেমিনারে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত প্রতিনিধি ছাড়াও কয়েকজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বক্তাদের টার্গেট ছিল প্রধানত: একটা। সেই টার্গেটে পৌঁছার জন্যে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা। টার্গেটটি ছিল ধর্মীয় শিক্ষার বিলুপ্তি সাধনের জন্য সুপারিশ তৈরী করা। তারা তাদের টার্গেটের অধিকাংশটাই পুরা করছেন। কমপক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষা বিলুপ্তির জন্য সুপারিশ তৈরী করার মত বীরোচিত কাজ তো তারা সমাধা করেছেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন ফেডারেশনের সভাপতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক।

সভাপতি হিসাবে তিনি ঠিকই করেছেন। নামাজি লোকদের ইমামকে যেমন বেশী নামাজি হওয়ার প্রয়োজন, তেমনি ডাকাতের দলের ইমামকে সর্বাপেক্ষা সাহসী ডাকাতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। যে সমস্ত শিক্ষক যথার্থ অর্থে শিক্ষা চান তাদের সভাপতিকে যেমন অগ্রণী ভূমিকা নিতে হয়, আবার যারা কোন শক্তিশালী প্রভুর ইংগিতে দেশের শিক্ষা-পরিবেশকে তছনছ করার কাজে ব্যতিব্যস্ত, তাদের নেতাকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হয় বৈকি।

তিনি তার বক্তব্যে শিক্ষার একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "শিক্ষা বলতে সাধারনতঃ আমরা বুঝি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন। এই বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস একটি ধারায় ও লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। যে ব্যক্তির জীবনে এই প্রয়াস যথোচিতরুপে পূর্ণতা লাভ করে সেই ব্যক্তিই শিক্ষিত বলে সমাদৃত হয়।" শিক্ষা সম্পর্কে তার কথাগুলো নি:সন্দেহে তার জ্ঞানের গভীরতা বহন করে। বিকাশের ক্ষেত্রে আদর্শের ততটা প্রয়োজন না থাকলেও উৎকর্ষের জন্য আদর্শের প্রয়োজন নিঃসন্দেহে। উৎকর্ষ শব্দটি অত্যন্ত চমৎকার। শব্দটির মাঝে পরিমার্জন, পরিশীলন দুই-ই আছে। সামগ্রিক আচরণকে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করতে হলে প্রবৃত্তির চাহিদাকে পূরণ করলেই চলে না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ দরকার হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রেই প্রবৃত্তির পাগলা ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হয় নীতিজ্ঞান বা আদর্শের। তার কথার শেষাংশে নির্দিষ্ট ধারা বা লক্ষ্যের কথা বলে বোধ হয় তিনি সেই ইশারাও করেছেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর যখন তিনি বলেন, "তথ্যভিত্তিক পরিকল্পিত শিক্ষাই একটি দেশকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সঠিকভাবে দিক নির্দেশ করতে পারে।" তার বক্তব্যের প্রথম উদ্ধৃতির সাথে দ্বিতীয় অংশের বৈপরীত্য পরিস্কার। শুধু তথ্য মানুষের সামগ্রিক আচরণকে পরিমার্জিত করতে পারে না।

এরপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করেছেন। বিশেষ করে ভাইস চ্যান্সেলরগণ সরকারী নির্দেশই শুধু পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র, শিক্ষা এবং শিক্ষার পরিবেশের দিকে খেয়াল রাখেন না। সরকারী হস্তক্ষেপের সকলেই বিরোধী। কিন্তু গোলটা বাধে তখন, যখন নিজের মনমত বা সুবিধামত সরকার ক্ষমতায় বসলে এই সমস্ত গণতন্ত্রবাদীরা শুধু নির্দেশ পালন করেই শেষ করেন না। শর্তহীনভাবে দালালীও করতে থাকেন।

১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত পরিসংখ্যান নিলে অনেকের চেহারাই আয়নায় দেখে দর্শক নিজেই লজ্জিত হবেন। নীতিবান শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি কাজ করতে খুবই অসুবিধায় পড়েন। কথাটা সত্যি। একদিকে সরকারী প্রশাসনের অযাচিত হস্তক্ষেপ, অন্যদিকে বেসরকারী সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ যারা সময় বিশেষে বিদেশী সাহায্যে সরকারের চাইতেও বেশী শক্তিশালী তাদের শ্বেত সন্ত্রাসের জন্য। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উপাচার্যের জন্য তিনি আক্ষেপ করেছেন তার ব্যাপারে এ কথা খাটে না। কে না জানে তিনি কোন একটি পার্টির অন্ধ সমর্থক ছিলেন। কে না জানে যে, সুস্থ ছেলেকে বিশেষ কায়দায় পাশ করানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক প্রভাষককে তারই আমলে নিয়োগ করা হয়েছে যারা কোন মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করার যোগ্যতা রাখে না। বাংলায় নোটিশ লিখতে ভুল করেন অথচ বাংলা বিভাগে প্রভাবশালী প্রভাষক। জনৈক আইনের ছাত্র শুধু রাষ্ট্রপ্রধানের আত্মীয় হওয়ার কারণে তিন বিষয়ে ফেল করার পরও উপাচার্যের বিশেষ কৃপায় পরীক্ষায় পাশ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনিই এক সময় টি, এস, সি'র বক্তৃতায় বলেছিলেন, "শুধু বঙ্গবন্ধুকে তোয়াক্কা করি, আর কাউকেই মানি না।" অর্থনৈতিক দুর্নীতির ব্যাপার তো আছেই। এরপরও তিনি নীতিবান কিসের মহিমায় ? বক্তা লুটেপুটে খাওয়ার আদর্শে বিশ্বাসী বলেই কি এত কিছু করার পরও তিনি নীতিবান থাকেন ?

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতার কথা বলেছেন। এখন কথা হোল এই অবাধ স্বাধীনতা কি কোন দল বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, না সকলের ক্ষেত্রে? তাহলে অন্যেরা স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করলে, তাদের প্রভু দেশের সমালোচনা করলে, জনধিকৃত ক্ষমতা হারানো দলের বিরুদ্ধে কথা বললে তারা এতটা অস্থির কেন? পৃথিবীর কোন্ দেশটাতে অবাধ স্বাধীনতা আছে। বৃটেনে ক্রাউনের সমালোচনা করা যায় কী? রাশিয়ার আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন শাখারভসহ অনেকের এমন মর্মবিদারক অবস্থা কেন?

এরপর তিনি অগ্রসর হয়েছেন ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি। বক্তব্যটা শুরু করেছেন বড় সুন্দর ভাষায়। "শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ আর ছাত্র সমস্যার মূল বিষয় তুলে ধরুন, আপনি ছাত্রদের উস্কানিদাতা হিসেবে চিহ্নিত হবেন। আপনি ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার কথা বলুন, আপনি ইসলামের শত্রু বলে আখ্যায়িত হবেন।" বক্তব্যের

বলিষ্ঠতা দেখে মনে হচ্ছিল যে, তিনি হয়তো বলবেন- "আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক অধঃপতন আর নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে নীতিজ্ঞান শিক্ষার কথা বলুন, আপনাকে প্রগতি বিরোধী বলে চিহ্নিত করা হবে।" বলাবাহুল্য এই অংশটুকু থাকলে আমাদের আলোচিত শিক্ষাবিদের নিরপেক্ষতার প্রমাণ মিলতো আর বক্তব্যটাও পূর্ণতা লাভ করতো। কিন্তু এতটুকু বলার মত উদারতা আর সাহসের অভাব দেখে বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশনের ব্যবস্থাপত্র নাকি খুব ভাল ও গণতান্ত্রিক ছিল। শুধু ভাল বললে আমাদের আপত্তি ছিল না। কেননা তিনি তো আপেক্ষিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক বলাতে আপত্তির কারণ অবশ্যই আছে। কমিশন রিপোর্টের শেষের দিকে আগাম শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কিছু প্রশ্নপত্র করা হয়েছিল যা সন্নিবেশিত আছে। সেখানে ১৭ নং প্রশ্নে উত্তরদাতার মতামতের জন্য চারটি বিকল্প আছে-

(১) সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম শিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়।

(২) সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় সকল ধর্ম সমন্বয়ে নীতিমালা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৩) ধর্মশিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত।

(৪) ভিন্নমত।

এই প্রশ্নের জন্য মোট উত্তরদাতা ছিলেন ৫৩৯৯ জন। এর মধ্যে এক নম্বরের জন্য মত দিয়েছেন ২৯৮ জন, দুই নম্বরের জন্য মত দিয়েছেন ৯৯৩ জন, তিন নম্বরের জন্য মত দিয়েছেন ৩৮৭৮ জন আর ভিন্নমত পোষণ করেছেন ২৩০ জন। এই পরিসংখ্যান রিপোর্টের শেষাংশে আজও সুরক্ষিত আছে। উল্লেখ্য যে, সেক্যুলার সরকারের স্বর্ণযুগে তাদেরই পছন্দমত ব্যক্তিদের কাছে প্রশ্নপত্র দেওয়ার পরও এই অবস্থা। কিন্তু শিক্ষা রিপোর্টে তার কোন প্রতিফলন আছে কি? যদি না থাকে তবে তা কিভাবে গণতান্ত্রিক বা গণমুখী। প্রকৃত প্রস্তাবে তা ছিল গণবিরোধী। যেমন বাংলাদেশের সবচাইতে পপুলার ব্যক্তিও গণমানুষের আদর্শের বাইরে যাওয়ার কারণে সপরিবারে নিহত হয়েছেন। ১৮ নং উত্তরটির পরিসংখ্যান নিলেও একই চিত্র পাওয়া যাবে।

এরপর মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতনের ব্যাপারেও তার হিংসার অন্ত নেই। তাদের মত তারা আধুনিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে এত টাকা বেতন পাবেন কেন? তাহলে তাদের পক্ষ থেকেই উল্টো প্রশ্ন যে, সাধারণ গণমানুষের আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেও সাধারণ মানুষের টাকায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কিভাবে শিক্ষকতা করেন? ইসলামী আদর্শের নিম্নতম জ্ঞান না থেকেও মুসলিম সমাজের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তারা পাবেন কেন? ইসলামী শিক্ষার বিরোধীতা করলেও তাদের

ইসলামবিরোধী বলা যাবে না কেন? সর্বোপরি ভিন্ন দেশের আদর্শে যেসব বুদ্ধিজীবী পরিচালিত তাদেরকে বাংলাদেশী বলা হবে কেন?

শিক্ষার দুই ধারার পরিণতি খারাপ। এটা আমরা বিশ্বাস করি। তাতে জাতি অনৈক্যে নিপতিত হবে। ধারা হবে একটাই। তবে তা কি হবে ? জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিরা কুদরতে খুদা কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখিত প্রশ্নমালায় ১৭ এবং ১৮ নং প্রশ্নের উত্তরেই তা জানিয়ে দিয়েছেন। এখানে বিতর্ক তোলার অবকাশ কোন গণতন্ত্রীর নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর সম্পর্কেও তিনি কথা তুলেছেন। তারা স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন এটা কোন কোর্টে প্রমাণিত হয়েছে। তারা পড়াতে পারবেন, ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান থাকতে পারবেন! অথচ প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করার অধিকার পাবে না- এ কথাতো শাসনতন্ত্র বা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের কোন ধারায় লিখিত নেই। আইন না পাল্টিয়ে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন এটা কোন ধরনের সভ্য বা পরিমার্জিত আচরণ ?

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সমাধান নাই এতে আমরাও বিশ্বাস করি। বাস্তবতার উপলব্ধি প্রয়োজন। এটাও ঠিক কথা। এই বাস্তবতার উপলব্ধির অভাবে পাকিস্তান সরকার ধ্বংস করেছে একটি দেশ, মরহুম শেখ মুজিব দিয়েছেন নিজের জীবন, বর্তমান সরকার সংকটের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন, আর আমাদের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বন্ধক দিয়েছেন নিজেদের বিবেক।

সাহস করে সত্য কথা বলতে হবে

দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ এপ্রিল ১৯৮১

গত ২০শে এপ্রিল রাত্রি দশটার পর হাতে তেমন কোন কাজ ছিল না। প্রায়ই এমনটা হয় না। সাংবাদিকরা স্বভাবজাতভাবেই কিছুটা নিশাচর। কেননা সারাদিনের কর্মকান্ড এসে পত্রিকা অফিসে জমা হয় সন্ধ্যায়। তখনই তাদের ব্যস্ততম সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু এই দিনটিতে কিছুটা অবসর মিলে গেল। অনভ্যস্ত অবসরে রাত্রির সময়টা কি করে কাটাব ভাবছিলাম। সাধারণতঃ ঘুমানোর অভ্যাস রাত্রি একটারও পরে। উপায়ান্তর না দেখে হাতের কাছের কাগজগুলো আবার নতুন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ দৈনিক সংগ্রামের ঐদিনকার কপিটার সম্পাদকীয় পাতা উল্টাতেই একটি দীর্ঘ চিঠির উপর নজর পড়লো। সাধারণতঃ এত দীর্ঘ চিঠি দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয় না। কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। পড়া শুরু করতেই গভীরভাবে চিঠির ভাষা আর বিষয়বস্তুতে এমনিভাবে ডুবে গেলাম যে, কখন যে রাত ১টা পেরিয়ে গেছে ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। চিঠিটির আবেদন এমন যে, কোন হৃদয়বান ব্যক্তি পড়া শুরু করলে শেষ না করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। যেখানে সময় কাটানোর জন্য চিন্তায় ছিলাম, সেখানে বাকি রাতটাও প্রায় বিনা নিদ্রায়ই কাটাতে হলো।

চিঠিটার বিষয়বস্তু তেমন কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ঘটনা নয়। রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসে গত ২৭শে মার্চের একটি নৃশংস ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ১০/১২ জন ছাত্রকে শতাধিক ছাত্র লোহার রড, লাঠিসোটা, হকিস্টিক ইত্যাদি নিয়ে ধাওয়া করে। ছাত্র কয়েকজন অবস্থা বেগতিক দেখে প্রাণভয়ে দৌড়াতে

দৌড়াতে শেষ পর্যন্ত অধ্যক্ষের কক্ষে ঢুকে পড়ে। কয়েকজন শিক্ষকসহ অধ্যক্ষ প্রাণপণ চেষ্টা করেও আক্রমণকারীদের হাত থেকে ঐ দশ-বারজন ছাত্রকে রক্ষা করতে পারেননি। তারা দরজা-জানালা ভেঙ্গে শেষ পর্যন্ত ঢুকে পড়ে। বেশ কিছু শিক্ষকসহ অধ্যক্ষ সাহেব অনেক কাকুতি-মিনতি করেও তাদেরকে নিরস্ত করতে না পারায় শতাধিক বীর সন্তান দশ-বারজন ছাত্রকে এমন অমানুষিকভাবে প্রহার করতে থাকে যে, উপস্থিত সকল শিক্ষকই হতভম্ব হয়ে যায়। এক পর্যায়ে অত্যাচারিতদের রক্তে অধ্যক্ষের কক্ষ ভেসে যায়, তাদের আর্তচিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ হলেও শতাধিক পাষন্ডের হৃদয়ে কোন দয়ামায়ার উদ্রেক হয়নি। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো- দীর্ঘক্ষণ এই ঘটনা সংঘটিত হলেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কোন লোক সেখানে হাজির হয়নি। শতাধিক লাটিসোটাধারী ছাত্রের মনের সাধ মিটিয়ে দশ-বারজন ছাত্রকে যাবতীয় নির্মম পদ্ধতিতে অত্যাচার করার পর তারা স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় স্থান ত্যাগ করে। অতঃপর হসপিটাল থেকে এম্বুলেন্স এসে আহতদেরকে হসপিটালে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে যায়।

হয়তো আপনারা বলবেন, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তো এমন কান্ড অহরহই হচ্ছে। এতে অবাক হওয়ার কি আছে ? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বহু ছাত্রের সামনে মহসিন হলে সাতজন ছাত্রকে গুলী করে হত্যা করা হলো। রাজশাহী ভার্সিটিতে তো কয়েক মাস আগে একজন ছাত্রকে শত শত ছাত্রের সামনেই নির্মমভাবে শেষ করে দেয়া হলো। সেও তো খুব বেশীদিনের কথা নয় যে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক অভিভাবকের জীবনের সমস্ত আশা-ভরসার স্থল কলিজার টুকরা সন্তানকে আরও কিছু শিক্ষিত মনুষ্য সন্তানের কারণেই চিরতরে হারাতে হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রের লাশ পাওয়া গেল কাটাবন মাঠের মধ্যে কিছু গাছ-গাছড়ার পাশে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত ছাত্রের বই-পত্র, কাপড়-চোপড়সহ কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হলো। এমনি প্রায় শতাধিক ঘটনাতো সারা দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঘটেই থাকে। এসব ঘটনাতো এতদিনে গাসহা হয়ে যাওয়া উচিত। অনেকে হয়তো আরো এগিয়ে গিয়ে বলবেন, ঢাকা শহরের মগবাজার চৌরাস্তার ট্রাফিক আইল্যান্ডের কাছে যেখানে সবসময়ই শতাধিক লোকের ভিড় থাকে, প্রায় সময়ই বেশ কিছু পুলিশও ডিউটিতে থাকে, তারই মাত্র পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে মাত্র বিশ-পঁচিশজন লোক একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রহার করে প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দিল তাতেই কতজন লোক অবাক হয়েছে? কতজন লোকের ঘুম নষ্ট হয়েছে ? পত্র-পত্রিকার কয়টাতে নিন্দা বা প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে? এর সবগুলো ঘটনাই হয়তো সত্য। হয়তো একথাও সত্য যে, এক সপ্তাহের দৈনিক পত্রিকাগুলো খোঁজ করলে ডজনের অধিক হত্যাকান্ডের খবর পাওয়া যাবে। কিন্তু তাই বলে কি এসব ব্যাপারে আমাদের কিছু ভাবতে নেই ? চিন্তাশীলদের নাক গলানোর কোন ফুরসত কি

হয় না ? যদি নাই হয় তবে কি সমস্ত দেশ এসব অমানুষিক কান্ড হজম করে নেওয়ার জন্য নীরব হয়ে গেছে ? কোন জনপদে কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়া তেমন বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু হত্যা, ধর্ষণ, গুম, খুন, প্রকাশ্য দিবালোকে ছিনতাই ইত্যাদি জঘন্য অপরাধ চোখের সামনে সংঘটিত হওয়ার পরও জনগণের মনে যদি সক্রিয় কোন ঘৃণার প্রকাশ না ঘটে তাহলে সেই সমাজের টিকে থাকার কোন সম্ভাবনা বা অধিকার আছে কি ?

কেন এমনটি হোল? বৃটিশ আমলে তো কোন এলাকায় ছোটখাট ঘটনায় একটা লোক জখম হলে গ্রাম সুদ্ধ সকলেই ভয়ে বাড়ী ছেড়ে পালাতো সরকারী ব্যবস্থাপনার ভয়ে। আর হত্যাকান্ড সংঘটিত হলে তো কথাই নেই। সবার মুখে ভয়ার্ত কণ্ঠে শুধু শোনা যেত, "এই লাল পাগড়ী" (পুলিশ) এসে পড়বে।"

তখনকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা কদাচিত ঘটতো। পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকেও এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণজনিত অপরাধ খুব কমই ছিল। শেষের দিকে এসে অবশ্য অবস্থার বেশ পরিবর্তন হয়। কিন্তু আজকালকার মত এমন অহরহ হত্যা, ধর্ষণ, লুট ছিনতাই ইত্যাদি ঘটনার কথা আমাদের খুব কমই জানা আছে। তাহলে আজ অবস্থার এ অবনতি কেন ? সাধারণ মানুষ থেকে শিক্ষিত উপর তলার প্রতিটি মানুষের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতার প্রতি একটা স্বাভাবিক ঘৃণাবোধের এই অবলুপ্তি ঘটলো কি করে? আকৃতিগত মানুষকে গুণগত মানুষে রূপান্তরিত করার মহৎ উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজে পাঠানো হলো। জাতিকে মহান লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য সৎ ও উন্নত চরিত্রের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব তৈরীর জন্য তাদের পেছনে ব্যয় হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। আর তারা কিনা আজ হত্যা, ধর্ষণ, লুট, হাইজ্যাক, খুন ইত্যাদির অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়ছে দিনকে দিন। তাহলে এ জাতির ভবিষ্যৎ কি? আজতো সঙ্গত কারণেই যে কোন অভিভাবক বা সাধারণ মানুষের প্রশ্ন করার অধিকার আছে। স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি শিক্ষা দেয়া হয়? কোন বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার পর তারা শিক্ষককে প্রহার করার পরও লজ্জাবোধ করে না। কোন শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে তারা উপরোক্ত অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়ছে প্রতিদিন? অবস্থার উন্নতি না ঘটে যদি অবনতির দিকে এই সমস্ত নব্য শিক্ষিত লোকেরা দেশকে নিয়ে যায়, তাহলে এ সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জাতির কি উপকারে আসবে? শিক্ষায় যদি গলদ থাকে তাহলে তা সংশোধন করা হচ্ছে না কেন? অন্য কোন পরিবেশ যদি তাদেরকে নষ্ট করার জন্য দায়ী হয় তাহলে তা-ই বা বন্ধ করা হচ্ছে না কেন? এত জ্বলন্ত ঘটনা ঘটার পরও সমাজপতিদের চক্ষুর পাতা উন্মোচিত না হলে দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা কি? এখন আমাদের সমগ্র ব্যবস্থার ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটাকেই নতুন করে সাজাতে আপত্তি কেন? তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, যারা এই ব্যবস্থাপনার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছেন, তারা এগুলোর সমর্থক? গোটা দেশ অরাজকতা আর নৈরাজ্যে ভরে গেলে

তাদের কি লাভ? লাভ হয়তো একটাই। এ ধরনের লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হলে তারাও জাতিটাকে লুটপাট করে পাশবিক লালসার শতকরা একশত ভাগ তৃপ্তির একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে পারবেন।

যদি বলা হয় দেশের উঠতি বয়সের ছেলেরা রাজনৈতিক নেতাদের পাল্লায় পড়ে এই সমস্ত অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক বিভিন্ন মতের অস্তিত্বের কারণে একে অপরের বিরুদ্ধে হীন পন্থার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করছে না। তাহলেও প্রশ্নের অবকাশ আছে। সব রাজনৈতিক দর্শনই কি হত্যা, ধর্ষণ, লুট, অপরকে অপমান বা উচ্ছৃঙ্খলতায় উদ্বুদ্ধ করে? যদি তা না করে তাহলে যে সমস্ত দর্শন এমন কর্মকান্ড শিক্ষা দেয় তা সমূলে উৎপাটিত হওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয় না কেন? যদি বলা হয়, আদর্শেরতো কোন রূপ নেই। রাজনৈতিক নেতাদের সচ্চরিত্র হওয়ার কারণে এমনটি ঘটছে। তাহলে কোন ধরনের রাজনৈতিক নেতারা অপরের জীবনের প্রতি হুমকি দেয়? কোন ধরণের রাজনৈতিক কর্মীরা অপরের সভা পন্ড করাকে গৌরবজনক কাজ বলে মনে করে? কোন ধরনের রাজনীতির কর্মীরা দিনে-দুপুরে স্কুল-কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করে? কোন ধরনের রাজনৈতিক নেতারা ঘেরাও, জ্বালাও, পোড়াও ইত্যাদি কাজের জন্য উস্কানী দেয়? কোন নেতারা অস্ত্রের ভাষায় কথা বলে? তাদের চিহ্নিত করে আমরা জনগণ চিরদিনের জন্য প্রত্যাখ্যান করি না কেন? তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতেই বা ভয় কিসের? হাইজ্যাকার ধরা পড়লে যে সমস্ত পার্টি থেকে রাত্রি বেলায় ফোন আসে তাদেরকে চিহ্নিত করে জনগণের সামনে তাদের চরিত্র উন্মোচিত করতেই বা সংকোচ কিসের? এই জাতীয় দুষ্কর্মকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ না বলে গুন্ডামী, ইতরামী ইত্যাদি বলতে আমাদের ভয় কেন?

এতটুকু সত্য কথা বলতেও যদি সারা দেশে কোন লোক না থাকে, সকলে যদি অন্যায়কারীদের পক্ষে কথা বলে বা খবর পরিবেশন করে তাহলে কোন আশায় জাতির মঙ্গলের কথাবার্তা বলা হচ্ছে? এরপর যদি রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালকরা এই ধরনের অপরাধীদের ভয়ে কোন ব্যবস্থা নিতে না পারেন তাহলে এই সরকার, এই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পোষার জন্য জনগণ রক্ত-মাংস পানি করা কোটি কোটি টাকার করের বোঝা বহন করবে কেন? যে ব্যবস্থা মজলুমের পক্ষে দাঁড়াতে সাহস পায় না, যে ব্যবস্থা হত্যাকারীদের দন্ডবিধান করতে ভয় পায়, যে ব্যবস্থা শুধু শক্তিমানদেরই প্রতিনিধিত্ব করে সেই ব্যবস্থার অস্তিত্বের জন্য সাধারণ নিরীহ মানুষের তো কোন আগ্রহ থাকার কথা নয়। শেষ পর্যন্ত যদি সকলেই এই ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার প্রতি অনীহা প্রকাশ করতে থাকে তাহলে সামগ্রিক নৈরাজ্যে দেশটা ভরে যেতে বেশী সময় লাগবে না।

এতসব চারদিকে ঘটার পরেও আমাদের হুশ হচ্ছে না কেন? কেন সাহস করে কিছু লোক আমরা ঝুকি নিয়ে সত্য কথা বলছি না? কেউ কিছু না বললে শেষ পর্যন্ত

অন্যায়কারীরাই সকলের জীবনের জন্য ঝুকি হয়ে দাঁড়াবে। তখন কারো পক্ষে গা বাঁচানো সম্ভব হবে না। এখনই প্রায় সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এত অবনতির পরেও অবস্থা আয়ত্বের বাইরে গেছে বলে আমরা মনে করি না। সরকার বিশেষ করে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বিভাগ, দেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজ, সচেতন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সকলে মিলে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে চাইলে তা অসম্ভব নয়। জাতি গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে সাহস করে সত্য বলতে হবে। সত্যকে প্রচার করতে হবে। সত্যের উপর নিজে কাজ করতে হবে। তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধেও যেতে হবে। অন্যায়ের গতিকে রোধ করার জন্য গড়তে হবে প্রতিরোধ। নইলে সামগ্রিক ধ্বংসের যে ঘন্টাধ্বনি শুনা যাচ্ছে তা কাউকেই শেষ পর্যন্ত রেহাই দেবে না।

অথঃ সাংবাদিক সদাচার সমাচার

দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ মে ১৯৮১

লিখতে বসে ভাবছিলাম নানা কথা। এই বয়সে কম হলেও বেশ কিছু বিষয়ের ওপর লিখলাম। ফল কি হয়েছে জানি না। তবে চোখে পড়ার মত তেমন কিছু যে হয়নি তা অনেকটা জোর করেই বলা যায়। জনগণেরও একই অভিযোগ। তারাও কত সমস্যার বিজ্ঞাপন দেয়, কত দরজায় সমস্যা সমাধানের জন্য হত্তা দিয়ে পড়ে। কিন্তু অবস্থার তেমন কোন উন্নতি নাকি কোথাও হয় না। এই যে আইন-শৃংখলার দুর্গতি দীর্ঘ দিন ধরে চলছে, কত লেখালেখি, কত অনুনয়-বিনয়, সরকারী বিভাগ সমূহ থেকে, এমনকি খোদ মন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট থেকে এর উন্নতির প্রতিবিধান করার সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু অবস্থার কি কোন উন্নতি হয়েছে? বরং দিন দিন অবস্থা সামগ্রিক নৈরাজ্যের দিকেই চলছে। এই তো সাংবাদিকরা স্বাধীনতার জন্য সেই পাকিস্তান আমল থেকে সংগ্রাম শুরু করেছেন। বাংলাদেশ আন্দোলনেও সাংবাদিকদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আশা ছিল সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে পারবেন। তাঁদের জীবনের নিরাপত্তার উপর হুমকি আসবে না। অবশেষে স্বাধীনতা এলো। কিন্তু সাংবাদিকদের স্বাধীনতা এলো না। বরং এক সময় সকল সংবাদপত্র আর সাংবাদিকদের সরকারীকরণ করা হলো। জাতির ঘাড়ে জগদ্দল পাথর চিরদিনের জন্য চেপে বসতে চাইল। জনগণ বিদ্রোহ করলো। সাংবাদিকরাও স্বাধীনতার জন্য আবার লড়াই শুরু করলেন। একসময় অবস্থার কিছুটা উন্নতিও হল। কিন্তু আকাঙ্খিত মানে না পৌঁছতেই অবস্থা আবার অবনতির দিকে যেতে চাইছে।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটা দিকেই এলোপাতাড়ি বলে ফেললাম। অথচ আজকে শুধু সাংবাদিকের স্বাধীনতা এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কেই কথা বলতে চেয়েছিলাম। একেতো আমাদের সাংবাদিকদের স্বাধীনতা খুবই সীমিত। যেটুকু অধিকার আছে তাও নানা কারণে ভোগ করতে পারি না। কিন্তু আরো বেশী দুঃখিত এবং আশ্চর্য হই, যখন দেখি রেশনে দেওয়া স্বাধীনতাটুকুও আমাদের কেউ অপব্যবহার করছেন। আর আমাদের মহান পেশার জগতে এই ধরনের ব্লাক স্পটগুলোর জন্যই বোধহয় আমাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে কারো সদিচ্ছা থাকলেও দিতে চান না। ষড়যন্ত্রকারীরা সেই সুযোগটাই ব্যবহার করে আমাদের মনমানসিকতা আর কলমের উপর একশত চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে রেখেছেন।

সম্প্রতি আমাদের এক সহযোগী পত্রিকা দৈনিক সংবাদ 'স্বরূপে জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি খবর ছাপলেন। কোন এক কিশোরকে নাকি জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা বায়তুল মোকাররম মসজিদের চারতলায় মুক্তিযোদ্ধা মনে করে আটকিয়ে রাখে। সারারাত দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে সকালে মুক্তি দেয়। কিন্তু পরের দিনই ফাউ-শনের ইমাম ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করে বিবৃতি দেন। প্রতিবাদটি ছাপানোর সময়ও একটু লেজ সংযুক্ত করা হয়েছে। খবর প্রকাশ এবং তার প্রতিবাদ হওয়া খবরের কাগজে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঐ খবরের ব্যাপারটা একটু আলাদা। ঘটনার যে উৎসের কথা খবরে বলা হয়েছে তা ঐ পত্রিকার অফিস থেকে অতি নিকটে। সংবাদপত্রের সম্পাদক সাহেব এমন একটি মারাত্মক খবর ছাপার আগে সংশ্লিষ্ট মসজিদের ইমাম কিংবা মসজিদের অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে বিষয়টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন বোধ করেননি। এ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, খবরটি ভিত্তিহীন জেনেও প্রকাশ করা হয়েছে অথবা ঐ সংবাদ কাহিনীটি দৈনিক সংবাদের টেবিলেই জন্মগ্রহণ করেছে। আর খবরটির বিদ্বেষাত্মক মন্তব্যধর্মী হেডিং থেকেও অসৎ মতলব প্রকাশ হয়ে পড়ে।

অথচ মহান (?) পত্রিকাটির বর্ষপূর্তির এক অনুষ্ঠানে অনেক শুভাকাংখী বস্তুনিষ্ঠ খবর পরিবেশনের জন্য মোবারকবাদ জানিয়েছেন। ভাবতেও অবাক লাগে কি করে তাদের শুভাকাংখীদের মুখে এত তাড়াতাড়ি ঐ পত্রিকাটি চপেটাঘাত করতে পারলো। আমরা লজ্জা পেয়েছি। হয়তো যারা কয়েকদিন আগে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের জন্য সনদপত্র দিয়েছিলেন তাঁরাও লজ্জা পেয়েছেন বা দুঃখিত হয়েছেন। মিথ্যা কথা বা অসৎ কাজে যারা অভ্যস্ত শুধু শুভাকাংখীদের সদিচ্ছা তাদেরকে ভালপথে চালিত করতে পারে না। আর এই কুকর্ম করার সময় তাদের কর্মে এমন কিছু ফাঁক থেকে যায় যাতে শুভাকাংখীরা চেষ্টা করেও ডিফেন্ড করতে পারেন না। এই খবরটার প্রতি একটু দৃষ্টি দিলেই যে কেউ এর অসত্যতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারার কথা। কোন কিশোরের বয়স বড়জোর ১৬ কি ১৭ বছরের বেশী হওয়ার কথা নয়। মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে আজ থেকে দশ এগার বছর আগে। তখন কিশোরটির বয়স ছিল ৭

কি ৮ বছর। সুতরাং একজন কিশোরকে মুক্তিযোদ্ধা ভাববার কোন কারণতো নেই। দ্বিতীয়তঃ মসজিদে তিন চার তলায় প্রশিক্ষণরত ইমামগণ অবস্থান করছেন। এত সংখ্যক ইমামের সামনে 'জামাতীরা' কিভাবে একজন কিশোরকে নির্যাতন চালালো তা স্বাভাবিক জ্ঞানেই অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বালাই তাদের নেই। এখানে একজন কিশোরকে যেমন তারা মুক্তিযোদ্ধা সাজিয়েছে, তেমন কাজ তারা আরও করেছেন এবং করছেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ব্যবহার করেছে তারা যে সমস্ত অপকর্ম করে থাকেন সেখানে অধিকাংশই থাকে কিশোর অথবা বড়জোর ২০/২১ বছরের যুবক। তাদের স্বার্থে হয়তো ৮/৯ বছরের ছেলেপেলেকে মুক্তিযোদ্ধা বানানো কঠিন নয়। সেখানে তাদের মোক্ষম যুক্তিও হয়তো আছে। বাপ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, সুতরাং তার রক্তের সাথে সম্পর্কিত পুত্রধনের আর মুক্তিযোদ্ধা হতে অসুবিধা কোথায়? এমনি আজগুবী ও অবিশ্বাস্য খবর তারা প্রায়ই ছাপেন। যেমন গত ১৯ তারিখের পূর্ব ঘোষিত প্রতিবাদ সভাতে জামায়াতের কোন কর্মী লাঠিসোটা, এমনকি প্লাকার্ডও নেয়নি। সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামার সময় তাদের হাতে কোন ব্যানার পর্যন্ত ছিল না। অথচ দৈনিক সংবাদের প্রকাশিত খবরে দেখা গেল জামায়াতীরা লাঠি-সোটাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের উপর হামলা করেছে। বায়তুল-মোকাররমে উপস্থিত জনতা এমনকি পুলিশ দেখলো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। কর্ণেল নূরুজ্জামান এবং নঈম জাহাঙ্গীরের মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পূর্ব ঘোষিত কোন কর্মসূচীও ছিল না। ঐ দিনের পূর্ব পর্যন্ত কোন বক্তৃতা-বিবৃতিও তারা প্রকাশ করেনি। না করারই কথা। কারণ তাদের মুরুব্বীরা তো এর আগে মুখ খুলেনি। খোলারও কথা নয়। কেননা ভারতের উপর তারা এই জন্য ত্যক্ত-বিরক্ত, কেন ভারত বাংলাদেশটাকে গ্রাস করতে এতটা দেরী করছে ? এমনি ধরনের বিরক্তির সময় তালপট্টি দ্বীপ দখল করে নেওয়াতে তাদের প্রাণে বরং আশার সঞ্চার হয়েছে।

আলোচনা করছিলাম সততার কথা, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করার কথা। এটা আসলে তাদের কোন বিশেষ এক ব্যক্তির চরিত্রদোষ নয়। তারা যে আদর্শে বিশ্বাস করে সেখানে এটাই যোগ্যতা এটাই আর্ট। তাদের অভিভাবক কিন্তু শান্তিকামী বিশ্ব কর্তৃক নিন্দিত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি দেশের দূতাবাসে মিথ্যা খবর ছড়িয়ে, প্রতারণা করে, ধোঁকা দিয়ে কিভাবে এক পক্ষকে আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় তার জন্য একটি গোপন সেল পর্যন্তও আছে। তারা গবেষণার মহান কাজে লিপ্ত থেকে উদ্ভাবন করেন মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাকে কোন দেশে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে তাদের মহাগুরু লেলিনও এ পরামর্শই দিয়েছেন। মূলতত্ত্ব যেখানে মিথ্যা, ধোঁকা প্রবঞ্চনা ইত্যাদি শিক্ষা দেয়, সেখানে অনুসারীদেরকে আর দোষারোপ করে লাভ কি? এটাই তাদের আদি ও অকৃত্রিম স্বভাব।

এইতো চট্টগ্রামে ছাত্রশিবির কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের জীপে হামলার যে খবর সংবাদে ছাপা হলো তা একটু বিশ্লেষণ করলেই সত্য মিথ্যা যাচাই করা যাবে। পায়ে হাঁটা

নিরস্ত্র মিছিল আক্রমণ করলো চলন্ত জীপকে! বলিহারি আবিষ্কার! বাংলাদেশ আবজারভারের খবর অনুযায়ী আহতদের সকলেই ছাত্রশিবিরের লোক। তাহলে কি ছাত্রশিবিরের লোকরা দু'হাত পিছনে বেঁধে জীপ আক্রমণ করেছিল? আসলে সংবাদ যা ছেপেছে তা যে গাঁজাখুরি সে সম্পর্কে টনটনে জ্ঞান সংবাদের আছে। কিন্তু এভাবে তাদের প্রতিপক্ষকে কোন প্রকারে ঘায়েল করাই যে তাদের মহান কর্তব্য। এতে নিজেদের মান-মর্যাদা যেখানেই যাক না কেন। তাদের আন্তর্জাতিক গুরুরা এ অভ্যাসে আরো দক্ষ। আফগানিস্তানে বিদেশী সৈন্যের অজুহাতে তারা লক্ষাধিক সংখ্যায় ঢুকে পড়লেন। কিন্তু এ পর্যন্ত বিদেশী কোন সৈন্য সেখানে আবিষ্কার করতে পারেননি। এখন আবার তাদের ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা গবেষণাগারের ফতোয়া অনুযায়ী কবে সমাজতন্ত্রের প্রেমে পোল্যান্ডের জনগণের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, বিশ্ববাসী সে চিন্তায় অস্থির।

এখন প্রশ্ন হলো, যারা সাংবাদিকতার মহান পেশার মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত করে, সাংবাদিকতার ছদ্মাবরণে দেশের নয় বরং বিদেশী প্রভুদের নির্দেশ পালনেই যাদের আত্মতৃপ্তি, কোন দেশে বেজায় ঠান্ডা পড়লে যারা এদেশের মানুষকে গরম কাপড় গায়ে দেয়ার উপদেশ খয়রাত করে, নিজেরা সর্বহারার প্রেম আর গণতন্ত্রের প্রলাপ বকতে বকতে অস্থির অথচ নিজেদের কর্মচারীদের প্রতি অমানুষিক আচরণ করতে একটুও বাধে না, বাংলাদেশে বাস করে আফগান স্টাইলে বিপ্লবের হুমকি ছাড়ে আর বিপদ দেখলে মহা প্রভুর দূতাবাসে রাত্রিযাপন করে, তাদের ব্যাপারে কিছুই বলার নেই। সাংবাদিকদের পেশাগত সংগঠন সাংবাদিকতার স্বাধীনতা যত জোর গলায় দাবী করে, ততটা সাহসের সাথে এই মহান পেশার মর্যাদা রক্ষার জন্যে অগ্রসর হবার মানসিকতা পোষণ করে না। আমাদের সাংবাদিকতার ইতিহাসে বোধহয় এমন মহৎ দৃষ্টান্ত একটিও নেই। অবশ্য এমন উদ্যোগ থাকলেও তা যে মহৎ ফল প্রসব করতো, তা আমার মনে হয় না। কারণ ব্যাপারটা নিজের বিবেকবোধ ও লজ্জা-শরমের উপর নির্ভরশীল। বিবেক নামের বস্তুও যদি না থাকে, লাজ-লজ্জার কোন বালাই যদি না করে তাহলে তাদের কোন জিনিষটি আর তাদের অসৎবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে? যতদিন দেশের মানুষ তাদেরকে সহায়তা দিয়ে তাদের মধ্যে বিবেকবোধের সৃষ্টি না করে, ততদিন তাদের বিবেক ও লাজ-লজ্জাহীন আবোল-তাবোল মানুষকে সহ্য করেই যেতে হবে।

মি'রাজ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য

দৈনিক সংগ্রাম, ৩১ মে ১৯৮১

মহানবী (সা) এর জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্যে 'মি'রাজ' নিয়ে যত বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে, তত আর কোন ব্যাপারেই হয়নি। এমনকি অনেক বিখ্যাত আলেমও এ সন্দেহ থেকে রেহাই পাননি। অবস্থা বেগতিক দেখে শেষ পর্যন্ত অনেকে আবার ব্যাপারটাকে নেহায়েত আত্মিক বলে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা একবার ভেবে দেখার চেষ্টা করেননি যে, ব্যাপারটা যদি আত্মিকই হতো, তাহলে এতসব বিতর্কের অবসান প্রথমেই হয়ে যেত। হীন-সভ্যতা, জ্ঞানের দৈন্যতার কারণে এর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেয়ার পরিবর্তে পাশ কাটানোর চেষ্টাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। তাই আজ মি'রাজের একটা যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

'মি'রাজ' শব্দের উৎপত্তি 'উরুজ' থেকে। 'উরুজ' অর্থ উর্ধে আরোহন, চরম উন্নতি। অন্য অর্থে 'মি'রাজ'কে সিঁড়িও বলা যেতে পারে। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় মি'রাজ একটা বিশেষ ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করে থাকে। আর সে ঘটনাটি হোল ২৬ রজব দিবাগত রাতে অর্থাৎ ২৭ রজব রাতে হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন এবং আল্লাহর সৃষ্টির কিয়দংশ সম্পর্কে জ্ঞানাহরণ।

আমি মি'রাজের বিস্তারিত ঘটনার দিকে অগ্রসর হব না। কেননা সে ঘটনাগুলো কমবেশী সবারই জানা। আমি মি'রাজ সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো। প্রথমে প্রশ্নগুলো নিম্নে দেয়া হলো:

- মি'রাজ তো আত্মিকভাবে সম্ভব, দৈহিকভাবে সম্ভব কিভাবে ?
- স্থূলদেহ কিভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করলো ?
- পৃথিবীতে এত কম সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে মহানবী (সা) এর ভ্রমণে এত বেশী সময় অতিক্রান্ত হোল কিভাবে ?
- প্রাকৃতিক বাঁধা সত্ত্বেও কিভাবে তাঁর সামনে মসজিদে আকসার ছবি তুলে ধরা হয়েছিল ?
- মি'রাজের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল ?

১ নং প্রশ্নের উত্তর: বর্তমান বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয় হোল থিওসফী। এ্যানি বেসান্টের লেখা 'Man and his bodies' নামক গ্রন্থে জড়দেহ ছাড়াও মানুষকে তিন রকম দেহের অধিকারী বলা হয়েছে। মানুষ যে তিন রকম দেহের অধিকারী তা হলো জ্যোতির্দেহ (Astral Body), মানব দেহ (Mental Body) ও নিমিত্ত দেহ (Causal Body)। দেহ হলো আত্মার পোশাক। আত্মার প্রয়োজনে আত্মা বিভিন্ন দেহকে ব্যবহার করতে পারে। স্থূলদেহ ছাড়া যে তিনটি দেহ রয়েছে তারা প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকমের গতিপ্রাপ্ত হতে পারে। এমনকি নিমিত্ত দেহের গতি আলোর গতির চেয়েও অনেক বেশী। যে ব্যক্তি তার প্রত্যেকটি দেহের উপর আত্মার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তার পক্ষে দেহগুলোকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করাটা তেমন কোন অসম্ভব কাজ নয়। একজন নবীর পক্ষে দেহের উপর আত্মার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই মি'রাজ দৈহিকভাবে হওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

২নং প্রশ্নের উত্তর: মানুষের মহাশূন্য গমন এ প্রশ্নের উত্তরকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। বিশেষ করে চাঁদে গমন একথার বাস্তব সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর: মনে করুন কোন ব্যক্তি পৃথিবীর গতির দ্বিগুণ বেগে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে রওয়ানা দিল। অন্য এক ব্যক্তি পৃথিবী থেকে পৃথিবীর স্বাভাবিক গতির সাথে তাল রেখে অগ্রসর হচ্ছে। এ অবস্থায় প্রথম ব্যক্তির কাছে যখন দু'দিন অতিক্রান্ত হবে পৃথিবী পৃষ্ঠের ব্যক্তির কাছে তখন অতিক্রান্ত হবে মাত্র একদিন। কোন ব্যক্তি আলোর গতির চেয়ে বেশী বেগে গমন করতে পারলেও অনুরূপ ঘটনা ঘটা সম্ভব। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক গতির সূত্র অনুযায়ী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সময়ের পার্থক্য ঘটা নিতান্তই স্বাভাবিক। তার মতে কোন স্ট্যান্ডার্ড সময়ই নেই। সকল সময়ই স্থানীয় বা লোকাল।

৪নং প্রশ্নের উত্তর: বর্তমান টেলিভিশনের আবিষ্কার এ প্রশ্নের উত্তর ভালভাবেই দিয়েছে। প্রাকৃতিক শত সহস্র বাধা সত্ত্বেও ঢাকার অনুষ্ঠানগুলো দিব্যি আরামে চর্মচোখে ফরিদপুর থেকে দেখা যাচ্ছে। তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তাই আল্লাহর নবীর সামনে আল্লাহ যদি টেলিভিশনী কায়দায় বায়তুল আকসার ছবি তুলে

ধরেন তাতে বিস্ময় প্রকাশ করার তেমন কি আছে ?

৫নং প্রশ্নের উত্তর: মি'রাজের প্রয়োজন অনুধাবন করতে হলে মি'রাজের সময়কাল সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা দরকার। মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের কিছু সময় আগে। তখন মহানবী (সা) জাগতিক দিক থেকে বলতে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা ছিলেন। কেননা, তার প্রাণপ্রিয় পত্নী খাদিজা (রা) তখন ইন্তেকাল করেছেন। যে পিতৃব্য তাকে শত বিপদ থেকে আড়াল করে রেখেছিলেন, তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন। অপরদিকে কাফেরদের অত্যাচারের মাত্রা চরম আকার ধারণ করেছে। আল্লাহর তরফ থেকেও সামাজিক সংস্কারের হুকুম আসছে অহরহ। নবী হিসেবে তার কাজের একটা চূড়ান্ত পর্যায় তখন অতিবাহিত হচ্ছিল। বিভ্রান্ত মানব জাতির সম্মুখে একটা সর্বাঙ্গীন চির সুন্দর আদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরার সময় তখন উপস্থিত। অথচ মানবজীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্বলিত একটা জীবন বিধান পেশ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের জীবন বিধান পেশ করতে হলে তার জন্য যে জিনিষগুলোর বিশেষ প্রয়োজন ছিল তা পর্যায়ক্রমিকভাবে আলোচনা করা হোল।

প্রথমত: জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে তিনি যে আধ্যাত্মিক জগতের কথা মানুষকে বলেছিলেন তার বাস্তব উপলব্ধি ও চর্ম চোখে দর্শন তাঁর জন্যে একান্ত প্রয়োজন ছিল। আর সেই তত্ত্বকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার জন্যে সৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দুতে উপস্থিত হয়েই কেবলমাত্র তা সম্ভব। জন্ম-মৃত্যুর রহস্য, বেহেশত-দোজখ ইত্যাদির সম্পর্কে দিব্য ও বাস্তব জ্ঞান অর্জন বিশ্বনবী (সা) এর জন্যে অপরিহার্য ছিল। কেননা, সাধারণ মানুষের জন্যে সেটা শুধু বিশ্বাসে থাকলেই যথেষ্ট। মানবতার মুক্তিদূতের জন্যে তা চর্মচোখে দেখা প্রয়োজন, নইলে নিজের ঘোষিত বিপ্লব ও কর্মের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া নিতান্তই কঠিন। জ্ঞানের চরম পর্যায়ই হলো নিশ্চিত হওয়া।

দ্বিতীয়ত: সমগ্র মানবের জন্যে যে জীবনব্যবস্থা রচিত হবে তা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই হওয়া উচিত। অথচ তখন এমন কোন প্রামাণ্য ইতিহাস ছিল না যা থেকে রসূলের (সা) এ অভাব পূর্ণ হতে পারে। তাছাড়া মানব রচিত ইতিহাসও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়। তাই পিছনের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর সমকাল ও তার ফলাফল বাস্তব চোখে মহানবী (সা) কে দেখানোর প্রয়োজন ছিল। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তা কি করে সম্ভব ? আজকাল বিজ্ঞান একথা প্রমাণ করেছে যে কোন বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত আলো আমাদের চোখে পড়ার পর তার প্রতিবিম্বটাই আমরা দেখি। প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাগুলো আমরা আলোর থেকে অনেক গুণ বেশী বেগে রওনা দিলে অনেক দূরে কোথাও ঘটমান অবস্থায় দেখতে পারি। আল কোরআনে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে আমার মনে হয় তার সবগুলো এমনকি প্রয়োজনে আরও অনেক ঘটনা মহানবী (সা) কে বাস্তবভাবে দেখান হয়েছিল যাতে

চিরস্থায়ী জীবন বিধান রচনার পথ তাঁর জন্যে সহজ হয়।

তৃতীয়ত: মানব জীবনের আর একটা জটিল সমস্যা হল মানব-চরিত্রের বিভিন্নতা। মানব চরিত্রের এই বিভিন্নতা ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া, জলবায়ু, ভৌগলিক পরিবেশ ইত্যাদির সাথে মানব জীবনের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিকে জ্ঞান লাভ করতে হলে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। এমনকি কয়েক শতাব্দী অধ্যয়ন করেও এ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়। মি'রাজের মাধ্যমে মহানবী (সা) কে এ জ্ঞান অতি অল্প সময়েই দেয়া হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে তা দেয়া হোল? কোন দুই দিক বিশিষ্ট (Two Dimensional) তলকে তিন দিক বিশিষ্ট (Three Dimensional) বস্তু হতে এক সঙ্গেই অবলোকন করা সম্ভব। তেমনি তিন দিক বিশিষ্ট কোন বস্তুকে চার দিক বিশিষ্ট (Four dimensional) কোন বস্তু হতে এক সঙ্গে অবলোকন করা সম্ভব। আমাদের পৃথিবী যে মহাবিশ্বে (Colestial sphere) অবস্থিত তাছাড়া আরও ছয়টি মহাবিশ্ব আছে একথা আজকাল জ্যোতিবিজ্ঞানে স্বীকৃত। আল কোরআনের 'সাতটি সামাউন' বলতে সম্ভবত: সাতটি মহাবিশ্বের কথাই বলা হয়েছে। কেননা, আরবী ভাষায় সামাউন বলতে মহাবিশ্বও বুঝান হয়ে থাকে। আমাদের প্রথম মহাবিশ্ব তিন দিক বিশিষ্ট অর্থাৎ (Three Dimensional) এবং পরবর্তী মহাবিশ্বটি চারদিক বিশিষ্ট অর্থাৎ (Four Dimensional) এভাবে প্রত্যেকটি মহাবিশ্বের দিক বা Dimension বাড়তে থাকবে। আল্লাহ তার রসুলকে (সা) তিন দিক বিশিষ্ট মহাবিশ্বকে অতি অল্প সময়ে অবলোকন করার জন্যে চারদিক বিশিষ্ট কোন মহাবিশ্বে নিয়ে ছিলেন যেখান থেকে মহানবী (সা) সমগ্র পৃথিবীর ভৌগোলিক জ্ঞান অতি অল্প সময়েই আয়ত্ত করেছিলেন।

উপরোক্ত বাস্তব জ্ঞানের সাহায্যে যে সমাজের রূপরেখা রসুল (সা)-কে দেয়া হয়েছিল তার রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই মহানবী হযরত (সা)-এর পরবর্তী জীবনে। তিনি সারা বিশ্বের বাতিল ব্যবস্থার দ্বারা নির্যাতিত হয়েও কোন সময় নিজের কাজ থেকে পিছপা হননি। তাকে তার দিব্য এবং বাস্তব জ্ঞানই সাহায্য যুগিয়েছিল তৎকালীন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের সুসজ্জিত সহস্রাধিক বীরের বিরুদ্ধে মাত্র তিনশত তের জন সাধারণ অস্ত্রে সজ্জিত মানুষ নিয়ে যুদ্ধ করতে। কেননা, তিনি সাফল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপেই নিশ্চিত ছিলেন। তাইতো আমরা দেখি, তার উপস্থাপিত আদর্শ কালের বিবর্তনে একটুও মলিন হয়নি; আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে, আদর্শের পরিবর্তনের কারণে আদর্শের মূল দৃষ্টিভঙ্গির কোথাও পরিবর্তন করতে হয়নি।

'মি'রাজের' অন্য দিকেও সার্থকতা রয়েছে। মানুষ যে ফেরেশতার চেয়েও বড় তা বাস্তবভাবে প্রমাণিত হয়েছে। খোদার ফেরেশতার গতি যেখানে স্তব্ধ মানুষের গতি সেখানে থামেনি। মানুষকে স্থান কাল পাত্র আবদ্ধ করতে পারে না। স্থান-কালের সীমা ছাড়িয়ে তার অনন্ত যাত্রা চলতে থাকে।

বায়তুল মোকাদ্দাসে সমস্ত নবীদের ইমাম হয়ে মহানবী মোহাম্মদ (সা) নামাজ পড়িয়েছেন। এতে তাঁর বিশ্বজনীনতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। মানব সৃষ্টির পর থেকেই যে আল-ইসলাম মানুষের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কালের প্রয়োজনে মহানবী (সা) যে সে আদর্শের একজন ধারক ও বাহক তাও প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লাহর তরফ থেকে তিনি ছিলেন 'মুহাম্মদ'। 'মুহাম্মদ' নামের সার্থকতার জন্যেই তাঁকে 'আহাম্মদ' হওয়া প্রয়োজন ছিল। কেননা, পৃথিবী থেকে যিনি চরম প্রশংসাকারী আল্লাহর তরফ থেকে তিনিই চরম 'প্রশংসিত জন'। অথবা আল্লাহর তরফ থেকে যিনি চরম প্রশংসিত জন জগত থেকে তিনিই চরম 'প্রশংসাকারী'।

এই ছোট্ট প্রবন্ধে মি'রাজের সম্পূর্ণ দিকগুলো আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া অনেক দিক আজও মানব জ্ঞানের অগোচরে রয়ে গেছে। যে সমস্ত দিক এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে হয়ত দু'শ' বছর পূর্বে এ দিকগুলো মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল। বিজ্ঞান ইসলামকে বুঝতে অনেকভাবে সাহায্য করেছে। বিজ্ঞান যদি আরও অগ্রসর হয় তবে এমন একদিন আসবে যেদিন বিজ্ঞান ও ধর্মের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন অমিল থাকবে না। ধর্ম চূড়ান্ত কথা বলে দিয়েছে আর বিজ্ঞান এখনও সত্য পথের সন্ধানে ব্যস্ত। সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত কোন ব্যক্তির সাথে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সাথে কিছু গরমিল থাকা স্বাভাবিক। কেননা একজন সত্যের সন্ধান পেয়েছে, অন্যজন এখনও পায়নি।

আধুনিক ছিলাম না কিন্তু মানুষ ছিলাম

দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ জুলাই, ১৯৮১

ছোট বেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম। বোধ হয় গত বছর অন্য একটি লেখাতেও গল্পটি বলেছি। কোন এক রাজার রাজ দরবারের সামনে বিক্ষোভরত জনতাকে দেখে রাজা প্রশ্ন করলেন, "এরা কি চায়? এত হৈ চৈ করছে কেন?" উত্তরে মন্ত্রী বললেন, "এরা দুবেলা ভাত খেতে পায় না। অর্থনৈতিক অবস্থা এদের খুবই খারাপ। এরা ভাত চায়।" রাজা অবাক হয়ে মন্ত্রীকে বললেন, "কেন? এরা ভাত না পায় পোলাও তো খেতে পারে!" পরে মন্ত্রী কি বলেছিলেন আর রাজার গদি বিক্ষোভরত প্রজাদের প্রতিবাদের মুখে কতদিন টিকে ছিল তা আমাদের জানা নেই।

গল্পটিতো বহুকাল আগেকার। আজকাল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, প্রগতি, জনগণতন্ত্র, সর্বহারার গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচারের অর্থে সমাজতন্ত্র, কল্যাণমুখী রাষ্ট্র বা অর্থনীতি ইত্যাদি ডামাডোলের যুগে কি এমনটা সম্ভব? আজকাল তো আর রাজা-বাদশাহদের যুগ নেই। গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের ধ্বমন্তরী দাওয়াইয়ের বদৌলতে প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রীদের সম্পর্ক নাকি জনগণের সাথে একেবারেই প্রত্যক্ষ। জনগণের প্রাণের ভাষায়ই নাকি আজকাল রাজনীতিবিদ আর প্রশাসকরা কথা বলেন। সুতরাং মধ্যযুগীয় দুর্দশার শিকার আজকালকার প্রজারা আর হবে কিভাবে? জনগণের কল্যাণ কামনায় পাল্লা দিয়ে আজকালকার রাজনৈতিক ক্ষমতা হাসিল করতে হয়। অবশ্য ক্ষমতা পেয়ে গেলে তাকে চিরস্থায়ী করার নিয়তে সমস্ত দলকে ভেঙ্গে দিয়ে একক দল গঠনের মহান কর্মের সাথে আমরা কিছুটা পরিচিত। তারা বলেন, ওটা নাকি গণতন্ত্রের উন্নততর স্তর। অবশ্য রাজনৈতিক আনুগত্যের বেলায় বেয়াদব জনগণ বলে অন্য কথা।

যাকগে, এসব আজেবাজে প্রলাপ। আমাদের এই আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে জনগণতন্ত্রের দেশে প্রকাশ্য দিবালোকে এমনকি কোথাও কোথাও সরকারের স্থানীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অর্থাৎ গ্রাম সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের সামনে মাত্র একশত টাকার অভাবের তাড়নায় মা তার সন্তানকে বিক্রি করেছে- এমন ঘটনার খবর যখন পত্র-পত্রিকায় পাঠ করি তখন এতসব শ্লোগানের মধ্য থেকেও মনে হয় শাসকদের সাথে প্রজাদের নিম্নতম যোগাযোগও নেই। তা না হলে এমনটি ঘটে কি করে? এই তো সেদিন ২০ জুলাই আমাদেরই এক সহযোগী খবর দিয়েছেন যে, খুলনায় স্পেন্সার অ্যান্ড কোম্পানী লিঃ এর পরিচালনাধীন এম.এইচ কেমিক্যাল কোম্পানীর দারোয়ান পাঁচ ছয়মাস বেতন না পাওয়ায় অভাবের তাড়নায় আর মনের দুঃখে ও ক্ষোভে নিজের দুই সন্তানকে বিলিয়ে দিয়েছেন। আরো একটি খবর পড়েছিলাম মাত্র ২০ টাকায় কোলের সন্তান বিক্রির।

ঘটনাগুলো খুব ছোট ছোট। কিন্তু এই মাত্র কয়েকটি ঘটনাকে জোড়া দিলেই একটি দেশ দেখা যায়। উপলব্ধি করা যায় একটি শাসন ব্যবস্থার কল্যাণমূখিতা। আর এমনি খবরের পাশাপাশি তো আন্তর্জাতিক রমনীয় বিলাসের সোনারগাঁ হোটেল নির্মিত হচ্ছে। প্রতিদিন উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয়িত হচ্ছে লক্ষ কোটি টাকা। আরো পরিকল্পনা আছে এমন অনেক উন্নয়নের। রাজধানীর আইল্যান্ডের প্রতি মাইল উঠাতে ষোল লক্ষ টাকার মত তো আমাদের চোখের সামনেই খরচ হলো। জনগণের কঙ্কালসার হাড্ডির উপর রঙীন টেলিভিশন চালু হতেও টাকার ঘাটতি পড়েনি। এমনি আরো অনেক কর্মকান্ড তো প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর তাতে খরচও হচ্ছে দেদার। তাহলে এদের কাজ-কারবার দেখে কি সেই রাজার কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক যে ভাতের দাম আর পোলাওয়ের দামের পার্থক্য জানে না। আর জানে না এ কথাও যে, প্রজাসাধারণের ভাত খাওয়ার যোগ্যতা না থাকলে পোলাও খাওয়ার যোগ্যতার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কোটচাঁদপুরের ফুলবাড়ীর মমতাজ বেগমের সন্তানের একশত টাকায় বিক্রির খবরের উপর দৈনিক সংগ্রামে একটি সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে বিগত ১৫ জুলাই। ঘটনার কোন প্রতিবাদ এরপরও পাওয়া যায়নি। সুতরাং ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে তো আমাদের আর কোন সন্দেহ নেই। খুলনার খবরটিরও কোন প্রতিবাদ আমাদের চোখে পড়েনি। সুতরাং এটিও যে সত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা প্রাচীনকালের সভ্যতাকে গাল দেই, মানুষকে তারা পশুর মত বেচা-কেনা করতো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে সে মানুষ তো একটা পশুর চাইতেও অনেক কম দামেই বিক্রি হচ্ছে। এইতো কয়েক বছর আগে অর্থাৎ চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে শুনেছি বুভুক্ষু সন্তানের কোন গতি না করতে পেরে শেষ পর্যন্ত পদ্মার পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে পরে আত্মহত্যা করে জননী তার অন্তর্জ্বালা চির দিনের জন্য নির্বাপিত করেছেন। মৃত ব্যক্তির ভাগ্যে

জুটেনি একখন্ড কাফনের কাপড়। তাই কলার পাতায় মুড়েই দাফনের কাজ সারা হয়েছে। আর বেওয়ারিশ লাশের মিছিল তো ঢাকাবাসী নিজেরাই প্রত্যক্ষ করেছে।

সেদিনকার খবরটায় আমার মতো অনেকেই শিউরে উঠেছিল যেদিন কমলাপুর রেল ষ্টেশনের কাছে এক আদম সন্তানের বমি খেয়ে আরেক আদম সন্তান জীবন রক্ষার শেষ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এত কিছু দেখার পরেও কি আমাদের জাতিকে ভবিষ্যতে এমনি অবস্থার শিকার হতে না দেয়ার জন্য আমরা কোন পরিকল্পনা নিয়েছিলাম বা এখনও নিয়েছি? তাহলে আবার এই দেশে মাত্র ১০০ টাকায় কোথাওবা বিশ টাকায় আদম সন্তান কিভাবে বিক্রি হতে পারে? রেডিও, টিভি, বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমীর বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমাদের জাতীয় মর্যাদার শিল্পীরা সখ করে কতবার সর্বহারার চরিত্রে অভিনয় করেন, সর্বহারার নেতৃত্ব দেন, তা তো গুণে শেষ করা যাবে না। আর এইসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে যারা সাংস্কৃতিক মনের খোরাক যোগাড় করেন, বাস্তব জীবনে সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে এদের যোগাযোগ কতটুকু আছে? অথচ তারাই তো দেশের হর্তাকর্তা, ভাগ্যবিধাতা। তারা সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করেন না কেন? যদি অন্তরের সাথে এই অভিনয়ের কোন যোগসূত্র না থাকে, তাহলে বিবেকের সাথে এমনকি মানবতার সাথে এই প্রতারণামূলক আচরণ করতে আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

আমাদের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত তো বর্তমান সরকারের আমলে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে বেশ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। গ্রাম সরকার প্রধানরা এ সমস্ত কাজে ব্যস্তও কম থাকেন না। অথচ গ্রাম সরকার প্রধানের সামনেই একশত টাকার বিনিময়ে এক দুঃখিনী মাতা তার সন্তানকে চিরবিদায় দিলেন। আর তিনি মাত্র একশত টাকার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হলেন। তাহলে মমতাজ বেগমদের কাছে গ্রাম সরকারের অস্তিত্বের কি প্রয়োজন আছে? যে সরকার আব্দুল গণি দারোয়ানের ৫/৬ মাসের বেতন দিতে অক্ষম হওয়ার ফলে দুই সন্তানকে বিলিয়ে দিতে হয়, আব্দুল গণির কাছে সেই রাষ্ট্র-সরকারের কি মূল্য আছে? এমনি অনেকের কাছেই যদি এই রাষ্ট্র-সরকার, দেশ, স্বাধীনতা ইত্যাদির অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় তাহলে উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে সুন্দরভাবে বিশ্বের সেরা মানুষের বাণী থেকে। কোন একটি জাহাজের ডেকে পানি না থাকায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা বারে বারে প্রথম শ্রেণীতে অর্থাৎ উপরের তলায় পানি নিতে আসে। উপরের তলায় লোকেরা এতে বিরক্তি বোধ করে এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরকে গালমন্দ করে। ফলে ডেকের যাত্রীরা শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে জাহাজ ছিদ্র করে পানি পাওয়ার কাজে লিপ্ত হয়। এই অবস্থায় উপরের তলার যাত্রীরা যদি পানির ন্যায্য অংশ দিয়ে তাদেরকে এহেন ধ্বংসাত্মক কার্য থেকে বিরত না করে তাহলে জাহাজের দশা কি হবে? কথাটি বলেছিলেন রসূল মকবুল (সা)। আর এই আদর্শের ভিত্তিতে নির্মিত সভ্যতারই এক

মহানায়ক একদিন ঘোষণা করেছিলেন, "ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায় তাহলে আদালতে আখেরাতে তাকেই জবাব দিতে হবে।" বলাবাহুল্য, দায়িত্বের এই তীব্র অনুভূতির কারণেই বিরাট সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব পেয়েও আরাম-আয়েশ তো দূরের কথা, রাতের ঘুমও তাঁর জন্য হারাম হয়েছিল। কিন্তু আজ আদম সন্তান অন্নের অভাবে ছটফট করছে, কত আদম সন্তান বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে, আমরা বর্তমান প্রগতিবাদী সভ্যতা এদের জন্য কি করতে পেরেছি? হয়তো বলবেন, ঐ সভ্যতার আমলে তো মানুষের এত উন্নতি হয়নি, এত বড় বড় নগর আর ভোগের সামগ্রী তৈরি হয়নি। আমি বলবো তখন হয়তো নগরে নগরে এত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ছিল না, এত ঠাট-ঠমকের আয়োজন হয়তো করা হয়নি, সংস্কৃতির নামে নারী-পুরুষের পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হয়তো তখন ছিল না, নারীকে ভোগের রঙ্গমঞ্চে তুলে দিয়ে শত-সহস্র লালসাপূর্ণ হাতের করতালির মাধ্যমে হয়তো তাকে সম্মান দেয়া হতো না, তখন হয়তো শাসক আর শাসিতের জীবনের মানের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না, সেদিনগুলোতে হয়তো সেনাপতি আর সাধারণ সৈনিক একই থালায় পানাহার করতো, হয়তো দরিদ্র চাকরের সাথে খলিফারা ভাগাভাগি করেই উটে ভ্রমণ করতো, হয়তো তখন রাতের আঁধারে বিধবার খাদ্য শাসক নিজেই কাঁধে বহন করে নিয়ে মুটের কাজ করতো- সেদিন আমরা হয়তো আধুনিক ছিলাম না ঠিকই কিন্তু মানুষ ছিলাম।

এটা বিড়াল হলে গোশত কই আর এটা গোশত হলে বিড়াল কই?

দৈনিক সংগ্রাম, ২২ আগষ্ট, ১৯৮১

বেশ কিছুদিন আগের কথা। একটা হাসির গল্প পড়েছিলাম। গল্পটা হয়তো অনেকেরই জানা। পারস্যের নাসিরউদ্দিন হোজা হাস্যরসিক হিসেবে ছিলেন অদ্বিতীয়। একবার বাজার থেকে হোজা দুই সের গোশত কিনে এনে স্ত্রীর হাতে দিলেন রান্না করতে। ইচ্ছা, দুপুরে কাজ-কাম সেরে বাসায় এসে মজা করে খাবেন। স্ত্রীও যথারীতি রান্না করে রেখে দিয়েছে। হঠাৎ তার কিছু বান্ধবী এসে ঠাট্টা-মশকারীর ছলে সবটুকু গোশতই খেয়ে ফেলল। স্ত্রী বেচারী লজ্জায় কিছু বলতে পারলো না। কিন্তু নাসিরউদ্দিন হোজার ভয়ে চিন্তা করতে থাকল কি করে স্বামীর কাছে গোশত উধাও হওয়ার জবাব দেবে। চিন্তা করতে করতেই নাসিরউদ্দিন হোজা বাড়ীতে এসে হাজির। গোসল সেরে হোজা খেতে বসলেন। স্ত্রী কিছু শাকসবজী সামনে দিতেই হোজা গোশতের কথা জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বললো হোজার প্রিয় বিড়ালটি সব গোশত সাবাড় করে ফেলেছে। কিন্তু উত্তর শুনেই বিশ্বাস করার পাত্র হোজা নন। তিনি লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে বিড়ালটাকে ধরে ফেললেন। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করে দেখলেন বিড়ালের ওজন মাত্র দুইসের। বিস্মিত হয়ে হোজা স্ত্রীকে বললেন, "এটা যদি বিড়াল হয় তবে গোশত কোথায়? আর এ দুই সের যদি গোশত হয় তবে আমার বিড়াল কোথায়?"

গল্পটা মনে পড়লো আমাদের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আব্দুস সাত্তারের একটি বক্তব্য পত্রিকায় দেখে। তিনি ঢাকার সবচেয়ে অভিজাত হোটেল সোনারগাঁও উদ্বোধনকালে আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই হোটেল আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য এবং

সংস্কৃতিকে পৃথিবীর মানুষের কাছে তুলে ধরবে। একেতো রাষ্ট্রের এক নম্বর ব্যক্তি, এরপর বিচারক মানুষ। তিনি অবান্তর কোন কথা বলবেন, অথবা হাওয়াই কায়দায় বক্তৃতার মাঠে যাচ্ছে তাই ইচ্ছে প্রকাশ করবেন এটা আমরা কোনক্রমেই আশা করতে পারি না। হয়তো তা তিনি করেনও নাই। এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে দেখা যায়, পর্যটনের মারফতেই একদেশের সভ্যতার ও সংস্কৃতির সাথে পৃথিবীর দূরদূরান্তের মানুষ পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। প্রাচীন ইতিহাসে হিউয়েন সাঙ, ইবনে বতুতা, আলবেরুনী এদের লেখা ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে ভারতবর্ষের তৎকালীন সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কিছুই অবগত হওয়ার সুযোগ আছে। এ যুগে পর্যটন ব্যবস্থা আরো উন্নত হয়েছে। অন্য দেশ ও জাতির মত আমরাও আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি এবং আদর্শকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরার সুযোগ পাব এটাই স্বাভাবিক। হয়তো এই উদ্দেশ্য নিয়েই হোটেলটির নামকরণও করা হয়েছে প্রাচীন বাংলার রাজধানীর নামে। কিন্তু নামটাই কি শুধু একটা জাতির পূর্ণ পরিচয় বহন করার জন্য যথেষ্ট? নামের আড়ালে হোটেলের ভেতরের ব্যবস্থাপনা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে একটা জাতিকে কোন একটি প্রতিষ্ঠান কিছুটা মাত্র পরিচয় করাতে সক্ষম হয়।

কয়েকদিন আগে দৈনিক সংগ্রামে একটি চিঠি ছাপা হয়েছিল যে, সোনার গাঁ হোটেলে নামাজ পড়ার কোন ব্যবস্থা নেই। রিসিপশন এলাকার কার্পেটের উপর নামাজ পড়তে চাইলেও কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেননি। শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশের একটি আন্তর্জাতিক মানের হোটেল যা মসজিদের নগরীতে অবস্থিত, তাতে নামাজ পড়ার কোন ব্যবস্থা নেই, এটা কি করে এই দেশের মানুষের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে? হোটেলটির রুমগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, পশ্চিম দিকে পা দিয়ে শুতে হয়। এটাতো এদেশের সাধারণ মানুষও জানে যে, কেবলার দিকে পা দিয়ে শয়ন করা কা'বার মর্যাদার খেলাফ। কোন সচেতন মুসলমানই জ্ঞাতসারে এই অন্যায় কাজটি করে না। কিন্তু আমাদের হোটেলের এই কর্তাব্যক্তিরা এটা মোটেই জানেন না এমনটা কি করে মেনে নেই? কর্তৃপক্ষ সবচেয়ে অবাক করেছেন বলরুমের একটি সুন্দর নাম দিয়ে। বলরুম মানে কি তা শিক্ষিত লোকদের কমবেশী সকলেরই জানা। যে রুমে পাশ্চাত্য ঢঙ্গে মেয়ে-পুরুষ এক সাথে নৃত্য বা বলনৃত্য করে সেই রুমের নামই বলরুম। হোটেলের বলরুমগুলো সেজন্যেই। অবশ্য এই রুমটির আয়তন বড় হওয়াতে বড় বড় সম্মেলন ও সভা-সমিতি, খাওয়া-দাওয়া এই রুমেই অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু প্রধানতঃ পূর্বে উল্লেখিত ঐ জাতীয় নাচ এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠানের জন্যেই বলরুমের নামকরণ করা হয়। সোনারগাঁ হোটেলের এমনি একটি রুমের নাম অর্থাৎ নাচঘরের নাম রাখা হয়েছে ফেরদৌস। ইসলামী বিশ্বাস মতে আখেরাতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে যে বেহেশত উপহার দেয়া হবে তার সর্বোত্তমটির

নাম ফেরদৌস। তাহলে কর্তাব্যক্তিরা কি এই ভেবেই এই রুমের নাম ফেরদৌস রেখেছেন যে, পরকালে জান্নাত পাই আর না পাই, পয়সার জোরে নগদ হুর-পরীদের দ্বারা পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার পূর্ণ সুযোগ যে কক্ষটি প্রদান করে তার নাম ফেরদৌস রাখাই বাঞ্ছনীয়। তা খোলাখুলি প্রকাশ করলেই তো হয়। কিন্তু এমন বন্য আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ তো আমাদের জাতীয় আদর্শে কখনও অনুমোদিত নয়। তাহলে এই অমানবীয় বিকৃত রুচির আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কোন দিকটা অন্যের কাছে তুলে ধরতে চাই? হয়তো ব্যাখ্যার খাতিরে কেউ বলতে পারে যে, মহাকবি ফেরদৌসীর নামানুসারে এই কক্ষের নামকরণ করা হয়েছে। তাহলেও প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, একটি অশ্লীল নৃত্যশালার নাম একজন ধর্মপ্রাণ মহাকবির নামানুসারে কিভাবে রাখা যেতে পারে? তাতে ঐ মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, না অসম্মান এটাই আমাদের জিজ্ঞাসা। এছাড়াও ঐ হোটেলে সুযোগ আছে নগ্ন গোসলের, প্রকাশ্যে মদ্যপানের। হয়তো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষাংশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি যেভাবে পরিচালিত হয়েছে তার চেহারা দেখলে আদিম যুগের অসভ্য মানুষের কথাই মনে পড়ে যায়। সেখানে শত শত লালসাপূর্ণ দৃষ্টি আর করতালির মাঝে অনেকেই পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে ডুবে গিয়েছিলেন দানবীয় আনন্দ রসে। এমনি অনেক অনুষ্ঠানেরই আয়োজন হবে ঐ ফেরদৌস বলরুমে।

আমরা বুঝতে পারি না। এদেশের মানুষের প্রাণপ্রিয় রাজধানী ঢাকায় ঐ জাতীয় কাজকারবারের সুযোগ সৃষ্টি করে বিশ্বের মানুষের কাছে আমরা কি প্রমাণ করছি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আমাদের জাতিসত্তাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্যে একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র অনবরত কাজ করে যাচ্ছে। যারা কবিতার মাঝে প্রাণপ্রিয় রসূল (সা) কে গালি দেয়, যারা লন্ডন শহরে ক্লাবের নাম মেককা হাউস রেখে সেখানে মদ, জুয়া, তাস এবং অন্যান্য লাম্পট্যের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যারা পাশ্চাত্য ঢঙ-এ নাচের আসরের ঘরটি নাম রাখে ফেরদৌস, সুযোগ পেলেই যারা ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য আর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে উপহাস করার সুযোগ সৃষ্টি করে, যারা মসজিদে আল-আকসায় আগুন-ধরায় তার পবিত্রতা নষ্ট করার জন্য, যারা গোপনে সুড়ঙ্গ পথে রসূলের (সা) মাজার থেকে হাড়গোড় চুরি করে নিয়ে অপমান করার চেষ্টা করেছে অনেক বার, তারা সকলেই ঐ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চক্রের সদস্য। কিন্তু এতটুকু বলেই স্বস্তি পাওয়া সম্ভব নয়। যারা ঐতিহাসিকভাবে আমাদের চিরন্তন শত্রু, তারা তো আমাদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবেই। আমরা তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হই কেন? আমাদেরই ঢাকার বুকে হোটেল ইন্টারকনে প্রতিটি কক্ষে বাইবেল পাওয়া যায়। কিন্তু ইন্টারকন, পূর্বানী, সোনার গাঁ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক হোটেলে আমাদের জাতির প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব কার? সেখানে প্রতিটি রুমে তরজমাসহ কোরান শরীফ কে রাখবে? তার পরিবর্তে যা অনুষ্ঠিত এবং প্রদর্শিত হচ্ছে তার সাথে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার মিল কতখানি? নাসিরউদ্দিন হোজার মত বলতে ইচ্ছে করে যে, অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের আশাবাদ সত্য হলে সোনারগাঁ হোটেলের সামগ্রিক ক্রিয়াকর্মে আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ছাপ কোথায়? আর হোটেলের এই সমস্ত কার্যকলাপ যদি আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের প্রতিফলন হয় তবে প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের সত্যতা কোথায়?

দুর্নীতির প্রকৃত উৎস

দৈনিক সংগ্রাম, ০৬ মার্চ, ১৯৮২

"শিক্ষিত লোকেরাই দুর্নীতির প্রকৃত উৎস" কথাটা আমার নয়। আমার মত অর্ধশিক্ষিত লোকের পক্ষে এতবড় মন্তব্য করার সাহস নেই। করলে অনেক সময় জীবনের আশংকাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কথাগুলি বলেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আব্দুল আজিজ খান। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত দু'দিনব্যাপী সম্মেলনে "উচ্চশিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন" শীর্ষক আলোচনার দ্বিতীয় দিনে সভাপতির ভাষণে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এখানে আরো অনেক সুন্দর সুন্দর মন্তব্য করেছেন বিভিন্ন বক্তা। আলোচিত হয়েছে বহু সুযোগ-সুবিধার আকর ভাইস চ্যান্সেলর পদটির জন্য রুদ্ধশ্বাস প্রতিযোগিতার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ডীন পদটি নিয়ে রাজনীতির কথা। এক শ্রেণীর শিক্ষক শুধু বিদেশী ডিগ্রীকে সম্বল করেই জাতির ঘাড়ে চেপে বসে হাজার হাজার টাকা লুটেপুটে খাচ্ছেন, অথচ কাজের নামে ঘোড়ার ডিম এমন কথাও আলোচনা হয়েছে। এখন সুপারিশ করা হচ্ছে, ডীন ও ভাইস চ্যান্সেলরের পদটিকে আবর্তন নীতির ফর্মূলায় ফেলা হোক। প্রথম দিনটিতে আলোচনা হয়েছে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা দিক। রাজনীতিকদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হাতছানিতে কিভাবে যুবসমাজ শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করছে সেদিকে ইঙ্গিত করে তাদের প্রতি অসহায়ভাবে মিনতি জানানো হয়েছে- তারা আদৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চান কিনা আজ সেটাই ভেবে দেখতে হবে। কোন বক্তা আবার অবৈধ সরকারী হস্তক্ষেপের

কথাও বলেছেন। এভাবে "উচ্চশিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন" শীর্ষক সেমিনারে ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় বক্তাগণ অনেক সত্য কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

'শিক্ষিত সমাজই যে দুর্নীতির উৎস' এ কথাটি বাংলাদেশে নতুন নয়। মরহুম শেখ মুজিবও সাদা জামাকাপড় পরিহিত জেন্টেলম্যান গোষ্ঠীর লোকজনকে দুর্নীতির আখড়া এবং দেশের যাবতীয় দু:খকষ্টের জন্য দায়ী করেছেন। এইতো মাত্র কয়েক দিন আগে দুর্নীতির দায়ে বর্তমান প্রেসিডেন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করার কারণ রেডিও টিভিতে প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। জাতির মান-সম্মান ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। যে দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তিকে দুর্নীতির কথা এমনি অকপটে স্বীকার করে মন্ত্রিসভা বাতিল করতে হয় তাদের মান-সম্মান বিশ্বের দরবারে থাকে কোথায়? মাফ করবেন! আমি দুর্নীতি চাপা দিয়ে মান-সম্মান রক্ষা করার কথা বলছিনে, আমি বলছি এমন জাতীয় চরিত্র নিয়ে, এ মান নিয়ে মুখ দেখাই কি করে।

একটু চিন্তা করলেই কথাটা যে কতদূর সত্য, তার শিকড় যে কত গভীরে তা চিন্তা করতে অসুবিধা হয় না। বেশী দূরে যাওয়ার দরকার নেই। মননশীল ব্যক্তিদের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ তাদের কথাই ধরা যাক। দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান যাদের একাধিক ডক্টরেট ডিগ্রী আছে তাদের সকলেরই বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। কেউবা জরিমানা দিয়েছেন, কেউবা জেল খেটেছেন, কেউবা তদন্তের অধীনে আছেন। এদের মধ্যে কেউবা সাবেক হয়েছেন, কেউবা এখনও বহাল তবিয়তে প্রচ-দাপটে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং সময় সুযোগ পেলেই জাতিকে কিছু নসিহতও করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর যে তদন্ত হয়েছিল সে রিপোর্ট প্রকাশিত হলে নাকি বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের মান সম্মান এমনভাবে ভূলুণ্ঠিত হতো যে, সরকার লজ্জায় সে রিপোর্ট প্রকাশেরও সাহস করেননি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত রিপোর্টে আমরা দেখেছি, শুধু রাজনৈতিক দর্শনের অমিল থাকার কারণে কিভাবে একজন ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষমতাকে অনবরত চ্যালেঞ্জ করে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নারকীয় পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। আর এই কাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষকরাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষকের নেতৃত্বে শুধু রাজনৈতিক কারণে একজন শিক্ষক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে একদিনের জন্যেও দায়িত্ব পালন করতে পারেনি আজ দেখি সেই শিক্ষকদেরই আবার রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ওয়াজ নসিহত করতে। শুনলে সত্যিই হাসি পায় দু:খও লাগে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছোট একটি স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য সরলমতি ছাত্রদেরকে ভায়োলেন্সে উসকিয়ে দেন, নিজেরা হাতাহাতি পর্যন্ত করেন, তারা কি করে ছাত্রদেরকে মানুষ করে গড়ে তুলবেন-এটা অন্তত: আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝেই আসে না।

যারা এক বা দু'বছরের ছুটি নিয়ে বছরের পর বছর বিদেশে শুধু অর্থের মোহে ওয়াদাভঙ্গ করে কাটাচ্ছেন, যারা মাসের পর মাস ছুটি না নিয়েই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকছেন, যারা ফুল টাইম পলিটিক্স করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভায় বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে সময় কাটাচ্ছেন আর পার্টটাইম শিক্ষকতা করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস গেলে মাইনের পুরো কচকচা টাকাগুলো গুণে নিচ্ছেন, তাদের তো বিবেকের মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং এই মৃত আত্মাবিশিষ্ট শিক্ষকগণ কি করে ছাত্রদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করে মননশীল মানুষ তৈরি করবেন এটা অন্ততঃ আমার চিন্তায় আসে না।

প্রেসিডেন্ট যে মন্ত্রী সভা দুর্নীতির দায়ে বাতিল করেছেন তারাও তো কেউ অশিক্ষিত মানুষ নন। অনেকেরই আছে ছাত্রজীবন থেকে রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ডসহ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ডিগ্রী। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যারা কলমের খোঁচায় লাখ লাখ টাকা বেমালুম গায়েব করে ফেলেন তারা কেউই বাংলাদেশের চাষাভূষা নয়, ক্যাডার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষিত গোষ্ঠীর ক্রীম। হাইজ্যাকার হিসেবে যারা ধরা পড়ে, ডাকাত হিসেবে যারা আটকা পড়ে, সন্ত্রাসবাদীর মহান (?) তৎপরতায় যাদের জুড়ি নেই তাদের মধ্যে কে অশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর? এমনকি এরা কেউতো প্রগতিশীলদের ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট (?) ধর্মীয় গ্রুপের লোকও নয়। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে রাজনৈতিক গুন্ডা দ্বারা আমাদের ক্ষমতাসীন বা বিরোধীদলের যারা জনগণের মাথার উপর ছড়ি ঘুরাচ্ছেন এদের অনেকেরই বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের মামলা থানায় ঝুলছে। মন্ত্রীর বাড়ী থেকে সাত বা ততোধিক খুনের আসামীকে গ্রেফতার করা হলো। এমনকি এই খুনী স্বয়ং মরহুম প্রেসিডেন্টের সাথে দুই দুইবার রাষ্ট্রীয় খরচে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেল। যে দেশে আইন-শৃঙ্খলায় নিয়োজিত মন্ত্রী তার দলে দুর্ধর্ষ গুন্ডা ও খুনী যোগদান করলে খুশীতে আত্মহারা হয়ে পড়েন, যে দেশের মন্ত্রীরা ছাত্র নামধারী গুন্ডাদেরকে নিজের কক্ষে ডেকে অপরকে শায়েস্তা করার জন্য যে কোন সাহায্যের অঙ্গীকার করেন, যে দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বনামধন্য তনয় হাইজ্যাক করতে গিয়ে পুলিশের গুলীতে আঘাতপ্রাপ্ত হলে চাকুরীর ভয়ে পুলিশকে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে হয়, যে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষায়তনের হলগুলো অস্ত্রপাতির যোগাড় যন্ত্রের দিক থেকে ক্যান্টনমেন্টের সাথে তুলনীয়, সে দেশে যদি বলা হয়, "শিক্ষিত সমাজই সকল দুর্নীতির উৎস" তাহলে এর চেয়ে সত্য ভাষণ বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নেই।

এক শ্রেণীর রাজনীতিক ও সমাজ বিজ্ঞানী প্রায়ই বলে থাকেন অশিক্ষা এবং অভাবই নাকি সমস্ত দুর্নীতি ও অনৈতিকতার উৎস। তাহলে উপরে যাদের ফিরিস্তি দিলাম তারা কে অশিক্ষিত, কে গরীব? কেউ তো নয়। বরং শিক্ষায়-দীক্ষায় সম্পদে আর বৈভবে এরাই তো সমাজের উচ্চতম শ্রেণী। আমাদের প্রগতিশীল (?) বুদ্ধিজীবীদের

মতে ধর্ম এবং ধর্মীয় মূল্যবোধই নাকি সমাজে সমস্ত শোষণ, জুলুম আর দুর্নীতির উৎস। কিন্তু উপরে যাদের দীর্ঘ তালিকা আমি পেশ করেছি যারা বিভিন্ন একাডেমীর মহাপরিচালক হয়ে লাখ লাখ টাকা গায়েব করেছেন, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে সুস্থ পুত্রকে সিকবেডে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন দেশে সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়েও আট নম্বর পাওয়ার যোগ্য ছাত্রকে শুধু নিজের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার জন্যে একত্রিশ নম্বর দিলে তৃতীয় পরীক্ষককে তা সংশোধন করতে হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হয়ে হাইজ্যাক করেছেন, সর্বোপরি বর্তমান প্রেসিডেন্ট যাদের মন্ত্রীত্ব থেকে বিতাড়িত করলেন, তাদের কত শতাংশ ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত? তাদের শতকরা কয়জন ধর্মীয় চরিত্রে চরিত্রবান? তাদের কয়জন নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত? আমিতো চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি শতকরা একজনও নয়। বাংলাদেশ হওয়ার পর এ পর্যন্ত যতজন হাইজ্যাকার ধরা পড়েছে তাদের কতজন ধর্মীয় চরিত্র বা ধর্মীয় শিক্ষার লোক? কোন গবেষণা না করেই নির্দ্বিধায় বলা যায়, শতকরা একজনও নয়। যারা সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালিয়ে জান ও মালের ক্ষতিসাধন করে, চোরা রাস্তায় ক্ষমতা দখল করতে চায়, তাদের কতজন ধর্মীয় শিক্ষা বা চরিত্রের লোক? জোর গলায় যে কোন রিস্ক নিয়েই বলা যাবে শতকরা আধা জনও নয়। যদি থানা কোর্ট এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চে খোঁজ নেয়া যায় যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক দিক থেকে কোন ধরনের রাজনৈতিক নেতারা বেশী অধ:পতিত হিসাব বিজ্ঞানের বিশিষ্ট পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ না করেও বলা যাবে এরা আর যাই হোক ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বা ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে যারা পরিচালিত অন্তত: তারা নয়।

তাহলে আলোচনার সারবস্তু কি দাঁড়ালো যারা দুর্নীতির উৎস বা ঘাঁটি বলে পরিচিত তারা অশিক্ষিত নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত। তারা সাধারণ শিক্ষিত মানুষ নয়, বরং সমাজের কল্যাণ চিন্তায় বা কথায় অনেকেই কোন রাজনৈতিক দর্শনের সাথে জড়িত। বড় বড় অপরাধের সাথে জড়িত প্রায় সকলেই অর্থনৈতিক দিক থেকেও অসচ্ছল নয়। তাদের প্রায় সকলেই ধর্মীয় শিক্ষা ও চরিত্র বিবর্জিত। তাহলে আমাদের প্রগতিশীল বন্ধু বান্ধব বা তাদের তাত্ত্বিক গুরুরা দুর্নীতি, দুশ্চরিত্র, শোষণ, জুলুম ইত্যাদির যে ব্যাখ্যা এতদিন দিয়ে এসেছেন সে ব্যাখ্যায় যে গলদ আছে, তাদের জীবনবোধে যে ত্রুটি আছে, তাদের রাজনৈতিক দর্শন যে ভ্রান্ত, তাদের শিক্ষাদর্শন যে মানুষ তৈরিতে ব্যর্থ, তাদের সামাজিক তত্ত্বগুলো যে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যোগ্য তা কি কোন গবেষণাগারে বিশেষভাবে গবেষণা করে বলার প্রয়োজন আছে?

যদি বলা হয় এরা শিক্ষিত হলেও কুশিক্ষায় শিক্ষিত। এত ব্যাপকহারে যে শিক্ষা

চরিত্র ধ্বংস করে, দুর্নীতিবাজ বানায়, সে শিক্ষা ব্যবস্থা তাহলে বদল করতে এত গড়িমসি কেন? জাতীয় অর্থের সিংহভাগ খরচ করে কুশিক্ষায় শিক্ষিত করার যৌক্তিকতা কোথায়? আমরা তো একাধিকবার বলেছি, শিক্ষার সাথে ধর্ম ও নৈতিকতার যোগসূত্র স্থাপন করা হোক। শিক্ষাবিদ স্ট্যানলি হলতো ঠিকই বলেছেন, "If you teach your children the three `R's (i.e. Reading, Writing and Arithmetic) and leave the fourth `R' (i.e the Religion) you will get a fifth `R' (i.e Rascality)." রাজনৈতিক দর্শন তাওতো পাল্টানো একেবারে ফরজ হয়ে পড়েছে। সামাজিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ইত্যাদি প্রত্যেকটি ব্যাপারে ব্যাপক পরিবর্তন না এনে জোড়াতালিতে কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত হয়েছে। আজ সকলের মুখে যে ব্যর্থতার স্বীকৃতি ধ্বনিত হচ্ছে যদি তা সঠিক দিকে প্রবাহিত হয়ে সঠিক জীবন দর্শন দ্বারা পরিচালিত হয় আর তারই ভিত্তিতে একটি সমন্বিত জীবন পরিকল্পনা অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, সাংস্কৃতিক কর্মকা-, পারিবারিক ও সমাজজীবন পরিচালনার চাবিকাঠি হিসাবে কাজ করে তাহলেই মুক্তি সম্ভব। অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অসুখ টের পাওয়াই যথেষ্ট নয়, কারণও জানতে হবে, সেইমতে ওষুধও সেবন করতে হবে।

শোক করিয়া লাভ নাই
শহীদি খুনের নজরানা চাই

দৈনিক সোনার বাংলা, ১৫ মার্চ, ১৯৮২

গত এগারই মার্চ সকাল সাড়ে নয়টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর মানব ইতিহাসের এক জঘন্যতম ঘটনা ঘটিয়া অর্ধশতাধিক ছাত্রের চাপ চাপ রক্তে ভিজিয়া গেল। প্রকাশ্য দিবালোকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সামনে সদর রাস্তায় অপেক্ষমান কয়েকশত পুলিশের নাকের ডগায় এ কেমন করিয়া এমন একটি নির্মম ঘটনা দীর্ঘ দুই ঘণ্টা যাবৎ চলিতে পারিল, কেমন করিয়া নিয়ম-কানুন, অনুমতি ইত্যাদি বেড়াজালে আটকা পড়ার দোহাই দিয়া নিজ নিজ দায়িত্ব পালন হইতে সকলেই বিরত থাকল, তাহা সত্যিই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ইসলামী ছাত্রশিবিরের ছাত্ররা যখন নবীনবরণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল, তখন ছাত্র নামের কলঙ্ক, মানবতার দুশমন, হিংস্রতার দিক হইতে জানোয়ারের চাইতেও অধম কয়েকশত গুন্ডা ছোরা, রামদা, ভোজালী, রড, হকিষ্টিক ইত্যাদি লইয়া তাহাদের উপর ঝাপাইয়া পড়িল। মুহূর্তের মধ্যে ভয় বিহবল হইয়া নিরস্ত্র ছাত্ররা যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পালাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মানবতার জঘন্যতম দুশমনদের হিংস্র থাবা হইতে পালাইতে চাহিলেই কি সম্ভব? কক্ষে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়াও নিস্তার নাই। জানোয়ারের স্বভাব বিশিষ্ট বীরপুরুষেরা দরজা ভাঙ্গিয়া মনের ঝাল মিটাইয়া তাহাদের স্বগোত্রীয় ছাত্রদের রক্ত দ্বারা গোসল করিল, কাহাকেও বা চিরদিনের জন্য দুনিয়া হইতে বিদায় করিয়া দেওয়ার জন্য সজোরে আঘাতের পর আঘাত করিল। সবশেষে মনের ঝাল মিটাইয়া বন্য হিংস্রতাকে পরিতৃপ্ত করিয়া অট্টহাসি দিতে দিতে নিরাপদে ঘটনাস্থল হইতে বুক ফুলাইয়া চলিয়া গেল।

উপস্থিত দর্শকদের অন্তরে কেমন প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল জানি না, তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ঘাস, প্রতিটি বৃক্ষ, প্রতিটি ইট আর বালুকণা যেদিন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে এই হিংস্র জানোয়ার আর তাহাদের সহযোগীদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং সরকারী প্রশাসনও যে সহযোগীর ভূমিকা পালন করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ যখন উত্থাপন করিবে সেদিন তাহারা কি জবাব দিবেন এটাই ভাবিতেছিলাম। ইহাদের নির্মম নির্দয় আঘাতে এ পর্যন্ত তিনজন শাহাদত বরণ করিয়াছেন। আরো তিনজনের অবস্থা আশংকাজনক। যে কোন সময়ই তাহাদেরকেও শাহাদাতের পেয়ালা পান করিতে হইতে পারে। আমি কিন্তু এত হিংস্রতা, এত নিষ্ঠুরতা, এতটা অমানবিক আচরণে মোটেই বিস্মিত হই নাই। তিনজন শহীদের জন্য শোক করারও তেমন কিছু দেখি না। বরং অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, আমার মনে হইয়াছে ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই অগ্রসর হইতেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, পশুত্বের বিরুদ্ধে মানবতার, অমানুষের বিরুদ্ধে মানুষের, সর্বোপরি কুফরীর বিরুদ্ধে ইসলামের সংগ্রামেরই ইতিহাস এইভাবেই রক্তের আখরে লেখা। কোন নবীই এই পথ এড়াইতে পারেন নাই, কোন মুজাদ্দিদের জন্যই ভিন্ন পথ ছিল না, কোন ইমামও অন্যপ্রকার পুষ্প আচ্ছাদিত পথের কথা চিন্তাও করেন নাই। সুতরাং এই যুগেও যাহারা ঐ একই পথের যাত্রী বলিয়া দাবী করে, তাহাদের পথ ভিন্নতর কিছু হইবে কেমন করিয়া। ইসলামের গোটা ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে যেন আমার মনে হয়, ইসলাম নামক শ্যামল সতেজ গাছের রং সারের অভাবে যখনই ফিকা বা পিঙ্গল হইয়া গিয়াছে, তখনই শহীদের তাজা রক্তের সার দিয়া গাছটিকে আবার তরতাজা করিয়া ফুলে ফলে সুশোভিত করা হইয়াছে। সুতরাং ভয়ের কিছু নাই, শঙ্কার কিছু নাই, আক্ষেপেরও কিছু দেখিতেছি না। বরং দিব্যদৃষ্টিতে যেন দেখিতেছি এই দেশেই ইসলামের কালেমা খচিত বিজয়ী পতাকা শহীদদের রক্তের মিনারের চূড়ায় পতপত করিয়া উড়িতেছে। শহীদ শাব্বিরের পিতার অসমান্য ধৈর্য দেখিয়া আমার ঈমান ইয়াকীনে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু ইহার পরও কথা থাকিয়া যায়। যাহারা এইরূপ জঘন্য আচরণ করিল তাহারা কাহারা? ইহারা কোথা হইতে আসিল? গত একুশে জানুয়ারী শিবিরের মিছিলে বোমাবাজি করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পীচঢালা প্রশস্ত রাস্তাকে রঞ্জিত করিয়া দুইটি জীবনকে চিরতরে পঙ্গু করিয়া দিল কাহারা? গত কয়েকবছর ধরিয়া পরপর চট্টগ্রামে ইসলামী ছাত্রশিবিরের অফিসে, মিটিং-এ মিছিলে হামলা করিল কাহারা? সিলেটের শাহজালালের মাটিতে বসিয়াই রসূলে মকবুল (সা.) বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিবার মত দুঃসাহস করিল কাহারা? বিগত আটাত্তর সালে এই রাজশাহীতেই শিবিরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে হামলা করিয়া কয়েকজন ছেলেকে আহত করিয়া ছিল

কাহারা? বিগত বৎসর নানা ছলছুতায় ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যেখানে সেখানে নগ্ন হামলা চালাইল কাহারা? এই দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর রুশ আধিপত্যবাদ যে ষড়যন্ত্রের সূচনা করিয়াছে ইহারা সেই ষড়যন্ত্রেরই মানব সন্তান। তাহাদের অর্থ-সম্পদ ও বুদ্ধি এবং প্রয়োজনে অস্ত্রপাতি দ্বারা লালিত পালিত এই গোষ্ঠী গোড়া হইতেই এই দেশের মানুষের মন ও মাটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে।

এদের চরিত্র এক আজব। এদেরকে দেশবাসীর লক্ষকোটি টাকা খরচ করিয়া লেখা-পড়া শিখাইয়াও মানুষ করা সম্ভব হয় নাই। দেশবাসী রক্ত পানি করা পয়সা দিয়া গাড়ী ঘোড়ায় চড়াইয়াও কোন ফায়দা হয় নাই। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিবার জন্য এমন কোন হীন কাজ নাই যাহা করে নাই। ইহারা সাংবাদিক হইলে মিথ্যা প্রতিবেদন তৈয়ার করে, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হইয়াও ছাত্রের রক্তে নিজেদের দেহকে পবিত্র করে। তাহা না হইলে শত শত মানুষের চোখের সামনে যে ঘটনা ঘটিয়া গেল কি করিয়া তাহা নিজেদের ফ্যাক্টরীতে তৈয়ার করিয়া নিজেদের পত্রিকায় নিজেদের মত করিয়া ছাপাইল? কি করিয়া দুইজন শিক্ষক জনাব ইউনুস আর আসগর আলী অর্ধশতাধিক ছাত্রের চাপ চাপ রক্ত দেখিয়া তৃপ্তির হাসি হাসিলেন? সারা রাজশাহী যখন শোকে-দুঃখে-ভীতিতে অস্থির তখন কি করিয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ব্যস্ততা আর ক্লান্ত হওয়ার দোহাই দিয়া যেন কিছুই ঘটে নাই এমনভাব প্রকাশ করিলেন? কি করিয়া একটি জেলায় মানুষের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিয়া ডিসি সাহেব পত্রিকার একজন রিপোর্টারের সাথে এতবড় কান্ড লইয়া স্যাটায়ার করিতে পারিলেন? কি করিয়া বড় বড় রাজনৈতিক পার্টি চালাইয়াও এতবড় নৃশংস ঘটনার জন্য সৌজন্য রক্ষার খাতিরেও একটু নিন্দা পর্যন্ত জ্ঞাপন করিতে পারিলেন না? আসলে যাহার উৎস খারাপ, পাক ও পুঁতিগন্ধময়, তাহাকে দুরস্ত করা খুব সহজ কাজ নহে। এ জন্য আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, "প্রতিটি জিনিস তাহার উৎসের দিকেই ফিরিয়া যায়।"

ইহাদের চরিত্র সম্পর্কে কিছু না বলিলে ব্যাপারটা খোলাসা হয় না। সমরখন্দ, বোখারা, তাজাকিস্তান, তুর্কিস্তানের কোটি কোটি মুসলমানের রক্তে ইহাদেরই হাত রঞ্জিত হইয়াছে। দক্ষিণ ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া, মিসরে ইহারাই হাজার হাজার মুসলমানকে শহীদ করিয়াছে। ইসরাইলের হস্তকে শক্তিশালী করিবার মানসে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে ইহারাই বাড়ীঘর হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। ফিলিপাইন, ইথিওপিয়া আর তিউনিসিয়ায় ইহারাই লক্ষ লক্ষ মুসলিম মা-বোনের ইজ্জতকে ভূলুণ্ঠিত করিয়াছে।

আফগানিস্তানে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের আল্লাহ আকবর ধ্বনিকে ইহারাই চিরতরে স্তব্ধ করিয়া দিবার ঘোষণা দিয়েছে। এই অশুভ শক্তির মুরুব্বিরাই কিউবা, পূর্ব

জার্মানি আর পোল্যান্ডের হাজার হাজার নিরীহ শ্রমিকদের রক্তের উপর দাঁড়াইয়া সাদ্দাদ আর ফেরাউনের মত অট্টহাসি দিয়া মানবতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়াছে। এই অশুভ শক্তিই চীনে লীউ শাওচিকে অপসারণ আর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে পঞ্চাশ হাজার নিরীহ চীনবাসীকে দুনিয়ার আলোবাতাস হইতে চিরতরে বিদায় দিয়েছে। এই অশুভ শক্তির আরেক মুরব্বি ভারত শত সহস্র নিরীহ মুসলিম জনসাধারণের রক্তে হোলি খেলিতেছে। কোটি কোটি হরিজনকে মানুষের নিম্নতম অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

সুতরাং এই অশুভ বিশ্বশক্তির যাহারা সেবাদাস তাহাদের চরিত্র ভিন্ন প্রকৃতির হইবে কেমন করিয়া? আসলে এই লোকগুলির কোনই দোষ নাই। ইহারা যে আদর্শের ধারক ও বাহক দোষ সেই আদর্শের। বস্তুবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া নৈতিক মূল্যমান বিসর্জন দিয়া যে মানুষখেকো জংলী ও পাশবিক চরিত্র বিশিষ্ট তথাকথিত আর্দশের উদ্ভব হইয়াছে তাহা কমুনিজমের নামেই হউক আর সমাজতন্ত্রের নামেই হউক অথবা পুঁজিবাদ আর গণতন্ত্রের নামেই হউক-সর্বকালে সর্বযুগে এই মানুষ খেকো বন্য আদর্শের একই চেহারা। এই বন্য আদর্শের অনুসারীদেরও একই চরিত্র, একই চেহারা। তাইতো কাবিল আর ফেরাউন, সাদ্দাদ আর নমরুদ, আবু জেহেল আর আবু লাহাব অথচ বর্তমান কালের তাহাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। হিন্দারা যে মনোভাব নিয়া হযরত হামজার (রা) কলিজা চিবাইয়াছিল ইহারা তো তাহাদেরই বংশধর।

ইহারা স্বাধীনতার তুলনায় গোলামীকেই বেশী পছন্দ করে। এজন্যেই দেখি পূর্ব বার্লিনের লোকেরা যখন স্বাধীন জীবনের জন্য উন্মুখ, তখন ইহারা রাশিয়ার গোলামীতে চিরতরে আবদ্ধ হইবার জন্য সুউচ্চ দেওয়াল নির্মাণ করে, পোল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী মানুষ যখন গোলামীর নাগপাশ হইতে মুক্তি পাওয়ার আওয়াজ তুলে তখন ভাড়াটিয়া সৈন্য আনিয়া সামরিক শাসন দিয়া গোলামীর জিঞ্জিরকে পাকাপোক্ত করে। আফগানিস্তানের লক্ষ লক্ষ মুজাহিদ যখন স্বাধীনতার জন্য জীবনকে বাজি রাখিয়া জেহাদে লিপ্ত তখন রাশিয়ার কাস্তে হাতুড়ী মার্কা পতাকার নীচে আত্মসমর্পণ করিয়াই ইহারা মুক্তির স্বাদ পায়। তাই বাংলাদেশেও যখন সাড়ে আট কোটি তৌহিদী মানুষ নিজেদের জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীন মুক্তির নেশায় পাগলপারা, তখন ইহারা তাহাদের মুরুব্বি ভারত, রাশিয়া অথবা আমেরিকার গোলামীতেই মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। আসলে এইটাই তাহাদের জন্য স্বাভাবিক, এইটাই তাহাদের চিরন্তন চরিত্র।

সিদ্ধান্তে বলিতে হয়, যতদিন এই মানুষ-খেকো আদর্শের অস্তিত্ব আছে ততদিন এই আপদ দূর করার কোন উপায় নেই। তাই মানুষকে যদি স্বাধীনতা লইয়া বাঁচিতে হয়,

মানুষকে যদি তাহার স্রষ্টার পছন্দনীয় পদ্ধতিতে জীবন যাপন করিতে হয়, মানুষকে যদি মুক্ত মানুষের মত নিরাপদ জীবন-যাপন করিতে হয়, যদি হিংস্র রক্তলোলুপ মানবরুপী পশুদের হাত হইতে মানবতাকে বাঁচাইতে হয়- মোট কথা মানুষকে যদি মানুষের মত বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে এই মানুষ-খেকো আদর্শকে দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্ত হইতে চিরতরে উৎখাত করিতে হইবে, নির্মূল করিতে হইবে। এই রক্তপিপাসু অনুসারীদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে গড়িয়া তুলিতে হইবে প্রতিরোধ। বাংলার প্রতিটি জনতাকে এই বন্য আদর্শের আসল চেহারা আর অনুসারীদের আসল চরিত্র বুঝাইতে হইবে। দেশকে বাঁচাইতে হইলে, দেশের মানুষকে বাঁচাইতে হইলে, সর্বোপরি ঈমান আকিদা লইয়া বাঁচিতে চাহিলে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সাথে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। ঈমানদার প্রতিটি মানুষকে আজ অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। অন্যথায় শুধু বুক চাপড়াইয়া, শহীদদের জন্য শোক করিয়া কোন লাভ নাই। আজ একটি গজলের কলিগুলি বড় আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে গাহিতে ইচ্ছা করিতেছে,

“তোরি দেশের বাঁকে বাঁকে
লক্ষ শহীদ আজো ডাকে
তবুও কি তুই রইবি বেহুঁশ
আজি একথার জবাব যে চাই।”

জবাব দিতে হইলে মুখের কথায় অথবা মিটিং মিছিল আর প্রতিবাদ সভায় কাজ হইবে না। ঈমানের আলোতে প্রজ্জলিত বক্ষের তাজা শহীদি খুনের নজরানা চাই।

কাকের বাসায় কোকিলের ছানা

দৈনিক সংগ্রাম, ১৯ জুন, ১৯৮২

ছোটকাল থেকেই একটি প্রবাদ শুনে এসেছি। তা হলো "বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।" তেমনি আরো একটি গল্প পড়েছি কাকের বাসায় কোকিলের ছানা সম্পর্কেও। প্রথমটি প্রবাদ হলেও দ্বিতীয়টি কিন্তু নির্ঘাত সত্য কথা। কোকিলের স্বর মিষ্টি, কিন্তু চেহারাটা কালো। তাছাড়া নিজ হাতে বাসা তৈরি করার যোগ্যতা নাকি তার একেবারেই নেই। তাই আর কি করা। কাক বেচারার তৈরি বাসাতেই লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মত ডিম পেড়ে বাচ্চা বানিয়ে নেয়। এমন কাজ-কাম শুধু পশু পাখীরা কেন মানুষও তো কিছুটা কম করে না। তিতা ওষুধ খেতে না চাইলে আমাদের মায়েরা চিনি বা মিঠাই মিশিয়ে বাচ্চাদেরকে গিলিয়ে দেয়। এমনকি অনেক সময় শত্রুকে বিষ খাইয়ে মারতে চাইলেও নাকি বিষের সাথে কিছুটা মিষ্টি স্বাদের ব্যবস্থা করা হয়। শরীরকে তিলে তিলে যে ধূমপানের অভ্যাসে শেষ করে তারো বিজ্ঞাপনে কম আকর্ষণীয় কথা থাকে না।

আমার আজকের কথাটা পাড়তে গিয়ে একটু বেশী ভনিতা করে ফেললাম বোধ হয়। কয়েকদিন আগে প্রেসক্লাবের বাসষ্ট্যান্ডে নেমে টাইপিং এর দোকানগুলো থেকে সোজা পূর্ব দিকে হাঁটতে শুরু করেছি বাংলাদেশ পরিষদ ভবন পার হতেই হাতের বামে নির্মীয়মাণ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সুপারমার্কেট ভবনের নীচ তলায় একটি দোকানের নাম দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। 'হককানী পাবলিশার্স' নামটি বেশ জ্বল জ্বল করছে। দেখে মনটা খুব খুশী খুশী লাগলো। কেননা, এমন একটি অভিজাত এলাকায় ইসলামী বইয়ের পাবলিশার্সের দোকান। দিল তো খুশী হওয়ারই কথা।

কৌতুহলবশে দোকানের দিকে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে যা দেখলাম তাতে তো আক্কেল গুড়ুম। অন্য কোন দেশ বা সভ্যতার পাবলিশার্স হলেও তেমন অবাক হতাম না। কিন্তু যে কম্যুনিজম ধর্মকে আফিম মনে করে, তাদের স্বর্গরাজ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সকল ধর্মকে হটিয়ে দেবার জন্যে এহেন কাজ নেই যা সোভিয়েত ইউনিয়ন করেনি, সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিজমের প্রশংসা, তারই প্রকাশিত বই-পুস্তকে হককানী প্রকাশনীর দোকান ভর্তি। নামকাওয়াস্তে দুয়েক খানা ধর্মীয় বই দোকানে আছে বৈকি। তা বোধ হয় নামকরণকে জাষ্টিফাই করার জন্যেই।

অবাক হয়ে এসে এক প্রবীণ বন্ধুকে ঘটনাটির বর্ণনা দিলাম। তিনি আমার কথা শুনে হো হো করে একগাল হেঁসে উঠে বললেন, 'তোমার মত বোকা মানুষ দিয়ে আজকালকার যুগে কাজ হবে না বুঝলে' বলেই তিনি আমেরিকার সিআইএ আর রাশিয়ার কেজিবির নতুন ষ্ট্রাটেজীর কথা দীর্ঘক্ষণ বয়ান করলেন। তিনি যা বয়ান করলেন তার সারমর্ম পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

মহানবীর (সা) যামানার মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন ইহুদী ও নাছারাদের মধ্য থেকে কতেক চতুর ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিল যে, শুধু বিরোধিতা করে আর সুবিধা করা যাচ্ছে না। সুতরাং ইসলামের আবরণে বিরোধিতা করতে হবে। এর জন্যে সকালে ঈমান এনে বিকালে অথবা একদিন ঈমান এনে কয়েকদিন পর মুহাম্মদ (সা) এবং ইসলামের দুর্নাম করতে হবে অথবা ইসলামের একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে শোবা-সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। বলাবাহুল্য একাজ যে তারা করেছিল ইতিহাস তার সাক্ষী। কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়তো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু মানুষকে চিরন্তন সত্য থেকে বিরত করা সম্ভব হয়নি।

পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের বস্তুবাদ এবং তার উপর ভিত্তি করে ক্যাপিটালিজম ও কম্যুনিজম প্রথম থেকেই নাকে মুখে, হাতে পায়ে যাবতীয় ধর্মের বিরোধীতা করেছে। যতদিন তাদের কাল্পনিক স্বর্গের কথা কেতাবে ছিল ততদিন অনেকেই তাদের মিষ্টি মাখানো বিষবত হালুয়ার আসল হাকিকত বুঝতে পারেনি। কিন্তু এই বস্তু দু'টি বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাশ্চাত্য কি প্রাচ্যের মোহযুক্ত কোটি কোটি মানুষের অলীক স্বপ্ন ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। তারা অল্পদামে যা বিক্রি করেছে আর বেশী দামে যা ক্রয় করেছে তার জন্যে কিছু দিন পরই হায় আফসোস শুরু করে। ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানুষ ধর্মের দিকে আবার ঝুঁকে পড়তে পারে এ বিপদ প্রথমে আঁচ করতে পারে ক্যাপিটালিজমের গুরুরা। কমুনিস্টরা একদেশদর্শী হওয়ার কারণে তাদের বুঝতে সময় লেগেছে একটু বেশী। কিন্তু এখন মোটামুটি তারা উভয়েই একমত যে, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় পুনর্জাগরণের প্রবণতার যুগে ধর্মের বিরোধিতা করে আর বিশেষ সুবিধা হবে না। তাই ধর্মীয় সংগঠন, সমিতি ইত্যাদির মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে হবে এবং তাদের যাবতীয় পরিকল্পনা পূর্বেই জেনে নিতে হবে। এতেও যেখানে সুবিধা কম, সেখানে প্রয়োজনবোধে কিছু ধর্মীয় ব্যক্তিকে খরিদ করে একাধিক ধর্মীয় সংগঠন

গড়ে তুলতে হবে। ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর মাঝে খুঁটিনাটি বিরোধ নিয়ে অনৈক্য সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে বিভ্রান্ত করার জন্য ধুম্রজাল তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনবোধে ধর্মীয় পরিভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। ইসলাম একটি বিপ্লবী আন্দোলন হওয়ার কারণে সঙ্গত কারণেই তাদের দৃষ্টি ইসলাম এবং মুসলিমদের প্রতি সবচেয়ে বেশী নিবদ্ধ।

তাদের উপরোক্ত মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যাবে বর্তমানে খৃষ্টানদের রচিত বই পুস্তকে। সেখানে আল্লাহ, রসূল, সাহাবা, সুন্নাত, ফরজ, গোনাহ, বেহেশত, দোযখ, ইত্যাদি পরিভাষাগুলো অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা হয়েছে। খৃষ্টান মিশনারীদের সদ্য প্রকাশিত যে কোন বইতে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। ব্যাঙের ছাতার মত অসৎ চরিত্রের লোক দ্বারা যেখানে সেখানে ধর্মীয় সংগঠন গড়ার ব্যাপারটাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন, মস্কোর ধর্মীয় সম্মেলন, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দদের জন্য সফরের ব্যবস্থা, মাঝে মাঝে কিছু ধর্মীয় কাজে সাহায্য করা- এসব কর্মকান্ড আসলে ঐ চিন্তারই স্বাভাবিক ফল।

আন্তর্জাতিক এই চক্রান্তের গুরুদের ইঙ্গিতে তাদের শিষ্যরাও অনুরূপ আচরণ বিভিন্ন দেশে শুরু করেছেন। এজন্যে দুনিয়ার জন্য সমাজতন্ত্র, আখেরাতের জন্য ধর্ম, অথবা ধর্মকর্ম সমাজতন্ত্র তত্ত্ব প্রচার করা হচ্ছে। তাইতো দেখি সমাজতন্ত্রের অনেক প্রবক্তা জুমআর নামাজে হাজির হচ্ছেন, ঈদের জামায়াতে শামিল হচ্ছেন, মাঝে মাঝে ওয়াকতিয়া নামাজে উপস্থিত হচ্ছেন, বাসায় অথবা অফিসে মিলাদও পড়াচ্ছেন। যা করছেন তার চেয়ে বেশী প্রচার করছেন। উদ্দেশ্য ঐ একটা। সরল প্রাণ ধর্মভীরু মানুষকে আকৃষ্ট করা।

কিন্তু তাদের এই ধূর্তামি আজকালকার যুগে নিতান্তই অচল। একটা গল্প দিয়ে আজকের লেখার ইতি টানতে চাইছি। কাক নাকি কোন কিছু লুকিয়ে রাখার সময় চক্ষু বন্ধ করে রাখে। তার ধারণা সে যেমন অন্ধকার দেখলো, অন্যেরাও অন্ধকার দেখবে। ফলে তার জিনিসটি আর কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু আশে পাশের সকলেই যে অপলক নেত্রে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছে তা কাক বেচারা ধারণাও করতে পারেনি।

কুশিক্ষার চেয়ে অশিক্ষা ভাল

দৈনিক সংগ্রাম, ৩১ জুলাই, ১৯৮২

ছোট বেলা থেকে একটি প্রবাদ শুনে এসেছি। কুশিক্ষার চেয়ে অশিক্ষা ভাল। কথাটার গুরুত্ব তখন ততটা বুঝতে পারিনি। তাই শিক্ষার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতেই বেশী পছন্দ করতাম। তাছাড়া আমি যখন ষষ্ঠ কি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তখন আমার এক হিন্দু শিক্ষক তাঁর অশিক্ষিত প্রতিবেশীর আচরণে অস্থির হয়ে আমাদের সামনে মন্তব্য করেছিলেন, "অশিক্ষিত লোকদেরকে নিয়ে স্বর্গে বাস করার চাইতে শিক্ষিত লোক নিয়ে নরকে বাস করা উত্তম।"

সেদিন থেকে আমার হিন্দু শিক্ষকের নিকট থেকে শুনা আপ্তবাক্যটিকে অতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে আসছি আর নিজেকে শিক্ষিত লোকদের মধ্যের একজন মনে করে মাঝে মাঝে পুলক ও গৌরব দুই-ই অনুভব করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসার আগ পর্যন্ত আমার এ বিশ্বাস অত্যন্ত মজবুত ছিল। কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি একটু খোলার পর অথবা আমারই মত কিংবা অনেক উঁচুদরের শিক্ষিত লোকদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ঘটার কারণে আমার সেই ঈমানে ধীরে ধীরে ভাটা পড়তে শুরু করে। মরহুম শেখ মুজিবর সাহেব নাকি বক্তৃতার এক সময় দেশের সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্যে শিক্ষিত লোকদেরকেই দায়ী করেছিলেন। মরহুম জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাকি ব্যাপক তদন্তের পর তারা যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন, তাতে স্বয়ং জিয়াউর রহমানও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কেননা এত সব নামী দামী উচ্চ শিক্ষিত লোকদের একটা সিংহভাগ দুর্নীতির সাথে জড়িত যে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে

একদিকে যেমন বড় রকমের ধাক্কা সামলাতে হবে, তেমনি দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এক সময়ে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে কথিত বিদ্যাপীঠের মান মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হবে। নানা সাত পাঁচ চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে তিনি সাহস করেননি।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলরের কথাই ধরা যাক। তিনি বিদ্যায় ডবল ডক্টরেট ছিলেন। এমনকি নোবেল পুরস্কার নির্বাচনী কমিটির সদস্যও ছিলেন। অথচ ক্ষমতায় থাকাকালে তার মত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার করে নাকি সুস্থ পুত্রকে সিকবেডে পরীক্ষা দেয়া সুযোগসহ অর্থনৈতিক কিছু হেরফেরও করেছিলেন। তার জন্য শাস্তি হয়েছিল। আরেক ভাইস চ্যান্সেলর যিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব দাপটের সাথে কাজকর্ম পরিচালনা করে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মরহুম শেখ মুজিবের প্রশস্তি গেয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার এদিক সেদিক করাতেও তার গায়ে আঁচড় লাগেনি। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক থাকাকালে লক্ষ লক্ষ টাকা এদিক সেদিক করার ব্যাপারও নাকি তার বিরুদ্ধে ছিল। তার অপকর্ম আর দুর্নীতির জন্য তিনি জেলও খাটলেন। আরো একজন ডবল ডক্টরেট ভাইস চ্যান্সেলর যিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন যার দুর্নীতির ফিরিস্তি সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে অবশ্য তেমন কোন উচ্চবাচ্য আর শোনা যায়নি। এসব ব্যক্তির সবাইকে নাকি টেক্কা মেরেছেন রাজশাহী বিদ্যালয়ের বিগত ভাইস চ্যান্সেলর। তারই গুণধর সন্তান যে টেস্ট পরীক্ষায় এক বিষয়ে মাত্র শতকরা ৩০ এবং অন্য বিষয়ে মাত্র শতকরা ২৫ নম্বর পেয়ে বাপের আলৌকিক কেরামতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান করেছিল এবং ঐ একই কেরামতিতেই নাকি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার সৌভাগ্যও তার হয়েছিল। ব্যাপারটির বিরোধীতা করায় একজন মহিলা কর্মকর্তাকে শেষ পর্যন্ত বদলী হতে হয়েছিল। ঐ কেরামতিতেই নাকি জিওলজী বিভাগে পুত্ররত্ন উচ্চতর স্থান দখল করার সুযোগ পেয়েছে। ভুয়া নামে তিনি নাকি একটি ডাইনিং হলের কন্ট্রাক্টরকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকাও দিয়েছিলেন। পরে খোঁজ খবর নিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। অনেকেই ভাবছেন, সেই ভুয়া কন্ট্রাক্টর নাকি তিনি নিজেই। এমনকি হলের প্রভোস্ট থাকাকালে তিনি নাকি ডেকচি মেরামতেও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে বেশ কয়েক হাজার টাকা বেমালুম হজম করে ফেলেছেন। এগুলো আমাদের কোন মনগড়া কথা নয়। এ সমস্ত ব্যাপারে তদন্ত হয়েছে এবং সেই মোতাবেক বিচারও হচ্ছে। যে সমস্ত টার্ম অব রেফারেন্সে তদন্ত হয়েছে এবং বিচার হচ্ছে শুধু সেগুলোর কথাই বললাম। কিন্তু বিগত মার্চ মাসে ভিসির ষড়যন্ত্রের ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন বরণ উৎসব দেখতে এসে অন্য কলেজের তিনটি তরুণ তাজা প্রাণ দিনের আলোয় রাজশাহীর মতিহারের সবুজ চত্বর চাপ চাপ রক্তে ভিজিয়ে পিতা মাতার স্নেহময় কোল খালি করে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিল সেই মর্মবিদারক ঘটনাটা তদন্তের টার্ম অব রেফারেন্স থেকে কিভাবে বাদ পড়লো এটা সত্যি আশ্চর্যের

বিষয়। যে সমস্ত রাজনৈতিকমনা অধ্যাপকদের সাথে সাথে তিনিও দীর্ঘক্ষণ ধরে এই নৃশংস হত্যাকান্ড দোতলায় থেকে কলাপসিবল গেট বন্ধ করে জানালা দিয়ে অত্যন্ত আনন্দের সাথে উপভোগ করছিলেন তাদের ব্যাপারেও কোন তদন্ত আদৌ হচ্ছে কি না, হলে তা কোন পর্যায়ে এগুলো সম্পর্কেও আমাদের কোন ধারনা নেই।

আমাদের কথা শুধু এদের ব্যাপারেই নয়। কারণ এদের তো বিচার হয়েছে, কারো বা হচ্ছে, কারো বা হবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর নির্বাচনে যে পদ্ধতি আছে তাতে সিনেটের শিক্ষিত মাননীয় সদস্যরা কিভাবে এইসব দুর্নীতিপরায়ণ উচ্চ শিক্ষিত লোকদেরকে সচেতনভাবে ভোট দিয়ে শুধু ভাইস চ্যান্সেলরই বানাননি, দুর্নীতি দিনের আলোর মত সকলের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ার পরও তাদেরকে রক্ষা করার জন্য কোমর বেঁধে জেহাদে অংশগ্রহণ করার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এটাই ভাববার বিষয়। তাহলে দেশের লোকজন শিক্ষিত হলে আর ভোটের গণতন্ত্র চালু হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে ভাল ভাল লোক ক্ষমতায় বসবে এই আশা কি করে করা যায়? বরং অবস্থাদৃষ্টে তো মনে হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় শিক্ষিত লোকে দেশ ভরে গেলে বর্তমানের চাইতেও অধিক সংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ এমনকি বড় ধরনের ক্রিমিন্যালরাই ক্ষমতায় বসে যেতে পারে। কেননা বর্তমান বস্তুবাদী সেক্যুলার শিক্ষার সাথে দুর্নীতি আর ক্রাইম সরাসরি সম্পর্কযুক্ত বলে দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে। তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটু বেশী রাত হলে কেনই বা পথিকের গা ভয়ে ছমছম করে, কেনই বা রিক্সাচালকরা ভয়ে রিক্সা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেতে চায় না? কারো কোন আত্মীয়স্বজন পয়সা কড়ি নিয়ে কেন বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে আর উঠতে চায় না?

শিক্ষার সাথে নৈতিকতার যোগসূত্রের কথা আমরা তো অনেকবার বলেছি। শুধু আমরা নয় দেশের অধিকাংশ লোক, প্রবীণ শিক্ষাবিদ সমাজবিদ ইত্যাদি অনেকেই বলেছেন। কিন্তু সমাজ-রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করেন, তারা কথাটা গায়ে মাখেননি। অথবা তারা যে লুটপাট মার্কা আর পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার দেদার সুযোগওয়ালা সমাজে বিশ্বাস করেন সেই সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষাকে এমনটা করে রেখেছেন। তাহলে তো দেখছি পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদ ষ্ট্যানলি হলের কথাই সত্য। তিনিতো বহু আগেই বলেছিলেন, "If you teah your children the three 'R's, (Reading, Writing and Arithmetics) and leave the fourth 'R' (Religion); you will get a fifth 'R' (Rascality)." আজ মনে হচ্ছে, আমার প্রবীণ শিক্ষকের মন্তব্য "অশিক্ষিতের সাথে স্বর্গে বাস করার চাইতে শিক্ষিতের সাথে নরকে বাস করা উত্তম" কথাটি সত্যিই অচল। বরং "কুশিক্ষার চাইতে অশিক্ষা ভাল" এ আত্নবাক্যটিই আজ অন্তত: আমাদের সমাজের জন্য অনেক বেশী প্রযোজ্য।

টিপ কি আমাদের?

দৈনিক সংগ্রাম, ৯ নভেম্বর ১৯৮২

আমাদের যা কপাল তাতে কপাল নিয়েই আলোচনা করার কথা। কিন্তু এমনি কপাল যে, কপালের টিপ নিয়েই শেষ পর্যন্ত এই কলামে আলোচনা করতে বাধ্য হলাম। ব্যাপারটির শুরু খুবই ছোট একটা ঘটনা নিয়ে। কোন এক শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী তার স্কুলের নিয়মানুযায়ী আরেক শিক্ষয়িত্রীকে বারণ করেছেন কপালে টিপ পরে আসতে। কেননা, তাঁর মতে দেশের ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এটা হিন্দু সংস্কৃতির প্রতীক। অনেক স্কুলেই নির্দিষ্ট পোশাক বা ইউনিফরম আছে। এমনকি শিক্ষকদের জন্যেও নির্দিষ্ট পোশাকের নমুনা ঠিক করে দেয় অনেক স্কুলের কর্তৃপক্ষ। তার একটু এদিক সেদিক হলে অথবা অতিরিক্ত কিছু কেউ করলে ছাত্র-শিক্ষক সকলের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলতা ভঙ্গের অভিযোগ পর্যন্ত তোলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে লঘু পাপে গুরুদন্ডও পেতে হয় শৃংখলা ভঙ্গকারীকে। ক্যাডেট কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলগুলোতে এ নিয়ম অত্যন্ত কড়াকড়িভাবেই পালন করা হয়।

ব্যাপারটি সেভাবে চলে গেলে আমাদের বলার কিছু ছিল না। কিন্তু একটি দৈনিক এবং এক ধরনের সংস্কৃতিমনা লোকজন এই ব্যাপারটি নিয়ে এমন কান্ড বাঁধিয়েছেন যাতে আমরাও কিছু না বলে থাকতে পারি না। কেননা, এ নিয়ে তারা কথা তুলেছেন জাতীয় সংস্কৃতির, জাতীয় মূল্যবোধের এমনকি এই একটি ছোট ব্যাপারকে কেন্দ্র করে তারা জাতির সংজ্ঞা দেওয়ার মত পন্ডিতীও করেছেন কেউ কেউ। এমনকি উক্ত দৈনিকটি বিগত মাসের ২৪ তারিখে নিষিদ্ধ কপালের টিপ নামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সাধ্যমত মনের ঝাল মেটানোর চেষ্টাও করেছেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপর সরকার তথা তৎকালীন ক্ষমতাসীন পার্টির বিরোধী লোকজনকে শায়েস্তা করার জন্যে তাদের হাতে একখানা মোক্ষম হাতিয়ার ছিল। তাহলো বিরোধীকে হয় কম্যুনিষ্ট দলের সদস্য বলে চিহ্নিত করা, অথবা অতি সহজে

বলে দেয়া যে লোকটা হিন্দুস্তানের চর। বলা বাহুল্য, এই হাতিয়ার বেশি দিন কাজ করেনি। যত্রতত্র ঐ ভোঁতা হাতিয়ার ব্যবহার করে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়ার কারণে তারা জনসমক্ষে এতটা হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিলেন যে, খাঁটি কম্যুনিষ্ট এবং খাঁটি হিন্দুস্তানের চরদের বিরুদ্ধেও অস্ত্রটি আর কাজে লাগেনি। ১৯৭১ সালের পর থেকে ঐ রকম একটি হাতিয়ার তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের দোসররা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। যে কেউ ইসলামের কথা বলেছে, আমাদের ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির কথা বলেছে, ভারত কর্তৃক আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার কথা তুলেছে, সমাজতান্ত্রিক মতবাদের গোলামীর চিহ্ন বিশিষ্ট জোয়ালের বিরুদ্ধে টুশব্দটি উচ্চারণ করেছে, শিল্প-কারখানা থেকে ভিক্ষুকের কাথাবালিশ পর্যন্ত জাতীয়করণ করার অবৈজ্ঞানিক কর্মপন্থার বিরোধিতা করেছে-আর যায় কোথায়? অমনি তার গলায় রাজাকার, অথবা আলবদর অথবা পাকিস্তানের দালাল অথবা আইয়ুব-মোনেম চক্রের প্রতিক্রিয়াশীলদের এজেন্ট সাজিয়েছে। এ সবই করা হয়েছে প্রগতিশীলতা, সমাজতন্ত্র অথবা ধর্মনিরপেক্ষতার বর্ম দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ঠেকানোর নামে।

বলা বাহুল্য এই অস্ত্রও বেশি দিন কাজ করেনি, কাজ করতেও পারে না। কেননা নেতিবাচক বা প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা দীর্ঘদিন কাজ করতে পারে না। বাংলাদেশের জনগণ নানা শব্দের আড়ালে তাদের জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রকে ধরতে পেরেছিল। যার কারণেই সংঘটিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বরের পরিবর্তন। বিশ্বের অনেক নামকরা পত্রপত্রিকা তখনকার সরকার এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের স্বর্গচ্যুতির কারণ হিসেবে এ দেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে অহেতুক আঘাত করাকে অন্যতম কারণ বলেও উল্লেখ করেছিল। বাংলাদেশের নানা পট-পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা যে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর চাইতেও অনেক বেশি রকমভাবে জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়েছেন, যে ব্যাপারে তাদের এ চৈতন্যোদয় এখনও হয়নি। তাদের দেয়া ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের ট্যাবলেট যে এ দেশের মানুষ অত্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ যে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি, তার প্রমাণ মেলে জিয়াউর রহমানের জাতীয়তার সংজ্ঞা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে- হয়তো অন্ধ আক্রোশে এসব দিকে তাদের খেয়াল করার সময় হয়নি। অথচ এসব দিকে তাদের ভবিষ্যতের জন্যেই বোধহয় খেয়াল করা প্রয়োজন ছিল।

পত্রিকাটি যদিও পাঠকদের মুখ দিয়ে নিরপেক্ষ হওয়ার ক্যানভাস করেছে, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। জাতি, জাতীয়তা এবং সংস্কৃতির তার কাছে একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা এবং ধারণা আছে। এই ধারণার যারা অনুসারী শুধু তাদের কথাগুলোই ছাপানো হয়েছে।

কোন একটি ইস্যু জনসমক্ষে আসলে কমবেশী উভয় পক্ষেই বক্তব্য পেশ করার লোক থাকে। কিন্তু পত্রিকাটি অন্যপক্ষের বক্তব্যকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছে। নির্দিষ্ট কোন আদর্শের বা মতবাদের অনুসারী হওয়ায় দোষের কিছু নেই। বরং নিষ্ঠাবান আদর্শের অনুসারীরা শ্রদ্ধার পাত্র। সে আদর্শ সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য হোক কিনা হোক সেটা অন্য কথা। কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন করে অন্য কিছু সাজার চেষ্টা করা প্রতারণারই শামিল।

কপালে টিপ আমাদের দেশে একটি বিশেষ ধর্মালম্বীরাই দিয়ে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সিঁথির সিঁদুর একটি বিশেষ পরিভাষা। বিবাহিত মহিলারা এটাকে সধবার চিহ্ন মনে করে। যদি কোন হিন্দু মহিলাকে ঠাট্টা করেও বলা হয়, "আপনার কপালের টিপ আর হাতের শাখা ভাঙা কেন"? অমনি সে শুধু রাগান্বিতই নয়, বরং ঠাট্টাকারীর চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়বে। সিঁথির সিঁদুর নানাভাবে বিকৃত হয়ে হলুদ, নীল, সবুজ ইত্যাদি টিপে পরিণত হয়েছে। এরপর মুসলিম পরিবারের মেয়েরা এটার ব্যবহার খুব কমই করে থাকে। আজ থেকে পনের বিশ বছর আগে এটার প্রচলন মুসলিম পরিবারে আদৌ দেখা যেত না। ঐ বিশেষ দৈনিকটির চিঠিপত্রের কলামে যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে যারা মুসলিম বলে পরিচিত তারা তাদের মা অথবা দাদী নানীদের কাছে জিজ্ঞেস করে আমার কথার সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেন। সাংস্কৃতিক সাজগোজের এই ঐতিহ্য সম্পর্কে কথা বলতে গেলে বড় বড় বই-কেতাব পড়ার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। সমাজের হিন্দু মুসলিম সকলের বাস্তব আচরণ প্রত্যক্ষ করলেই চর্মচোখে তা দেখা যাবে। আজকাল যারা এটা ব্যবহার করেন তারা আমাদের সমাজের তথাকথিত প্রগতিবাদেরই অনুসারী। তাদের সংখ্যা শতকরা দুয়েকজনেরও কম। সুতরাং এই দুয়েকজনের মত নিয়ে জাতীয় কালচার বা সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তারা নিজেদের জন্য যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু নিজেদের বিকৃত চিন্তার ফসলকে সমগ্র জাতির সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বলে চাপিয়ে দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

পানি আর জল শব্দ দুটো যা বোঝায় তা নিঃসন্দেহে পানীয় কিন্তু শব্দ দু'টির ব্যবহারের কারণে একটি মুসলিম সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে অপরটি হিন্দু সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হয়ে গেছে, একথাকে অস্বীকার করবে? যারা কপালের টিপকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালীর কালচার বলে চালাতে চান তারাও নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে জলকে পানি আর পানিকে জল বলেন না। হয়তো কেউ বলতে পারেন শব্দ দুটির যেকোন একটি ব্যবহার করলেই চলে। শব্দের পার্থক্যে তরল জিনিস তো আর শক্ত হয় না। কিন্তু যে মনোভাবের কারণে অথবা জাতীয় চেতনার গরজে পাশাপাশি সুধীর বাবু আর আবদুল্লাহ সাহেব জলকে পানি আর পানিকে জল বলতে পারলেন না সেই মনোভাবকে সাংস্কৃতিক চেতনা থেকে বাদ দেওয়ার সাধ্য অন্ততঃ আমার নেই। এ চেষ্টা করতে যাওয়াটাও অপচেষ্টা বাস্তবতার অস্বীকৃতি।

কথা উঠছে ভারতবর্ষের বাঙ্গালী হিন্দু ছাড়া অন্য হিন্দুরা কেউ টিপ পরে না। এটাই টিপের পক্ষে বাঙ্গালী কালচার হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ লোকের জীবনধারা দিয়েই বাংলাদেশের কালচারকে বিচার করতে হবে। এখানে Common set of cultural values এর দিক থেকে অনেক কিছুতে হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ খৃষ্টানদের মধ্যে মিল আছে। বসন্তের মৃদুমন্দ সমীরণ আর জ্যোৎস্না পুলকিত রজনী শুধু একজন মুসলিমের মনেই নয়, হিন্দুর মনেও পুলক জাগায়। কিন্তু এর মধ্যেও One set of cultural values বা আদর্শিক দৃষ্টিকোণের ছোঁয়াচ পাওয়া যাবে। সন্ধ্যা বেলার ভাটির হাওয়ায় এক ধর্মপ্রাণ মুসলিম মানসকে বাতাসের ঢেউয়ের সাথে সাথে কাবার পথে নিয়ে যাওয়ার কারণেই সে গান ধরে, "পুবাল হাওয়া- পশ্চিমে

যাও কাবার পথে বইয়া"- আর একজন হিন্দুর মনকে ধাবিত করে গয়াকাশী অথবা বৃন্দাবনের দিকে। এখান থেকে কাবার যাত্রীকে জোর করে বাড়ীর কাছে বলে গয়াকাশী অথবা বৃন্দাবন নিতে চাইলে অথবা গয়াকাশীর যাত্রীকে কাবার পথে হাঁকিয়ে নিতে চাইলেই গোলমাল বাঁধবে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই গোলমাল আর হট্টগোল বাধিয়ে ভারতের পরিবেশ আজও শান্ত হয়নি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা আর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ক্যাপসুল ভারতকে রক্ষা করতে পারেনি।

এক ধরনের হীনমন্যতা আমাদের তথাকথিত প্রগতিবাদীদের পেয়ে বসেছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলাটা আধুনিকতা প্রমাণের অন্যতম যুক্তি হিসেবে এসব প্রগতিবাদীরা ব্যবহার করে থাকে। এক সময়ে পশ্চিমের বাতাস আমাদের আদর্শচ্যুত লোকদেরকে আকুল করে ছিল। এরপর আসলো পুবের হাওয়া। সে হাওয়াও এখন কিছুটা নিস্তেজ। এরপরও আমাদের দৈন্য প্রগতিবাদীরা সোচ্চার। কেননা, আমাদের এখানে হাওয়াটা লেগেছে পরে। এজন্যই বোধ হয় প্রমথ চৌধুরী আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "পাশ্চাত্যে যে মতবাদ মরে যায় তাই নাকি ভূত হয়ে আমাদের বুদ্ধিমান লোকদের ঘাড়ে চাপে।"

যা হোক এসব দেখে-শুনেও আলোচিত স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী টিপের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে একটা ভুল করেছেন। তিনি যদি এটাকে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের কালচার বলে উল্লেখ না করে বলতেন, কপালের টিপ প্রগতিশীল জগতে অচল, সর্বহারার সমাজ গঠনে প্রতিবন্ধক, বুর্জোয়াদের প্রতিচ্ছবি, ধর্মীয় শোষণের প্রতীক। তাহলে ঐ বিশেষ পত্রিকাটি এবং তাদের প্রগতিশীল মহলটি ঐ প্রধান শিক্ষিকার পক্ষে জান কোরবান করতে রাজী হয়ে যেতো- একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। আমার নিজের জীবনেই এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। আমি তখন শহীদুল্লাহ হলের ছাত্র। একটা পোষ্টারে আমার এক বন্ধুকে দিয়ে লিখিয়ে দিলাম যেমন খুশী চলবেন না। মুক্ত বুদ্ধির দোহাই পুঁজিবাদের অন্যতম হাতিয়ার। অমনি দেখলাম আমাদের সমাজতন্ত্রী আর প্রগতিশীল বন্ধুরা পোষ্টারটির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। মাস চারেক পর ঐ কথাটিই পোষ্টারে একটু ঘুরিয়ে "ইসলামে নিষেধ" বলে উল্লেখ করাতে সেই ব্যক্তিরাই ক্ষিপ্ত হয়ে পোষ্টারটি ছিঁড়ে ফেললেন। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ এবং লক্ষ্যহীন শিক্ষা আর দুর্নীতিপরায়ণ সমাজে ইসলাম আর মুসলিম শব্দটিতে আতংকগ্রস্ত একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। এরা এই শব্দ দুটির বিরোধীতা যে কোন মূল্যে করবেই।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা আরেকটা ভুল করেছেন। তাহলো অন্য সংস্কৃতি ঠেকাতে গেলে নিজের জীবনে নিজের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বাস্তবায়ন প্রয়োজন। নিজের চালচলন আর দৈনন্দিন আচরণে ইউরোপ থেকে আমদানি করা কালচারে ভেসে গিয়ে আরেকটি বিজাতীয় কালচার ঠেকানোর চেষ্টা করা বৃথা। কেননা "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও" কথাটি শুধু প্রবাদ নয় চিরন্তন সত্য। আদর্শের ক্ষেত্রে খন্ডিতকরণ ভাল ফল দেয় না। গ্রহণ করতে হলে পুরোটাই, ত্যাগ করতে হলেও পুরোটাই।

কাজীর গরু কেতাবে গোয়ালে নেই

দৈনিক সংগ্রাম, ৩০ নভেম্বর, ১৯৮২

ছোটবেলা থেকে একটি প্রবাদের সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। প্রবাদটি হলো 'কাজীর গরু কেতাবে আছে, কিন্তু গোয়ালে নেই।' প্রবাদটি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে প্রতিটি এলাকায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ থেকেই বুঝা যায় প্রবাদটির যথার্থতা এবং বাস্তবতা। কোন জমিদারের কোন কাজী অথবা কোন সেরেস্তাদার এলাকার গুরুগুলোর হিসাব কেতাবে অথবা পাকা খাতায় লিখে রেখেছিল, আর তদন্তে তার চেয়ে কম পাওয়া গেছে তার ইতিহাস অবশ্য আমার জানা নেই। তবে বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় অনেকবারই যে মৃত ব্যক্তি ভোটার হয়েছে একথা তো অনেকেরই জানা। মৃত ব্যক্তির নামে সই জাল করে কতজনে কত সম্পত্তি যে এহাত-ওহাত করে নিয়েছেন, বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর এমন কাজ কারবার যে কত সংখ্যায় হয়েছে তার হিসেব দেওয়াও বোধ হয় কঠিন।

আজকের আলোচনা প্রাচীন কালের সম্রাটদের কাজী বা সেরেস্তাদার নিয়ে নয় একেবারে নগদ টাকা নিয়ে, তাও আবার একটা দু'টা নয় অনেক। তবে এই স্বল্প পরিসরে অনেক থেকে খুব কমই উল্লেখ করতে পারব। বাংলাদেশ সচিবালয়ে একটি পিবিএক্স আছে। নম্বরটি ৩৫১১১। পত্রপত্রিকায় চাকুরী করার কারণেই অনেক সময় ফোন করতে হয়। তাছাড়া ছাত্রজীবনের অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন যারা এখন বেশ উঁচু দরের চাকুরী বাকুরী করেন। তাদের কাছে এক আধবার গরীব এই সাংবাদিককে ধর্ণাও দিতে হয় মাঝে মধ্যে। কিন্তু বিধিবাম হলে যা হয় তাই। একদিন তিন-চারবার ঘুরিয়ে কোনক্রমে নম্বরটা পেলাম। রিং হচ্ছে, কিন্তু কেউ ধরছে না। ১৪/১৫ বার রিং হওয়ার পর রেখে দিলাম। সন্ধ্যার পর বন্ধুটির সাথে দেখা হলে নম্বরটি খারাপ কিনা

জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, কমপক্ষে ২০/২৫ বার রিং না হলে কেউ ধরেন না। কাজেই আরেকটু ধৈর্য ধরলেই নাকি পেতাম। পরের দিন যথারীতি টেস্ট করার জন্য ফোন করে ৩৩ বারের মাথায় ওপাশ থেকে একজন মহিলার কণ্ঠ ভেসে আসলো। বাঞ্ছিত নম্বর চাইলে তিনি দয়া করে দিলেন। ভদ্রলোককে পেয়েও গেলাম। চার-পাঁচদিন পর আবার রিং করে পেলাম ৪১ বারের মাথায়। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম উনারা নাকি প্রায়ই সিটে থাকেন না।

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য বিভাগ নামে একটি বিভাগ আছে। মাছ চাষের জন্য তাদের বক্তৃতা বিজ্ঞপ্তি দেখলে মনে হয় বাংলাদেশে মাছের ঘাটতিতে তাদের উদ্বেগের অন্ত নেই। এজন্য তারা রাতের আরামকে পর্যন্ত হারাম করেছেন। তাছাড়া জনগণকে সমস্ত উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করার দিক থেকেই তারাই নাকি সবচেয়ে অগ্রে অবস্থান করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কি হচ্ছে তাতো সকলেই দেখছি। এই তো আমাদের সংগ্রামের ভাড়া বাড়ীর সাথেই একটি বড় ধরনের লেক আছে। এর মালিক নাকি বাংলাদেশ রেলওয়ে। এখানে মাছের চাষ করলে বছরে কয়েক লাখ টাকার মাছ উৎপাদন হতে পারে। কিন্তু নামমাত্র একটি সমবায় সমিতির সাইনবোর্ড আছে। কয়েক মাস আগে দেখতাম ঐ সাইনবোর্ডওয়ালা ঘরখানায় কয়েকজন লোক বসে তাস পেটাচ্ছে। এখন তাদেরকেও আর দেখা যায় না। জানি না, মৎস্য বিভাগের খাতায় এখানে প্রতি বৎসর কত লাখ টাকার মাছ উৎপন্ন হয়। তবে বাস্তবে গত দু'বছরে মাছ ধরার মত দুর্ঘটনা অন্তত: আমাদের চোখে পড়েনি। জাতীয় প্রেসক্লাবের দক্ষিণ পার্শ্বের সচিবালয়ের পশ্চিমেও একটি মজাপুকুর আছে। এখানে এমন পরিমাণ ময়লা জমে আছে যে, পুকুরটি আশেপাশের কমপক্ষে হাজার পঞ্চাশেক লোকের ঘুম নষ্ট করার জন্য মশা উৎপাদন করার যোগ্যতা রাখে। বড় কর্তারা আব্দুল গণি রোর্ড দিয়ে অথবা তোপখানা রোড দিয়ে যাতায়াত করেন। সুতরাং তা চোখে পড়ে না। সরকারী বড় কর্মকর্তাদের এত কাছে যখন আছে, তখন খাতা-কলমে অন্য পুকুরের চেয়ে এতে দুই তিনগুণ বেশী মৎস্য উৎপাদন হওয়ারই কথা। কিন্তু বাস্তবে অন্য কেউ না দেখুক, অন্ততঃ সাংবাদিকদের চোখে কয়েক লক্ষ তো দূরের কথা কয়েকশ' টাকার মাছ ধরার মত ঘটনা পড়েনি।

বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় গেজেটেড অফিসারের স্ট্যাটাস নিয়ে একজন করে পশু ডাক্তার আছেন। অধিকাংশ থানায় অফিসটি দালানেই অবস্থিত। সাথে কোন কোন জায়গায় একটি হাস-মুরগীর খামারও আছে। বিশ্বাস না হয় আমাদের বড় সাহেবদের কেউ ছদ্মবেশে একবার গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে নিজের একটা গরু-ছাগল নিয়ে পশু ডাক্তারের অফিসে চিকিৎসার জন্য যেয়ে দেখুন। ইঞ্জেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ থাকলেও ওষুধ নেই, ওষুধ থাকলে ডাক্তার সাহেবের সাক্ষাৎ পাওয়া রীতিমত ভাগ্যের ব্যাপার। হাস-মুরগীর খামারের হিসাবের খাতায় বহু হাস-মুরগী থাকলেও বাস্তবে কয়টি আছে, দুই হিসাবের গরমিল কতটা তাও আল্লাহ মালুম।

গত বাজেটেই সময় অর্থমন্ত্রী বোধ হয় একবুক আশা নিয়েই নভেম্বর পর্যন্ত অবস্থা ভাল হওয়ার কথা বলেছিলেন। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এসব কথা বলেছিলেন। কিন্তু অবস্থা কতটা ভাল হয়েছে সে ব্যাপারে আমরা সকলেই ভুক্তভোগী। সরকারী কর্মচারীদের শতকরা বিশ থেকে ত্রিশ ভাগ মহার্ঘ ভাতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদেরকে দেয়া হয়েছে শতকরা দশ ভাগ। অথচ দেশে সরকারী কর্মচারী আর শ্রমজীবীদের জন্য কোন ভিন্ন ভিন্ন হাট বাজার নেই। সাংবাদিকদেরকে তো আজ পর্যন্ত কিছুই দেয়া হয়নি। সরকারী কাগজে-কলমে অথবা বক্তৃতা-বিবৃতিতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, খাদ্যোৎপাদন, শিল্প কারখানা সবকিছুই নাকি ঠিক হয়ে গেছে। অনেক কাট-ছাঁট করে যে কৃচ্ছতা সাধনমূলক বাজেট করা হয়েছে সে সম্পর্কে খোঁজ নিলে দেখা যাবে শতকরা কত ভাগ টাকা রিলিজ হয়েছে। বছরের পাঁচ মাস চলে যাচ্ছে। জানা যায়, যত পরিমাণ টাকা রিলিজ হওয়ার কথা ছিল তার অর্ধেকও নাকি হয়নি। ভালভাবে খোঁজ নিলে হয়তো আসল অবস্থা জানা যাবে। অন্যদিকে মন্দা আর মুদ্রাস্ফীতির দুই রোগই আমাদের অর্থনীতিকে পেয়ে বসেছে। এসব ক্ষেত্রের গরুগুলোর সংখ্যাও কেতাবে যা আছে গোয়ালে তার চেয়ে অনেক কম।

বিগত ৭ নভেম্বর ৪৫টি আপগ্রেডেড থানা উদ্বোধন করা হোল। ধূমধামও মোটামুটি কম হয়নি। উদ্দেশ্য প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। উদ্দেশ্যটি মহৎ নি:সন্দেহে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির জন্য থানাগুলোতে যে আইন-আদালতের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হচ্ছে সেটাই আমাদের ভাবনার বিষয়। জেলা এবং মহকুমা আদালতগুলোতেই সত্তরের অধিক মুন্সেফের পদ নাকি খালি ছিল। জেলা আদালতগুলোতে নিষ্পত্তির আশায় কয়েক লক্ষ মামলা ঝুলে আছে। এখন আবার থানা পর্যন্ত আদালতের ব্যাপারে জনগণকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা আছে, সেগুলো বাস্তবে অর্থাৎ গোয়ালে আসতে বেশী রকম দেরী হলে এখানেও কি সেই প্রবাদটি প্রবাদটিই সত্য বলে ধরে নিতে হবে যে, "কাজীর গরু কেতাবে আছে, কিন্তু গোয়ালে নেই?"

কালচার নিয়ে আমাদের কান্ড-কারখানা

দৈনিক সংগ্রাম, ২২ মার্চ, ১৯৮৩

বেশ কিছুদিন আগের কথা। দিনক্ষণ তারিখ যার কিছুই মনে নেই ঠিকমত। ভারতে চিত্রতারকাদের একটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দর্শকদের সৌভাগ্য যে, এতে চিত্র নায়িকারাও অংশগ্রহণ করেছিল সমভাবে। আর যায় কোথায়। দর্শকের ভিড় হোল প্রচন্ড। পুলিশকে লাঠি মারতে হয়েছে বহুবার। আহত হয়েছিল কয়েকশ লোক। টিকিট বিক্রি করে বহু টাকা কামাই করার সুযোগ পেয়েছিলেন আয়োজনকারীরা। কয়েকদিন পর ভারতের প্রেসিডেন্টসহ মন্ত্রীদের আবার একটি প্রদর্শনী ম্যাচের ব্যবস্থা করা হোল। আয়োজনকারীদের আশা ছিল এবারেও ভালই জমবে। কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি। পূর্বের ম্যাচের তুলনায় একতৃতীয়াংশ টিকিটও বিক্রি হোল না। ব্যাপারটি ভারতের তৎকালীন প্রেসিডেন্টের কানে গেলে সাংবাদিকদের কাছে তিনি সহাস্যে মন্তব্য করেছিলেন, ভারতের মন্ত্রী মিনিস্টারদের জনপ্রিয়তা চিত্রতারকাদের জনপ্রিয়তার শতকরা তেত্রিশ ভাগ।

ঢাকার শাহীন স্কুলে চিত্র নায়ক নায়িকাদের মীনাবাজার বসেছিল সম্প্রতি। বিভিন্ন জনে বিভিন্ন দোকান সাজিয়ে বসেছিলেন। কেউ বা পান, কেউ বা সিগারেট, কেউ বা ফান্টা-কোকা-কোলা, কেউ বা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির। দর্শকদের ভিড় কেমন ছিল তা পত্র-পত্রিকার রিপোর্টেই জানা গেছে। প্রবেশ মূল্য প্রথম দিন ছিল দশ টাকা। ভিড় দেখে আয়োজনকারীরা দশ টাকার টিকিট বিশ টাকায় উঠিয়ে দিল। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? টিকিটখানা কিনে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে দর্শকরা যার যার প্রিয় তারকাদের কাছে ভিড় জমায়। দশ বিশ পয়সার পান পাঁচ-দশ টাকায় বিক্রি হয়, চার পাঁচ টাকার ফান্টা বিশ-পঁচিশ টাকায়ও ক্রেতাদের অসুবিধা নেই। কিন্তু চিত্রনায়ক নায়িকাদের হাতে পাওয়ার সুযোগ না থাকলে সে দোকানের সামনে ভিড় জমলেও বিক্রি হয় খুব কম। কিন্তু দর্শকদের ভিড় আর হট্টগোল এতটা বেশী হয়ে উঠেছিল যে, শেষ পর্যন্ত পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। অবশেষে আয়োজনকারীরাও বেগতিক দেখে মীনাবাজার স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পত্নী বেগম

রওশন এরশাদ উক্ত মীনাবাজার উদ্বোধন করেছিলেন।

ঘটনার বর্ণনাটা যতটা সহজে দিলাম আর দর্শকরা যতটা উপভোগের মানসিকতা নিয়ে মীনাবাজারে উপস্থিত হয়েছিলেন, আমি দুঃখিত যে এখনকার কথাগুলো আর ততটা উপভোগ্য হবে না। আমাদের দেশে হাউজি আর শিল্প মেলায়ও এ রেওয়াজ চালু আছে যে, কোন সরকারী কর্মকর্তার স্ত্রী পর্যন্ত দোকান সাজিয়ে বসেন। বড়কর্তার বেগম সাহেবার হাতের চায়ের আবার দাম বেশ বেশী। কমপক্ষে সাধারণ চায়ের পাঁচ গুণ বেশী তো হবেই। কিন্তু যারা দোকান সাজান অথবা ক্রেতা তারা কি একবার ভেবে দেখেছেন যে, ক্রেতারা এত বেশী দামে কেন কিনতে আগ্রহী। আচ্ছা, কেনাকাটায় না হয় কিছু বেশী পয়সাই ছিল, কিন্তু দোকানের সামনে হা করে তাকিয়ে থেকে ভীড় জমায় কেন? যদি বলা হয়, যাদেরকে সচরাচর দেখা যায় না, তারা দোকান দিলে ভীড়তো হবেই। তাহলে মন্ত্রী, সরকারী বড় অফিসার এদের সকলেই একবার দোকান দিয়ে অথবা মেলা বসিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, কতজন টিকিট কাটে অথবা অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে মেলায় আসে আর জিনিসপত্র কেনাকাটা করে। যে সমস্ত মহিলা এমনি ধরনের দোকানপাট সাজিয়ে বসেন তারাও একবার অর্ধনগ্ন অথবা প্রগতিশীল (?) পোশাকপত্র না পরে সেজেগুঁজে কামনার বস্তু না সেজে দোকান বসিয়ে দেখতে পারেন যে, শতকরা কতভাগ ক্রেতা এমনি ধরনের ভীড় জমায়?

তাহলে একটা ভিন্ন প্রশ্ন করতে হয়। দশ পয়সার পান পাঁচ টাকায় ক্রেতারা কিনে কেন? দশ-বিশ পয়সা তো পানের দাম, বাকী পয়সাটা কিসের? চার পাঁচ টাকা তো ফান্টার দাম কিন্তু বাকী পনের বিশ টাকা কিসের বদলে? জিনিসপত্র কেনার সময়তো স্বাভাবিকভাবে আলাপ পরিচয়ের পালা শেষ। কিন্তু এরপর হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে দর্শকরা ভীড় জমায় কেন? আর পুলিশকেই বা শেষ পর্যন্ত লাঠিপেটা করে চিত্র নায়িকাদের নিয়ে পালাতে হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তরটা ভাষায় প্রকাশ না করলেও আয়োজনকারী দোকানপাটের মালিক আর ক্রেতা সাধারণ সকলেই জানেন। যে অন্তর্নিহিত মানসিকতার কারণে এমনটি ঘটে, আয়োজনকারী অথবা ক্রেতাদের অনেকের স্ত্রী, মাতা অথবা কন্যাকে ঐ মানসিকতার শিকার হতে দিবেন কি? বিলেতী মণীষী ই,এস,মোমার্স আধুনিক নাচের সমালোচনায় বলেছিলেন, "এ যেন বর্বরতার দিকেই অধঃপতন। এ এক মায়াবী ইন্দ্রজাল।" তিনি প্রশ্ন করেন, "ব্যাপারটা যদি এত ভাল সাংস্কৃতিক তৎপরতাই হয়ে থাকে তাহলে এমন নাচ মা আর ছেলে নাচে না কেন? পিতা আর কন্যায় এমন জুটি বাধে না কেন? অথবা ভাই আর বোনেই বা এমন নাচে অংশ গ্রহণ করে না কেন? এর গোপন উদ্দেশ্য শুভ নয়। এর গোপন তত্ত্ব আপনাদেরকে আমি বলতে পারি।এ হচ্ছে পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার এক সুচতুর অপকৌশল।"

কথাটা কঠোর হলেও সত্য যে বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদী সভ্যতায় লাম্পট্য আর বদমায়েশী জায়গা পেয়েছে সংস্কৃতির অংগনে। উপরের তলার এক শ্রেণীর তথাকথিত ভদ্র লোকেরা তাদের মানসিক বিকারের খোরাক যোগাতে গোটা সমাজকে বিকারগ্রস্ত করতে চায়। কেননা তাদের বিকারগ্রস্ত মানসিক চাহিদা সুসভ্য এবং স্বাভাবিক সমাজ ব্যবস্থায় মেটানো সম্ভব নয়। এই কারনেই পাশ্চাত্য সভ্যতা শত শত ক্লাব আর নাচ ঘরের জন্ম

দিয়েছে। ব্যাপারটার আসল হাকিকতকে ঢাকা দেওয়ার জন্য একে শিল্প, সংস্কৃতি, কালচার, কৃষ্টি, আর্ট ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ জন্যেই আমরা দেখি পুরুষ শিল্পীর তুলিতে অন্যান্য অনেক জিনিসের তুলনায় নগ্ন নারীমূর্তি বেশী জায়গা দখল করেছে। সিনেমা জগত প্রথমে শুধু অভিনয় দ্বারা শুরু হলেও আস্তে আস্তে সেখানে নগ্নতা আর লাম্পট্যই অধিকাংশ জায়গা দখল করে নিয়েছে। মানুষের সুকুমার বৃত্তির লালন আর বিকাশের পরিবর্তে গোপন ইন্দ্রিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে লাম্পট্যের দিকে অগ্রসর করার জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অধিকাংশই নিয়োজিত।

কিন্তু আমাদের সমাজে এসব জিনিসের আমদানির হেতু বোধগম্য নয়। পাশ্চাত্যের সমাজ যেখানে এই অপসংস্কৃতি আর অপকালচারের তৎপরতায় ধ্বংসোন্মুখ, যেখানে সমাজ সচেতনদের আর্ত-চিৎকার একটু কান পাতলেই শোনা যায়, যেখানে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপিকার মন্তব্য অনুসারে একজন মেয়ে লোক পাশ্চাত্য সভ্যতায় কুকুরের চাইতেও কম মর্যাদার অধিকারী, মানুষের চাইতে আর্ট আর কৃষ্টির দোহাইতে মূর্তির দাম যেখানে অনেক বেশী, সেই অমানবিক সভ্যতার কাছ থেকে বস্তাপচা কালচার আমদানি করে আমাদের কি লাভ? আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে কোথায় নিয়ে যেতে চাই? আমরা চূড়ান্ত ধ্বংস জেনেও কি শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায়ই এ পথে অগ্রসর হব?

আমাদের মন্ত্রী মিনিষ্টারদের অনেকেই ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে সমাজ গড়ার কথা বলছেন। ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার কথা তো সরকারী কর্মকর্তাদের অনেকে শ্লোগানের মতই ব্যবহার করছেন। বিভিন্ন জায়গায় পীরসাহেবদের ওরস আর সীরাত সম্মেলনে যোগদান করেও একই কথার পুনরাবৃত্তি করছেন। যদিও নামকরা দু'একজন পীর ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে ইসলামী রাষ্ট্র হলে নাকি জাতির মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হবে। অর্থাৎ আল্লাহর আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র চললে মানুষে মানুষে ঐক্য বিনষ্ট হবে। তারা কি তাহলে এটা বুঝতে চান যে, মানবজাতির ঐক্য রক্ষায় আল্লাহ এবং তার আইন ব্যর্থ (নাউজুবিল্লাহ)?

অন্যদিকে মীনাবাজার আর শিল্পমেলার নামে অশ্লীল নাচ-গান আর হাউজি জুয়ার প্রসার হচ্ছে দিন দিন। নগ্নতার দিকে আহ্বান দিয়ে যাচ্ছে টিভি আর সিনেমা। এতেও পরান ভরে না বলে মদ আর আন্তর্জাতিক মানের বিনোদনমূলক হোটেল স্থাপিত হচ্ছে। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় নাইট ইন জঙ্গল আর হ্যালোইনের উৎসব। জনগণকে গালভরা বুলি দিয়ে খুশি রেখে ভেতরে ভেতরে সমাজকে নৈতিকতা আর মূল্যবোধের দিক থেকে এভাবে নি:শেষ করার ব্যবস্থা হচ্ছে কোন উদ্দেশ্যে? যে দেশের মানুষ পুষ্টিহীনতায় আর চিকিৎসার অভাবে মারা যায় হাজারে হাজারে, সে দেশে ঐসব কালচারাল লাম্পট্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোন মানবিক বিবেচনায়? এর পাশাপাশি ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলা কি বেমানান নয়? নয়কি এটা অনেকটা বাইরে প্রচার পত্তন আর ভেতরে ছুচোর কীর্তন- এর মত?

আকাশের দিকে থুথু ফেললে নিজের মুখেই এসে পড়ে

দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ এপ্রিল, ১৯৮৩

আমরা অনেকেই কি বলি তা বুঝি না। অনেক সময় ভাষা এবং ব্যাকরণ না জানার কারণে কোন সর্বনামে ক্রিয়া পদের সাথে কোন অতিরিক্ত অক্ষর বসাতে হয় তাও হিসাব করি না। এ জন্যেই সে-র সাথে তিনির ক্রিয়াপদ অথবা তার উল্টাও বসাই। এমনকি অনেক সময় শব্দের অর্থও বুঝি না। গ্রামের কোন একজন সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনি আমার ছোট ভাইয়ের বিয়েতে আসলেন না কেন?" তিনি বললেন, আমার ছেলের বিয়েতে আপনারা আসেন নাই, সেই "অনুরাগে" আমি যাই নাই। এমনিভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা অনেক সময়ই অনেক মুখস্ত কথা বলে ফেলি যার অর্থ নিজের দল মতের বিরুদ্ধেও চলে যায় অনেক সময়।

পাকিস্তান আমলের শেষের দিকের কথা। ভুট্টো সাহেব তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে এসে সপ্তাহ খানেক ধরে ইন্টারকনে আছেন। সাংবাদিকরা অনেকেই ভীড় করেছেন তাঁর কামরায়। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে নানা জনে নানা প্রশ্ন করেছেন। তিনি চট চট করে প্রতিটি প্রশ্নোত্তর দিচ্ছেন। এর মধ্যে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, "আপনার দলের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নাকি অনেকে গ্রহণ করতে চায় না।" তিনি একটু রেগে গিয়ে বললেন, "যারা ইন্টারকনে থাকে, আর গাড়ী হাকায় তারাই আমার সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলে।" অথচ ভাবলেন না যে, তিনি ইন্টারকনেই বসে আছেন।

বিগত ৯ মার্চ স্থানীয় একটি হোটেলে একটি রাজনৈতিক জোটের সভা হোল। নানা

বক্তা নানাভাবে গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন, পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক তৎপরতা, সামরিক শাসন প্রত্যাহার, জেলজুলুমের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করেন। অনেকেই ৭২ সালের সংবিধানকে পুনরায় বহাল করার দাবী করেন। তা খুবই স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক দেশে সীমিত অথবা বৃহত্তর সুযোগে এসব দাবী করা যুক্তিসঙ্গতও বটে। ঠিক তেমনি জামায়াতে ইসলামী, বিএনপিসহ আরো অনেকে সামরিক শাসন জারির সময়ে যে সংবিধানকে স্থগিত করা হয়েছে, তা বহাল করেই আগামী শীতে নির্বাচন দাবী করেছেন। বলাবাহুল্য, তাদেরও যুক্তি আছে। সবচেয়ে বড় যুক্তি হোল কেউ '৭২ সালের সংবিধান চাইলে অন্যকে' ৮২ সালের মুলতবী সংবিধান চাওয়ার অধিকারও দিতে হবে। তেমনি যিনি বা যারা '৮২ সালের মুলতবী সংবিধানের দাবী করেন তাদেরকেও ৭২ সালের সংবিধানের দাবী করার অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। মনে হয়,আমাদের বিজ্ঞ রাজনীতিবিদগণের অধিকাংশই এ ব্যাপারে সজাগ আছেন। মনে হয়, বহু ঘাটের পানি খাওয়ার পর আমরা অন্ততঃ এ শিক্ষাটা নিয়েছি যে, গণতান্ত্রিক অধিকার পেতে হলে অপরকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে।

কিন্তু ঐ রাজনৈতিক জোটের শামিল আমাদের জনৈক বিজ্ঞ অধ্যাপক রাজনীতিকের ভাষায় গণতান্ত্রিক মনোভাবের সুর যেন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তিনি তার পুরানো অভ্যাসবশতঃ বহু ভাল কথা আর স্যাটায়ারের মধ্যে দু'য়েকটি এমন কথা বলেছেন যাতে গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের মত নিরীহ লোকদের চিন্তিত না হয়ে উপায় নেই। তাঁর ভাষায় যারা '৭২ সালের সংবিধানের সংশোধনীসহ বর্তমান মুলতবী সংবিধান দাবী করেন তারা সবাই রাজাকার। তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে, যারা বিভিন্ন সময়ে উক্ত সংবিধানে সংশোধনী এনেছেন তারা তো রাজাকারদের নেতা বা লীডার।

তাহলে ঐ বিজ্ঞ রাজনীতিকের কাছে সঙ্গতভাবেই বিনম্রভাবে কয়েকটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে। মরহুম শেখ মুজিবর রহমান সাহেব যে পার্লামেন্টে '৭২ সালের সংবিধান পরিবর্তন করে একদলীয় বাকশাল কায়েমের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে নিলেন তাহলে তিনিও রাজাকার ছিলেন। যে সমস্ত সংসদ সদস্য তখন কোন প্রতিবাদ না করে মহা আহলাদে জনগণকে জিম্মি করার কাজে সহযোগিতা করলেন তারাও কি রাজাকার ছিলেন? যারা তৎসময়ের পূর্ব পর্যন্ত ভিন্ন দলে থাকলেও বাকশাল কায়েমের পর সমাজতন্ত্রিক প্রশাসন কাঠামো কায়েম হওয়ার আহলাদে আটখানা হয়ে পড়িমরি করে বাকশালে যোগদান করলেন তারা কোন ফাঁক দিয়ে রাজাকারদের দলের বাইরে যাবেন? এসব কথা স্বীকার করার সৎসাহস থাকলে অবশ্যই তিনি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

এরপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আসলো প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময়। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক ঈমান বসানো হলো। এ ব্যাপারে জনগণের ম্যান্ডেট নেয়া হোল। যদিও এই পদ্ধতি গণতন্ত্রের চূড়ান্ত বিচারে

গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু বাকশাল কায়েমের সময় তো জনগণের ম্যান্ডেটও নেয়া হয়নি। '৭৩ সালের নির্বাচনে বাকশাল কায়েমের জন্য কোন ইস্যুও দাঁড় করানো হয়নি। গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার জন্য সংবিধানের কার্যকারিতা যথাযথভাবে সংরক্ষণের ওয়াদা করেও শুধু নিজ এবং দলীয় স্বার্থে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে জনগণের সম্মতি ছিল না এমন একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হোল। সেদিন ঐ বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ সাহেব কোন প্রতিবাদ না করে কোন লোভে, কার স্বার্থে অথবা কোন শক্তির নির্দেশে ঐ অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপকে সমর্থন করেছিলেন তা রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। ব্যাপারটির হাকিকত উদ্ধার করতে বেশী বেগ পাওয়ার কথা নয় সাধারণ জনমানুষের। কেননা গরজ বড় বালাই। আর এ জাতীয় গরজ সাধারণতঃ ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থেই পয়দা হয়ে থাকে।

মরহুম জিয়ার সঙ্গী-সাথীদের অনেকে না হয় তাদের ভাষায় রাজাকার ছিলেন। কিন্তু জিয়া স্বয়ং শুধু মুক্তিযোদ্ধাই নন বরং চট্টগ্রাম বেতার থেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে তিনিই সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। তার নেতৃত্বে গঠিত সরকার এবং পার্লামেন্টের তিনিই ছিলেন মধ্যমণি। সাংবিধানিক পরিবর্তনে তার ভূমিকাই ছিল মূখ্য। তাহলে প্রেসিডেন্ট জিয়া কি রাজাকার ছিলেন? অথবা তার পরিচালিত সরকারের সকলেই কি রাজাকার ছিলেন? এসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই সম্মানিত ঐ রাজনীতিককে দিতে হবে বৈকি।

এখন প্রশ্ন হলো '৭২ সালের সংবিধান যদি কার্যকারিতা হারানোর কারণে পরিবর্তন করে একদলীয় শাসন কায়েম করা বৈধ হয় তাহলে পরবর্তীকালের পরিবর্তনগুলো গ্রহণ করতে অসুবিধা কোথায়? যারা প্রথম পরিবর্তনের কারণে খুশীতে বগল বাজালেন, তাদের তো পরবর্তী পরিবর্তনেও খুশী হওয়ারই কথা। নিজেদের দ্বারা কৃতকর্মকে গ্রহণ করতে গেলে অপরেরটাও গ্রহণ করতে হয় বিধায় তওবা-তিল্লা করে একবারে পেছনের অবস্থায় ফিরে যেতে চাওয়ার মধ্যে চালাকি আছে, মুন্সীয়ানা আছে কিন্তু আন্তরিকতা নেই। সুযোগ পেলেই অপরকে গালি দিতে গেলে প্রকারান্তরে যে গালি নিজের উপরও পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখলে ভাল হয়। উপরে থুথু ছিটালে নিজের মুখের উপরই পড়ে। দুনিয়ার সেরা মানুষের সে বাণীটি কতই না যথার্থ, "যে অপরের বাপকে গালি দেয় প্রকারন্তরে সে নিজের বাপকেই গালি দেয়।"

অগণতান্ত্রিক পন্থায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন অথবা সংশোধন কোনটাকেই আমরা আগেও সমর্থন করিনি, আজো করি না। '৭২ সালে প্রণীত সংবিধান জনগণ সংবিধানবিহীন একটি অবস্থার অবসানের জন্যই প্রকৃতপক্ষে মেনে নিয়েছিল। পরবর্তী সংশোধনকেও জনগণ সাংবিধানিক ও পদ্ধতিগত অসুবিধা থাকলেও তাদের মানসিক চিন্তার কিছুটা সমর্থক বলে মেনে নিয়েছে। আজ দেশে নতুন করে সাংবিধানিক সঙ্কট সৃষ্টি করার পরিবর্তে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ মুলতবী শাসনতন্ত্র চাইছেন। নির্বাচন হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন যা খুশী করবেন। সংবিধানহীন অবস্থার

চাইতে ত্রুটিপূর্ণ সংবিধানওয়ালা অবস্থা অনেক ভাল। তাতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার আশংকা অনেক কম।

যারা '৭২ সালের সংবিধানের গলায় একনায়কতন্ত্রের ছুরিখানা আমূল বিদ্ধ করে একদলীয় শাসন কায়েম করেছিলেন, তারাও বাহাত্তর সালের সংবিধান চাইতে পারেন। সে অধিকার তাদের আছে। কিন্তু আমরা জনগণ বড় ভয় করি। কোন হাইজ্যাকার ভালমানুষ সেজে টুপি মাথায় দিয়ে তসবী হাতে আসলেও তার বগলের তলায় লুকানো পিস্তলের মুখ দেখলে যেমন ভয়ে মানুষ আঁতকে ওঠে, তেমনি দশা হয়েছে আমাদের। যা হোক, তবুও একটা সিস্টেমের আওতায় আসতে চাইলে মন্দের ভাল। তবে কথা বলার সময় অথবা অপরের সমালোচনায় একটু গণতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটালে আমাদের সকলের জন্যই মঙ্গল। অপরের দিকে ঢিল ছুঁড়লে তারাও শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বের খাতিরেই ঢিল ছুঁড়বেন। শুরু হয়ে যাবে ঢিলাঢিলি, চিলাচিলি। কিলাকিলি আর লাঠালাঠির মধ্যে কোন ফাঁকে গণতন্ত্র বেচারা আবার দেশ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য যেন হিজরত না করে। দোহাই আল্লাহর, আপনারা রাজনীতিবিদরা অনুগ্রহ করে এদিকে একটু খেয়াল রাখলে আমরা কিছুটা নিশ্চিত হতে পারি বৈকি।

অপরকে ছোট করলে নিজেই ছোট হই

দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩

আমরা অপরের গুণকে স্বীকৃতি দিতে চাই না। এটা যেন আমাদের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে যে সব ঘটনা ঘটে, যারা সেসব ঘটনায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকেন তাদের কথাটা স্বীকার করতে আমাদের খুব কষ্ট হয়। বৃটিশ খেদাও আন্দোলনে যারা এ দেশের মানুষকে নেতৃত্ব দিলেন আজ আমরা তাদের কথা বেমালুম শুধু ভুলছি না, বরং মৃত্যুর এতদিন পরও তাদের চরিত্র হননের মত কাজও আমরা কম করিনি। এত গেল সাধারণভাবে অন্যান্যদের কথা। যে দিনকাল পড়েছে তাতে সন্তান পিতা মাতার ভূমিকাকে পর্যন্ত স্বীকার করতে চায় না।

সম্প্রতি আমাদের দেশের একজন তরুণ রাজনীতিবিদের সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। বয়স চল্লিশের দু'য়েক বছর কম বা বেশী। তবুও তরুণ বলছি এজন্য যে, রাজনৈতিক অঙ্গনে অভিজ্ঞতার নাকি বড় বেশী দাম। জনৈক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর মতে "পলিটিক্স ইজ এ ডেঞ্জারাস ফায়ার প্লে ইন দি হ্যান্ডস অব ইয়াংগ ম্যান।" সেজন্যেই রাজনীতির ক্ষেত্রে চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স তেমন একটা বেশী নয়। এ বয়সের লোকেরা রাজনীতির ক্ষেত্রে তরুণই বলতে হবে। তবে যার কথা বলছি তিনি বয়সে কিছুটা কম হলেও ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতির সাথে জড়িত আছেন। ছাত্রজীবনেই বামপন্থী রাজনীতি যাতে রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুলে রূপান্তরিত না হয় তার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে গিয়ে রুশপন্থীদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে চীনপন্থী বলে পরিচিত হয়েছেন। একটি ছাত্রসংগঠন পরিচালনা

করেছেন। সুতরাং তাঁর বয়স খুব বেশী না হলেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং ইতিহাসের বিশ্লেষণ তো একজন লেম্যানের মত হওয়ার কথা নয়। অন্ততঃপক্ষে অতি নিকট ইতিহাসের ব্যাপারে তার কাছ থেকে সঠিক তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ আশা করলে তেমন একটা অতিরিক্ত আশা করা হয় না।

সাক্ষৎকারে বিভিন্ন কথাবার্তা বলার সময় তিনি মোটামুটি বিজ্ঞের পরিচয় একেবারে কম দেননি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তার দৃঢ় ইচ্ছা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু ইতিহাসের স্মৃতিচারণের উল্লেখপূর্বক তিনি অন্য একটি রাজনৈতিক (অবশ্য তাদের ভাষায়) দলের কাজ কারবার সম্পর্কে এতটা বেখবর থেকেও মন্তব্য করলেন কিভাবে এটা রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার।

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ঐক্য, ঐক্যে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শরীক দল সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি জামায়াতে ইসলামী একটি গণতান্ত্রিক শক্তি নয় বলে মন্তব্য করেছেন। শুধু তাই নয়, জামায়াতে ইসলামীর নাকি কোন গণতান্ত্রিক ইতিহাসও নেই।

জামায়াতের প্রতিষ্ঠার সময় সম্পর্কে তার তেমন কোন বাস্তব ধারণা থাকার কথা নয়। হয়তো তখন তার জন্ম হয়নি। হলেও কয়েকমাসের শিশুই তিনি ছিলেন। সুতরাং কোন প্রেক্ষাপটে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা হলো, ভারত বিভক্ত হওয়ার ব্যাপারে জামায়াতের কি ভূমিকা ছিল, বৃটিশের গোলামী থেকে এ উপমহাদেশের মানুষকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার কি অবদান ছিল, এসব কথার আদ্যোপান্ত তার জানা থাকার কথা নয়। কেননা এসব ব্যাপারে আমার মতই তাকেও পরের মুখেই ঝাল খেতে হয়েছে। কিন্তু পঞ্চাশের শেষের দিকে গোটা ষাটের দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের কি ভূমিকা ছিল এটা তো তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আদর্শ প্রস্তাবের লড়াই তার মনে না থাকলেও ১৯৫৬ সালে একটা শাসনতন্ত্র যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, এর জন্য জামায়াতের ভূমিকা তো তার অজানা থাকার কথা নয়। আইয়ুবের ডিক্টেটারী শাসনের বিরুদ্ধে জামায়াতের বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা তো শিক্ষিত লোকদের মধ্যে যারা সক্রিয় রাজনীতি করেন না, তারাও একেবারে ভুলে যাননি। আইয়ুব খান জামায়াতকে বেআইনী কেন করেছিলেন সে সত্যটা তিনি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন কি করে? সম্মিলিত বিরোধী দলের সাথে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিরুদ্ধে জামায়াতের ভূমিকা কে না জানে? 'কপ' এবং 'ডাকের' আন্দোলনে জামায়াতের বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রশংসা তো মরহুম শেখ মুজিব নিজেও বহু জায়গায় করেছেন। আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ আজো তা অস্বীকার করতে পারবেন কি? 'ডাক' এবং পিডিএম এর আন্দোলনে সংগঠন হিসাবে জামায়াতে ইসলামী এবং ব্যক্তি হিসাবে অধ্যাপক গোলাম আজমের ভূমিকা এতই বলিষ্ঠ এবং গণমুখী ছিল যে ঐ সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদেরও অজানা থাকার নয়। অথচ জামায়াতে ইসলামী গণতান্ত্রিক শক্তি নয় এ মন্তব্যটা তিনি কিভাবে

করলেন তা আমাদের কাছে আদৌ বোধগম্য নয়।

গণতান্ত্রের অন্যতম উপাদান যদি সহনশীলতা হয় তাহলে তো সংগঠন হিসেবে মনে হয় জামায়াতই সবদিক থেকে গণতান্ত্রিক সংগঠন বলে দাবী করতে পারে। জামায়াতের জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটি উদাহরণও বোধ হয় মিলবে না যে জামায়াতের লোকজনেরা অন্য কারো জনসভা, সম্মেলন, সুধী সমাবেশ বা অন্যকোন অনুষ্ঠানে হামলা করেছে। দেখা গেছে, অনেক খুচরা পার্টি পর্যন্ত জামায়াতের সভা-সমিতিতে হামলা করেছে। এমনকি ঘটনাস্থলের সাধারণ দর্শকরা এতটা পর্যন্ত মন্তব্য করেছে যে, এ ধরনের ফ্যাসিষ্টদেরকে ক্ষমা করা উচিত ছিল না। এরপরও জামায়াত সংগঠনগতভাবে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সমর্থক পর্যন্ত সংগঠনের নির্দেশ ধৈর্যের সাথে পালন করতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করেনি। দুঃখ হলো এই যে, যে রাজনীতিবিদ জামায়াত সম্পর্কে অগণতান্ত্রিক মন্তব্যটি করেছেন, তাঁর অনেক রাজনৈতিক উস্তাদ এবং তার দল বলসহ সকলেই কাজ-কাম অগণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে চিত্রিত, তাদের অনেকের সাথেই তিনি একজোট হয়ে কিভাবে কাজ করেছেন? এমনকি যাদেরকে এক সময়ে তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট মনে করতেন, যাদেরকে রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল মনে করে একটি সংগঠনকে কয়েকভাগে ভেঙ্গে ফেললেন, সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টদের দ্বারা তাড়িত হয়ে, ফ্যাসিষ্ট শক্তি বলে পরিচিতদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়ালেন তাদের সাথে একত্রিত হয়ে কিভাবে কাজ করছেন-এটা আমাদের পক্ষে বুঝতে একটু কষ্ট হয় বৈকি। গরজ যদি বড় বালাই হয়, আর তার কারণেই যদি এমনটি করে থাকেন তাহলে অবশ্য বলার কিছু নেই।

বেশী দূরে যেতে হবে কেন? সকলেই আমরা জানি বাংলাদেশে প্রকাশ্যভাবে জামায়াত কাজ করার সুযোগ পাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তার দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে এমনকি সাধারণ একজন সমর্থকের পক্ষ থেকে কারো গায়ের চামড়া তোলা, কাউকে টিকিট কেটে নয়াদিল্লী, লন্ডন, ওয়াশিংটন অথবা মস্কো পাঠানোর মত ফ্যাসিষ্ট শ্লোগান উত্থিত হয়নি। আরো জানি আমরা, জামায়াতের উপর ১৯৮১ সালে যে ফ্যাসিবাদী হামলা চালানো হলো, তাদের ইন্ধন যোগানোর জন্য যেসব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইন্ধন যোগালেন, খড়কুটা, লাঠি-ঠেঙ্গা সরবরাহ করলেন তার জবাবে জামায়াতে ইসলামী যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে, বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে তা একটি অনন্য দৃষ্টান্তই বলতে হবে।

এইতো বর্তমান সামরিক শাসন আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত জামায়াত এমনকি একটিও রাজনৈতিক আচরণ করেছে যা অগণতান্ত্রিক। এমনকি কড়া ভাষায় কোন

বিরোধী দলের সমালোচনা পর্যন্ত করেনি সকল গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের স্বার্থেই। আমরা দেখেছি, ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর সাথে জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বক্তব্য সম্বলিত যে লিফলেট জামায়াত সারাদেশে বিলি করেছে, এখন তো সে সব কথা অনেকেই বলছেন। অনেক ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতা পর্যন্ত জামায়াতের বক্তব্যকে সময়োপযোগী এবং দিকনির্দেশনী বলে মন্তব্য করেছেন। সব নির্বাচনের আগে পার্লামেন্ট নির্বাচন এবং জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা সমস্ত প্রকার জাতীয় ইস্যু সমাধানের কথা জামায়াতে ইসলামীই প্রথম বলেছে। এ ক্ষেত্রে জামায়াত যে বক্তব্য রেখেছে তার চেয়ে একেবারে নতুন কোন কথা কোন প্রধান দলের পক্ষ থেকে আসেনি।

তাহলে একটা সংগঠনের গণতান্ত্রিক হওয়ার জন্য কি কি গুণের প্রয়োজন। তাদেরকে কি চরম ডিক্টেটরী শাসন ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের গুণগান গাইতে হবে, অথবা ওয়াশিংটনের 'গণতান্ত্রিক গুরুদের' ইংগিতে লেজ নাড়তে হবে, অথবা মস্কোতে বৃষ্টি নামলে এখান থেকেই সর্দিজর বানিয়ে গণতন্ত্রের পূজারী বলে প্রমাণ করতে হবে? অথবা নয়াদিল্লী থেকে কোন আকার ইংগিত আসলে এখান থেকে সেটাকে আসমানী কিতাবের মত মর্যাদা দিয়ে গণতন্ত্রের ভক্ত সাজতে হবে?

অপরের প্রতি মর্যাদাবোধ না থাকলে গণতান্ত্রিক কোন সমাজ বাঁচতে পারে না। আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। অপরকে খাটো করতে গেলে যে নিজেকেও খাটো হতে হয় আমরা সেদিকে একটু খেয়াল রাখলে আমাদের জন্যই মঙ্গল। তা না হলে আমরা কেউ যা চাই না, সেভাবেই দেশ চলবে। আর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিন্দিত হয়েই চলবেন। রাজনীতিবিদদের তত্ত্ব নিয়ে ঘরে ঘরে কিলাকিলি অবশেষে কিলাকিলিতে প্রতিপক্ষ না পেলে নিজেদের দলের মধ্যেই তার চর্চা শুরু হয়ে যাবে। আর অন্তহীন এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে সরকারের পরিবর্তন হয়েই চলবে, কিন্তু মানুষের ভাগ্যের কোন কল্যাণমুখী পরিবর্তনই আসবে না।